সচিত্র

যোগ-ব্যায়াম

সবিতা মল্লিক

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-এর নূতন সিলেবাস ও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী
সূর্য-নমস্কারসহ সর্ববিধ বিভিন্ন আসন সম্বলিত।
বাংলার ব্রতচারী সমিতির শিক্ষণ-বিভাগ কর্তৃক সহ-পাঠ্যরূপে অনুমোদিত।

অশোক পুস্তকালয়
৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯
ফোন : ৩২-৫৫৮০

প্রকাশক :
শ্রীঅশোককুমার বারিক
৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৮২ (শিবরাত্রি)
দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্তিত ও পরিবর্জিত) : ১৯শে বৈশাখ, ১৩৮৩ (অক্ষয় তৃতীয়া)
তৃতীয় মুদ্রণ : ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৫
চতুর্থ সংস্করণ : ১৩৮৯
পঞ্চম সংস্করণ (সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত এবং পুনর্লিখিত) : শ্রাবণ, ১৩৯৮

মূল্য : চল্লিশ টাকা মাত্র।

মুদ্রক :
শ্রীতপনকুমার বারিক
অজন্তা প্রিন্টার্স
৭বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

ব্যায়ামাচার্য ৺বিষ্ণু চরণ ঘোষের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

লেখিকা পরিচিতি

সবিতা মল্লিক (ঘোষ)

সবিতা ও অনিতা দু' বোন। খুব ছোটবেলায় ব্যায়ামাচার্য স্বর্গীয় বিষ্ণুচরণ ঘোষের কাছে দু' বোনের যোগ-ব্যায়ামে হাতেখড়ি এবং ব্যায়ামাচার্য যতদিন বেঁচে-ছিলেন ওরা দু' বোন ছিল তার চোখের মণি। একদিন ক্লাসে না গেলে তার পরদিন সকালেই বাসায় এসে হাজির হতেন। কোন চোট বা আঘাত লাগলে নিজেই চিকিৎসা করতেন। কারণ বোধহয় অত অল্প বয়সে ঐরকম একাগ্রতা তিনি খুব অল্প ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দেখেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে শুধু যোগ-ব্যায়াম নয় ; জিমন্যাস্টিকেও নিজেদের স্থান করে নেয়। ঐ সময় ব্যায়াম-জগতে (বাংলার) সবিতাকে বলা হতো "বোনলেস গার্ল।" এরই সঙ্গে সবিতার রবীন্দ্র সঙ্গীত, নৃত্য ও পল্লীগীতিতে বেশ নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং কত্থক নৃত্যেও নিয়ে নেয়। যোগ-ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় সবিতা কোনদিন প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় স্থান পায়নি। ঐ সময় একটি অ্যাথলেটিক ক্লাব "অল বেঙ্গল যোগ-ব্যায়াম প্রতিযোগিতার" আয়োজন করে। ফাইনাল পরীক্ষার জন্য সবিতা প্রথমে প্রতি-যোগিতায় নাম দেয়নি। সবিতার বাবার সঙ্গে ক্লাবের সেক্রেটারীর দেখা হতে সেক্রেটারী বলেন, "কি ব্যাপার সবিতা প্রতিযোগিতায় নামছে না! অল বেঙ্গল কমপিটিসন বলে?" সবিতার বাবা বাড়ী এসে সবিতাকে সেক্রেটারীর কথা বলায় সবিতা বলল, "বাবা আমার কাছে ফর্ম আছে এখনি ভর্তি করে দিচ্ছি, তুমি সেক্রেটারীকে ফর্মটা দিয়ে বলে এস সবিতা প্রথম হবে।" সবিতার বাবা সেক্রেটারীর হাতে ফর্ম দিয়ে বলে আসলেন সবিতা বলেছে সে প্রথম হবে। নির্দিষ্ট দিনে প্রতিযোগিতার শেষে দেখা গেল ১০০ নম্বরের ভিতর সবিতা পেয়েছে ৯৭ আর যে মেয়েটি দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে তার নম্বর ৬৩। ঐ সময় আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে সবিতার সাক্ষাৎকার নেওয়া

হয়। স্টেটসম্যান, অমৃতবাজার, আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃত, নবকল্লোল, ঘরোয়া, মহিলা, পরিবর্তন প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় এমন কি সর্ব-ভারতীয় ইভস্ উইকলি, ফ্যামিনা প্রভৃতি পত্রিকায় একাধিকবার সবিতার যোগ-ব্যায়ামের ছবিসহ লেখা ও রিভিউ বের হয়েছে। একবার শারদীয়া সংখ্যায় একটি নামী ব্যায়াম পত্রিকার প্রচ্ছদপটে সবিতার এমন কতকগুলি কঠিন যোগাসনের ছবি বের হল যে সংখ্যাটি বার করার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যায়—আবার ছাপাতে হয়। সংখ্যাটির নাম হয়ে গেল 'সবিতা সংখ্যা'। ১৯৬৯ সালে বেঙ্গল বিউটি কন্টেস্ট-এ জুনিয়র গ্রুপে সবিতা প্রথম হয় এবং ১৯৭১ সালে সবিতা সিনিয়র গ্রুপে প্রথম স্থান পায়। তখনকার দিনে বিউটি কন্টেস্টে শুধু দেখতে সুন্দর ও ফ্যাসন প্যারেডে নামলে চলতো না। মূল প্রতিযোগিতায় নামার আগে লেডি ডাক্তার দ্বারা রক্তের চাপ, নাড়ীর গতি, বয়স অনুযায়ী উচ্চতা ও ওজন ; গলা, বুক, কোমর, নিতম্ব ও পায়ের হাঁটুর নিচের মাপ প্রভৃতি পরীক্ষা করা হতো এবং নম্বর মোট নম্বরের ভিতর যোগ হতো। ঐ সময় বাংলার ব্রতচারী সমিতির অনুরোধে সমিতির ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ-ব্যায়াম বিভাগের দায়িত্ব নেয় এবং অন্যদিকে নাচ, গান ও যোগ-ব্যায়ামের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে এমনকি কলকাতার বাইরে হুগলী, কল্যাণী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া থেকেও অনুরোধ আসতে থাকে। বিউটি কন্টেস্টে প্রথম হওয়ায় সিনেমার প্রোডিউসর ও পরিচালক, নানা কস্‌মেটিক্‌স কোম্পানী নানাভাবে অনুরোধ ও প্রলোভন নিয়ে আসতে লাগলেন। শেষে অবস্থা এমন হলো যে, সবিতা শুধু কলেজ ও যোগ-ব্যায়াম ছাড়া আর সবকিছু ত্যাগ করলো। কোনো প্রতিযোগিতাতে আর নাম দিত না। ক্লাবে সবিতা লক্ষ্য করেছিল শুধু রোগারোগ্যের জন্য ব্যায়ামাচার্যের কাছে বহু রোগী ভীড় করতো এবং ভাল হয়েও যেত। সবিতা তাই ডিগ্রীকোর্সে বায়ো-সায়েন্স নিয়ে ভর্তি হলো ; সংগে সঙ্গে খাদ্যনীতি নিয়েও পড়াশুনা আরম্ভ করলো। সবিতা জানতে চেয়েছিল জীবদেহে কোথায় কোন্ যন্ত্র আছে, কা'র সঙ্গে কা'র কি কি সম্পর্ক, কি কি বস্তু দ্বারা দেহ-মন গঠিত হয়, কোনটা কম-বেশী কাজ করলে তার ফল কি হয়, নিরাময়ের উপায় কি, খাদ্য কেন প্রয়োজন হয়, কোন্ খাদ্যে কতটুকু সার-বস্তু পাওয়া যায়, বয়স অনুযায়ী কোন্ খাদ্য কতটুকু খাওয়া উচিত প্রভৃতি। সবিতা কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে পাশ করে।

এই সময় পাত্রপক্ষের অনুরোধে সবিতাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়—পাত্র শ্রীমান সৌমেন ঘোষ, সিভিল ইঞ্জিনীয়ার। শান্তিনিকেতন ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—হকি ও ক্রিকেট-এ ইউনিভার্সিটি ব্লু এবং যোগ-ব্যায়ামেও পারদর্শী। ১৯৭৫ সালে স্বর্গীয় ব্যায়ামাচার্যের পুত্র শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষের পরিচালনায় জাপানে ইণ্ডিয়ান যোগ, নৃত্য ও ফিজিক্যাল ফিট্‌নেস প্রদর্শনীর জন্য টীম নির্বাচিত হয়, সবিতা ও তার বাবা সে টীমে অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু সাংসারিক কারণে সবিতার যাওয়া হয় না—তার জায়গায় যায় তার বোন অনিতা। কারণ দু' বোন তখনও একে অন্যের পরিপূরক। সুদীর্ঘ সাড়ে তিন মাস জাপানের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রদর্শনী দেখিয়ে ভারতীয় টীম সগৌরবে দেশে ফিরে আসে। জাপানে টেলিভিশনে বেশ কয়েকবার ভারতীয় প্রদর্শনী দেখানো হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ব্যায়ামাচার্য শুধু সবিতা, অনিতাকে দলে টেনে নেননি, সবিতার মা-বাবাকেও ক্লাবে ভর্তি হতে বাধ্য করেছিলেন। তাই এই বইতে শুধু সবিতা, অনিতা এবং আরও কয়েকজনের ভঙ্গিমা দেখা যাবে না, শীর্ষাসনে সবিতার বাবার ছবিও দেখা যাবে।

কলকাতা টেলিভিশন প্রথম চ্যানেলে সুরুতেই সবিতার যোগ-ব্যায়াম প্রদর্শিত হয় এবং দ্বিতীয় চ্যানেলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অনিতার ভারতনাট্যম প্রদর্শিত হয়।

১/৩৮৬, গড়িয়াহাট (সাউথ) রোড, কলিকাতা-৬৮-তে 'সারস্বত' নামে একটি শরীর চর্চা ও সাংস্কৃতিক সংস্থা আছে। সেখানে ব্যায়াম, যোগ-ব্যায়াম, রবীন্দ্র সংগীত ও নৃত্য নাটক, নজরুলগীতি ; ভারতের প্রাদেশিক ও বিদেশের লোকগীতি ও লোকনৃত্য, ভারত-নাট্যম, কথক, শিশুদের বসে আঁকো প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। নৃত্য-পরিচালনা করে বোন অনিতা, আর সবিতা ব্যায়াম ও যোগ-ব্যায়ামের (শুধু মেয়েদের) অধ্যক্ষা। সংগীত বিভাগেও অংশ নিতে হয় বিশেষ করে প্রোগ্রামের সময়।

সবিতার একমাত্র ছেলে শ্রীমান সৌম্যজিৎ ডনবস্কোতে পড়ে—সঙ্গে অনুশীলন করে চলেছে যোগ-ব্যায়াম, ক্রিকেট ও ক্যারাটে। এবার স্কুল প্রতিযোগিতার বাংলা গানের প্রথম পদকটি ওরই হাতে এসেছে অথচ সৌম্যজিৎ কারো কাছে গান শেখেনি, শুধু মায়ের গান শুনেছে। সবিতা দুঃখ করে বলল, বেশীর ভাগ ছাত্রী যোগ-ব্যায়ামে ভর্তি হয় রোগ থেকে মুক্ত হতে—ভালো হলেই সংস্থায় তার উপস্থিতি অনিয়মিত হয়ে যায়। দু' তিন মাস পরে আবার যখন রোগ দেখা দেয় তখন অনুপস্থিতির জন্য নানা কারণ দেখিয়ে আবার ভর্তি হয়।

সম্পাদক

মুখবন্ধ

শরীর শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বে ভারতের যে-সকল অবদান আছে, তার মধ্যে 'যোগ-ব্যায়াম' অন্যতম। প্রাচীন ভারতে আর্য ঋষিগণ যোগ-ব্যায়ামের নিয়মিত অনুশীলন করার ফলে রোগমুক্ত দীর্ঘ জীবনযাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্তমানে কেবলমাত্র ভারতবর্ষ নয়, অন্যান্য অগ্রসর দেশেও যোগ-ব্যায়াম প্রবর্তনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করছেন এবং এর সাধনা করে চলেছেন। ব্রতচারী শিক্ষাব্যবস্থায় যোগ-ব্যায়াম শিক্ষা বাধ্যতামূলক। ব্রতচারী শিক্ষার শ্রেণী ও শিবিরে শিক্ষাদান ব্যাপারে এই পুস্তকের লেখিকা কল্যাণীয়া সবিতা মল্লিক সাধ্যমত সহযোগিতা করে থাকেন। মেয়েদের ভঙ্গীর ছবি সম্বলিত যোগ-ব্যায়ামের পুস্তকের অভাব যেটা ছিল, আশা করি এই পুস্তকের মাধ্যমে তা পূরণ হবে। এই পুস্তক কেবলমাত্র যে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবে তাই নয়, পরন্তু যে সকল মা-বোনেরা, ইচ্ছা থাকলেও, শিক্ষাকেন্দ্রে এসে শিক্ষা-গ্রহণে অপারগ, তাঁদেরও সাহায্য করবে।

শরীর গঠন প্রণালী, খাদ্যের উপাদান, রোগ নিরাময় যোগাসনের উপকারিতা, মুদ্রা ও প্রাণায়াম এই পুস্তকে বিস্তারিত তথ্যের সাহায্যে উপস্থিত করা হয়েছে। আশা করি, শিক্ষার্থী, পাঠক-পাঠিকা উপরোক্ত তথ্যে বিশেষ উপকৃত হবেন।

বাংলার ব্রতচারী সমিতির শিক্ষণ-বিভাগ ব্রতচারী শিক্ষণসূচীর সহ-পাঠ্যরূপে এই পুস্তক অনুমোদন করছেন।

শঙ্করপ্রসাদ দে
অবর সচিব (শিক্ষণ ও সংগঠন)
বাংলার ব্রতচারী সমিতি

১৬ই ডিসেম্বর '৭৫
ব্রতচারী কেন্দ্র ভবন
১৯১/১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

এই বই সম্বন্ধে ডাঃ শীলের অভিমত

হিন্দু সংস্কৃতির সুপ্রাচীন ভান্ডারের একটি রত্ন হলো "যোগ-ব্যায়াম"—যা হঠযোগের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। হঠযোগ হলো ভারতীয় যোগশাস্ত্রর একটি বিশেষ পথ—যে পথ "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্"-এর পথ। দেহকে গঠন করে, তাকে রোগ-মুক্ত করে, তাকে দীর্ঘায়ু করে, তবেই যোগের কঠিন সাধনায় এগুতে হবে। নচেৎ ভঙ্গুর দেহ অসুস্থ কায়া-যোগের নিত্য নতুন সম্পদ গ্রহণে সমর্থ হবে না। যোগফল লাভের পূর্বেই সে-দেহ বিনষ্ট হয়ে পড়বে।

'হঠযোগ' সুপ্রাচীন যোগ। 'হ' যার বীজ অর্থ সূর্য, 'ঠ' যার বীজ অর্থ চন্দ্র। 'হ' এবং 'ঠ' অর্থাৎ 'হঠ' কথাটির মধ্যে তাই সুপ্রাচীন যোগ-সাধনার আদিত্যপথ এবং সোমপথের সংকেত রয়েছে। বৈদিক সংকেতে একটি ধনাত্মক, একটি ঋণাত্মক পথ। আবার এই দুই পথের সাথে আমাদের ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ যে-চেতনা বিশ্বগত, তাই আবার দেহগত এবং দেহানুস্যূত।

সংক্ষেপে এই অবিস্তর আঁচর থেকে অনুধাবন করা যাবে 'হঠযোগ' হঠাৎ কোন আবিষ্কার বা অভ্যাসশ্রুতি নয়। সুপ্রাচীন যোগশাস্ত্রের সামগ্রিক ভাবনার এবং পরিকল্পনার একটা নির্দিষ্ট অংশ হলো হঠযোগ। তাই যোগীশ্বর মহাদেব হঠযোগের ৮৪০০০ আসনের প্রকাশক বলে, আজও আমরা তাঁর ধ্যান করি।

যোগাসনের ৮৪টি আসন এখনও প্রচলিত আছে। সেগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এবং ক্ষেত্রকর্ম বিধিয়তের নির্দেশনায় ব্যবহার করলে, এমন একটি দেহ প্রকাশমান হবে, যা নীরোগ কান্তিমান হয়ে যোগ-চৈতন্যের বাহক হবে।

বর্তমানে আমাদের দেশে সুবিশাল দেহী সাধকের চেয়ে প্রয়োজন স্বাস্থ্যবান নীরোগ দেহ। তাই "যোগ-ব্যায়াম" সাধনা সেদিক থেকে অগ্রাধিকার পাওয়া প্রয়োজন। যোগ-ব্যায়ামের উপর শ্রীমতী মল্লিক যে বইখানি লিখিয়াছেন, তা সবার পক্ষে পরম প্রয়োজনীয়। বর্তমানে এমন একখানা বইয়ের বিশেষ দরকার ছিল।

বইখানি চিরাচরিত ভাবে লেখা নয়। শ্রীমতী মল্লিক আমাদের দেহ নীরোগ, সবল ও কর্মঠ রাখতে হলে, যা কিছু প্রয়োজন, তা সহজ ও সরল ভাষায় অনেক উদাহরণের সাহায্যে এবং নিজে অনুশীলন করে, বুঝিয়ে ও দেখিয়ে দিয়েছেন। যদি এই পন্থায় দৈনিক কয়েক মিনিট নিজেদের শরীরের দিকে একটু নজর রাখি, তবে নীরোগ-কর্মঠ দেহ নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারি।

আর একটা বড় কথা, শ্রীমতী মল্লিক দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ব্যায়ামের জন্য ভাল ভাল দামী খাবারের প্রয়োজন নেই। আমরা সাধারণভাবে যা খাই, তাতেই আমরা সুস্থ, কর্মঠ থাকতে পারি, যদি সেই খাদ্য তালিকা সুষম এবং সু-সমঞ্জস হয়।

সামগ্রিকভাবে দেহযন্ত্রের এনাটমী এবং ফিজিওলজি শ্রীমতী মল্লিকের আলোচনার পরিসরে পড়েছে এবং তাই বইখানির প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছে।

বিশেষ বিশেষ দেহযন্ত্রগুলি দেহের কোথায় অবস্থিত এবং তাদের কি কি কাজ, দেহের জান্তব উপাদান কি, খাদ্য কি, ভিটামিন কি, কি তাদের প্রয়োজন, কোন্ কোন্ খাদ্যে কি কি খাদ্য-উপাদান বা ভিটামিন কতটুকু পরিমাণে পাওয়া যায়, সবকিছু বেশ সংক্ষেপে তিনি বুঝিয়ে বলেছেন।

শ্রীমতী মল্লিক একটি যোগ-ব্যায়াম অনুশীলনকারী পরিবার থেকে এসেছেন। যোগ-ব্যায়াম-সম্বন্ধে এই ধরনের প্রকাশনার প্রচেষ্টায় তাঁর পরিবারের সকলেরই উৎসাহ এবং অবদান রয়েছে।

লেখিকার এই প্রচেষ্টাকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

M.B.B.S., T.D.D., Ph.D. (Medicine)
M.B.T.T.A. (Eng.), F.R.S.T.M.H. (London), F.R.C.P. (U.S.A.)

Director, Institute of Sports Medicine
26, Waterloo Street, Calcutta-1

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

নানান্ প্রতিকূলতার মধ্যে বইটির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হলো। সংস্করণটি পরিবর্ধিত এবং বিশেষভাবে পরিমার্জিত। খালিহাতে ব্যায়াম, যোগ-ব্যায়াম ও রোগ বিষয়ে আলোচনার সংখ্যা যেমন বাড়ানো হয়েছে তেমনি যুক্ত করা হয়েছে আধুনিক ভঙ্গিমা, প্রক্রিয়া এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে রোগ নিরাময়ের উপায়। রোগ-ব্যাধি আগেও ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে—পরিবর্তন এসেছে ও আসবে শুধু তাদের চরিত্রে, প্রতিরোধ-ক্ষমতায় ও ভয়াবহতায়। আজকাল প্রায়ই দেখা যায় বিশেষ কয়েক ধরনের জ্বর হলেই দেহের তাপমাত্রা ১০৫° ডিগ্রীতে উঠে যাচ্ছে অথচ দু'এক বছর আগেও কোন রোগীর তাপমাত্রা ১০৪/৫° ডিগ্রী উঠলেই চিকিৎসকের রক্তের চাপ বেড়ে যেত, মুখ শুকিয়ে যেত। ভাইরাসজনিত কয়েকটি বিশেষ ধরনের আন্ত্রিক রোগে রোগী কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগেই রোগ চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। আধুনিক গবেষণাগারে যেমন নিত্য-নতুন রোগ-প্রতিষেধক প্রক্রিয়া, চিকিৎসা-পদ্ধতি ও ওষুধ আবিষ্কৃত হচ্ছে তেমনি রোগ-জীবাণু এবং ভাইরাসও তার আক্রমণ পদ্ধতি পাল্টিয়ে নিচ্ছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, খাদ্যে ভেজাল এবং পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি কারণে আরো যে কত নতুন নতুন রোগ দেখা দেবে না তারই বা নিশ্চয়তা কোথায় ?

বর্তমান পরিবেশে রোগ-জীবাণু ও ভাইরাস থেকে দূরে থাকা অসম্ভব, তবে নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর রাখলে, স্বাস্থ্য-নীতি মেনে চললে বেশীর ভাগ রোগ থেকে কিন্তু দূরে থাকা যায়। দেহ-যন্ত্রগুলি যদি সুস্থ ও সক্রিয় থাকে তবে রোগ-জীবাণু বা ভাইরাস দেহে প্রবেশ করলেও দেহ রোগাক্রান্ত হয় না—আর হলেও মারাত্মক হতে পারে না। তাই ইংরাজি প্রবাদ বাক্যটি আবার মনে করিয়ে দিই—"প্রিভেনসান ইজ বেটার দ্যান কিওর" এবং তার একমাত্র উপায় হচ্ছে দিনে কিছুসময় কয়েকটি খালি-হাতে ব্যায়াম ও যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস রাখা।

প্রথম কয়েকটি সংস্করণে বাবার একমাত্র শীর্ষাসন ভঙ্গিমাটি ছাড়া আর কোন ছেলেদের ছবি ছিল না—তাই অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন "বইটি কি শুধু মেয়েদের জন্য ?" না, বইটি শিশু, ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবারই উপযোগী করে লেখা হয়েছে। কোন্ কোন্ অবস্থায় ছেলে বা মেয়েদের কোন্ কোন্ আসন বা ভঙ্গিমা করা উচিত না বিধি-নিষেধ বলা হয়েছে।

এবার একই আসনের বা ভঙ্গিমার ছেলে ও মেয়ের উভয়ের ছবি দেওয়ার চেষ্টা করেছি যাতে শুধু ছবি দেখে বইটি সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয় কিন্তু বইটির দামের কথা চিন্তা করে সব ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের ছবি দেওয়া সম্ভব হয়নি সেজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।

বইটির শেষ সংস্করণটি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পরেও এবং পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধ সত্ত্বেও নানা অসুবিধার জন্য পঞ্চম সংস্করণটি প্রকাশ করতে দেরী হওয়ার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

অবশেষে শ্রীমান স্বপন কুমার রায়, শ্রীমান সুপ্রিয় পাল, বোন অনিতা মল্লিক এবং যে সব ছাত্রী যেমন, শুভমিতা, লিপিকা, জয়িতা, মলি ও রিমো (সুদূর জাপান থেকে এসে যোগাসন শিখছে—এমন একাগ্রতা আমি খুব কম ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পেয়েছি) ছবি দিয়ে এই সংস্করণটি পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে সাহায্য করেছে তাদেরকে আমি আমার অন্তরের স্নেহ, ভালবাসা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাছাড়া বইটি প্রকাশনায় যিনি আমায় সব সময় উৎসাহ দিয়েছেন ও নানাভাবে সাহায্য করেছেন তিনি হলেন ভারতী বুক স্টলের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অশোক কুমার প্রারিক—তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবিতা মল্লিক (ঘোষ)

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আমার গুরুদেব ব্যায়ামাচার্য, ৺বিষ্ণুচরণ ঘোষ মহাশয় চেয়েছিলেন ভারত বিশেষ করে বাংলার ঘরে ঘরে, স্বাস্থ্যসাধনা ছড়িয়ে পড়ুক। তিনি চেয়েছিলেন দেশের বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণীদের মধ্যে দৈহিক, মানসিক, নৈতিক শক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকাশ। আজকের ব্যায়াম-জগতের অনেক নামকরা ব্যায়ামকুশলী তাঁরই আশ্রয়ে থেকে দেহমন গঠনের সুযোগ পেয়েছেন। স্বাস্থ্যসাধনা ছিল, তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর অকালমৃত্যুতে ব্যায়ামানুরাগীরা হারালো এক অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শককে। শোকে-দুঃখে, নিরাশায় ভেঙে পড়ল তাঁর অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী—তার মধ্যে আমিও একজন। আমার আঘাতটা একটু বেশী ছিল—কারণ, পরিচয়ের শুভলগ্ন থেকে শেষদিন পর্যন্ত তাঁর কাছাকাছি থাকার সুযোগ আমি একটু বেশীই পেয়েছিলাম। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, এই বইখানি প্রকাশে আমি বিশেষ আগ্রহী হয়েছি।

ছোটবেলা থেকে মা-বাবার অনুপ্রেরণায় ও গুরুদেবের নির্দেশে স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম সম্বন্ধীয় যত বই পেয়েছি, সব পড়েছি, বুঝতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু বাংলা ভাষায় ঠিক একখানিও বিজ্ঞানসম্মত সর্বাংগসুন্দর বই আমার হাতে আসেনি। বেশীর ভাগ বইয়ে কঠিন ভাষায় শুধু উপদেশ আর নির্দেশ—ঠিক বাস্তব জীবন থেকে যেন অনেক দূরে। বর্তমান অর্থনৈতিক জীবনে যেখানে শুধু সাধারণভাবে বেঁচে থাকাই সমস্যা এবং যেখানে সময়ের সংগে তাল রেখে চলাই প্রায় অসম্ভব, সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় করে শরীর-চর্চা করার সময় কোথায় ? তাই অনেক চিন্তা করে, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, খালিহাতে ব্যায়াম ও যোগ-ব্যায়ামগুলি এমন সহজ ও সরল ভাষায় বোঝাতে চেষ্টা করেছি এবং নিজে করে দেখিয়েছি যে বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই তাঁদের নিয়মিত ও আধ-ঘণ্টার মত সময় নিয়ে অভ্যাস রাখলে নীরোগ, সহিষ্ণু ও কর্মক্ষম শরীর গড়ে তুলতে পারবেন, বলেই আমার বিশ্বাস।

এই বই প্রকাশের জন্য প্রথম থেকে যাঁরা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন, তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁরা হলেন সর্বশ্রী মাধব মল্লিক, সম্পাদক (আলোছায়া) এবং নির্মলচাঁদ শীল, যুগ্ম-সম্পাদক (আলোছায়া)।

পঃ বঃ সরকারের মাননীয় কর্তৃপক্ষকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই—কারণ, নানা প্রতিকূল অবস্থার ভেতরেও স্কুলে খেলাধূলা ও যোগ-ব্যায়াম আবশ্যিক বিষয় বলে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন।

বইখানি যাদের জন্য লিখেছি, তাদের কাজে লাগলে, আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

বইখানির উন্নতিকল্পে শুভাকাঙ্ক্ষী পাঠকদের যে-কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

সবিতা মল্লিক

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

স্বাস্থ্য ভালো রাখার উপযোগী কয়েকটি সাধারণ উপায় ... ১—৮

১। স্বাস্থ্য ভালো রাখার উপযোগী কয়েকটি সাধারণ উপায়—১।

২। যোগ-ব্যায়াম অভ্যাসকারীদের কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়—২।

৩। অন্যান্য ব্যায়ামের সঙ্গে যোগ-ব্যায়ামের পার্থক্য কোথায় ?—৪।

৪। আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামের পার্থক্য ও উপকার—৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও তার উপাদান ... ৯—২৩

১। খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও তার উপাদান—৯, দেহের উপাদান ও খাদ্য এবং ঐ সব উপাদান কোন্ কোন্ খাদ্যে পাওয়া যায়—৯, অক্সিজেন—৯, কার্বন—১০, হাইড্রোজেন—১০, নাইট্রোজেন—১০, ক্যালসিয়াম—১০, পটাসিয়াম—১০, সোডিয়াম—১১, লোহ—১১, ম্যাঙ্গানিজ—১১, ফস্ফরাস্—১১, ম্যাগনেসিয়াম—১১, সালফার—১১, ক্লোরিন—১২, ক্লোরিন—১২, সিলিকন—১২, আইওডিন—১২, তামা—১২।

২। খাদ্যের উপাদান ও তাপমূল্য ১০০ ভাগে। কোন্ খাদ্যে কোন্ উপাদান এবং কতটুকু তাপমূল্য পাওয়া যায়—১৩। কোন্ বয়সে কতটুকু তাপমূল্য দরকার—১৭।

৩। খাদ্যের উপাদান-এর কোন্ কোন্ খাদ্যে এই সব উপাদান পাওয়া যায়—প্রোটিন—১৭, কার্বোহাইডেট—১৮, স্নেহপদার্থ—১৯, ধাতব লবণ—২০, ভিটামিন (ভিটামিন—এ, ভিটামিন—বি, ভিটামিন—সি, ভিটামিন—ডি, ভিটামিন—ই, ভিটামিন—এইচ, ভিটামিন—কে, ভিটামিন—পি, নিকোটিন অ্যাসিড)—২০-২৩।

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

যোগ-ব্যায়াম অভ্যাসকারীদের আরো কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বিষয় জেনে রাখা ভালো ... ২৪—৪৪

পাকস্থলীর কাজ—২৪, ক্ষুদ্রান্ত্রের কাজ—২৬, বৃহদন্ত্রের কাজ—২৬, বিপাক-ক্রিয়া—২৭, রেচন-তন্ত্র—২৭, শ্বসন-তন্ত্র—২৮, ফুসফুসের গঠন-প্রণালী ও তার কাজ—২৯, রক্ত-সংবহন-তন্ত্র—৩০, হৃৎপিণ্ড—৩০, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বলতে কি বোঝায়?—৩১, রক্ত—৩২, লোহিত কণিকা—৩২, শ্বেত-কণিকা—৩২, অণুচক্রিকা—৩৩, রক্তরস—৩৩, ধমনী—৩৩, শিরা—৩৩, জালক ও লসিকানালী—৩৩, জালক—৩৪, রক্তচাপ—৩৪, মেরুদণ্ড—৩৫, পেশী, পেশীর গঠন ও তার কাজ—৩৬, স্নায়ুতন্ত্র—৩৭, মস্তিষ্ক—৩৯, গ্রন্থি—৪১।

চতুর্থ অধ্যায়

বয়স অনুযায়ী যোগ-ব্যায়ামের তালিকা ... ৪৫—৪৬

দেহের বিভিন্ন অংশের পেশী, ধমনী, শিরা-উপশিরা, স্নায়ু, গ্রন্থি প্রভৃতি সুস্থ ও সক্রিয় রাখার উপযোগী কয়েকটি নির্দিষ্ট আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়াম—৪৬।

পঞ্চম অধ্যায়

খালি হাতে ব্যায়াম ... ৪৭—৮৫

১। ৪৭ পৃষ্ঠা থেকে ৭২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বেশ কয়েকটি খালি হাতে ব্যায়াম ও তার উপকার।

২। দেহের সহনশীলতা, কোমনীয়তা ও সন্ধি-স্থলের স্থিতি-স্থাপকতা বৃদ্ধি করতে কয়েকটি বিশেষ ব্যায়াম—৭৩।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সূর্য-নমস্কার ... ৮৬—৯২

সপ্তম অধ্যায়

আসন ... ৯৩—১৯০

শবাসন—৯৩, পবন-মুক্তাসন—৯৪, পশ্চিমোত্থানাসন (ক)—৯৬, পশ্চিমোত্থানাসন (খ)—৯৭, বিভক্ত-পশ্চিমোত্থানাসন—৯৮, জানুশিরাসন (ক)—৯৮, জানুশিরাসন (খ)—৯৯, দণ্ডায়-

বিষয় পৃষ্ঠা

মান-জানুশিরাসন—১০১, বিভক্ত-জানুশিরাসন—১০২, অর্ধ-কূর্মাসন—১০৩, উত্থিতপদাসন—১০৪, শলভাসন—১০৪, নৌকাসন—১০৬, ভুজংগাসন বা সর্পাসন (ক) ও (খ)—১০৬, পূর্ণ-ভুজংগাসন—১০৮, পদ্মাসন—১০৯, বন্ধ-পদ্মাসন—১১১, উত্থিত পদ্মাসন—১১২, পর্বতাসন—১১৩, তোলাঙ্গাসন—১১৪, সিদ্ধাসন—১১৬, বজ্রাসন—১১৮, সুপ্ত-বজ্রাসন—১২০, অর্ধ-মৎস্যেন্দ্রাসন—১২১, গোমুখাসন—১২৩, মণ্ডুকাসন—১২৫, হলাসন—১২৭, উষ্ট্রাসন—১২৮, পূর্ণ-উষ্ট্রাসন—১৩০, আকর্ণ-ধনুরাসন—১৩১, ধনুরাসন—১৩২, পূর্ণ-ধনুরাসন—১৩৪, শশংগাসন—১৩৫, মৎস্যাসন (ক)—১৩৬, মৎস্যাসন (খ)—১৩৭, ভেকাসন—১৩৮, সুপ্ত-ভেকাসন—১৩৯, অর্ধ-চন্দ্রাসন—১৪০, চন্দ্রাসন—১৪১, পদ-হস্তাসন—১৪৩, অর্ধ চক্রাসন—১৪৫, চক্রাসন—১৪৬, সর্বাংগাসন—১৪৭, বন্ধ-সর্বাংগাসন—১৪৮, পূর্ণ-বন্ধ-সর্বাংগাসন—১৪৯, ব্যাঘ্রাসন—১৫১, ৯-কারাসন (ক) ও (খ)—১৫২, ৯-কারাসন (গ)—১৫৪, গরুড়াসন—১৫৫, ভটনাসন—১৫৬, বৃক্ষাসন—১৫৮, বকাসন—১৬০, মার্গাসন—১৬২, কুক্কুটাসন—১৬৩, কর্ণ-পিঠাসন—১৬৪, মকরাসন—১৬৬, পূর্ণ-মকরাসন—১৬৭, ত্রিকোণাসন (ক)—১৬৮, ত্রিকোণাসন (খ)—১৬৯, চতুষ্কোণাসন—১৭০, ভদ্রাসন—১৭১, সিংহাসন—১৭৩, গর্বাসন—১৭৪, ময়ূরাসন—১৭৫, একহস্ত-ময়ূরাসন—১৭৬, বন্ধ-ময়ূরাসন—১৭৭, দণ্ডায়মান-একপদ শিরাসন—১৭৮, উৎকটাসন—১৮০, উপাধানাসন—১৮২, বীর-ভদ্রাসন—১৮৩, যোগনিদ্রা—১৮৪, ৯-কারাসন—১৮৫, বৃশ্চিকাসন—১৮৭, শীর্ষাসন—১৮৮।

অষ্টম অধ্যায়

মুদ্রা ... ১৯১—১৯৮

উড্ডীয়ান মুদ্রা—১৯১, অশ্বিনী মুদ্রা—১৯৩, শক্তিচালনী মুদ্রা—১৯৩, মহাবন্ধ মুদ্রা—১৯৩, মূলবন্ধ মুদ্রা—১৯৪, মহামুদ্রা—১৯৪, মহাবেধ মুদ্রা—১৯৪, বিপরীতকরণী মুদ্রা—১৯৫, যোগমুদ্রা—১৯৬, নৌলী—১৯৮।

নবম অধ্যায়

প্রাণায়াম ... ১৯৯—২০৬

কয়েকটি সাধারণ প্রাণায়াম—২০২, শীতলী—২০২, ভ্রমণ-প্রাণায়াম—২০৫।

বিষয় পৃষ্ঠা

দশম অধ্যায়

ধৌতি ... ২০৭—২০৯

অগ্নিসার ধৌতি—২০৭, সহজ অগ্নিসার ধৌতি—২০৭, বমন-ধৌতি—২০৮, নাসাপান—২০৮, সহজবস্তি-ক্রিয়া—২০৮।

একাদশ অধ্যায়

কয়েকটি সাধারণ রোগ ও তার প্রতিকার ... ২১০—২৭১

১। অজীর্ণ—২১০, ২। কোষ্ঠবদ্ধতা—২১১, ৩। আমাশয়—২১২, ৪। জিয়ার্ডিয়াসিস্—২১৩, ৫। আন্ত্রিক রোগ—২১৪, ৬। কলেরা—২১৫, ৭। অম্লরোগ—২১৭, ৮। কৃশতা—২১৯, ৯। মেদরোগ বা স্থূলতা—২২০, ১০। বহুমূত্র—২২২, ১১। রক্তচাপ রোগ—২২৪, ১২। স্নায়ু রোগ—২২৬, ১৩। কামলা রোগ (জন্ডিস)—২২৭, ১৪। মাথাধরা রোগ ও সাইনুসাইটিস্—২২৮ঃ—(ক) কফজ মাথাধরা—২২৮, (খ) পিত্তজ মাথাধরা—২২৯, (গ) রক্তজ মাথাধরা—২২৯, (ঘ) ক্ষয়জ মাথাধরা—২৩০, (ঙ) আধ-কপালে মাথাধরা—২৩০, (চ) ক্রিমিজ মাথাধরা—২৩০, সাইনুসাইটিস—২৩১, ১৫। হাঁপানি বা অ্যাজমা—২৩১, ১৬। ঋতুরোগ—২৩৩ঃ—(ক) ঋতুকালে বিলম্ব—২৩৩, (খ) ঋতুচলাকালে বিলম্ব—২৩৪, (গ) অতিরজঃ ও স্বল্পরজ—২৩৪, (ঘ) অলিগোমেনোরিয়া—২৩৪, (ঙ) মেট্রোরেজিয়া—২৩৫, (চ) বাধকবেদনা—২৩৫, (ছ) অনিয়মিত ঋতু—২৩৬, (জ) ঋতুকাল বিলম্ব—২৩৬, (ঝ) রজরোধ বা রজঃ বন্ধ—২৩৭, (ঞ) শ্বেত প্রদর—২৩৭, ১৭। মেনোপজ বা রজনিবৃত্তি—২৩৭, ১৮। ক্ষুধামান্দ্য—২৩৯, ১৯। রক্তাল্পতা ও অ্যানিমিয়া—২৩৯, ২০। বাতরোগ—২৪১, বেতোজ্বর—২৪২, ২১। জ্বর—২৪৩ঃ—বীজাণুঘটিত জ্বর—২৪৪, লক্ষণ অনুযায়ী জ্বর নির্ণয়—২৪৪, ডেঙ্গুজ্বর—২৪৫, ইনফ্লুয়েঞ্জা—২৪৬, ম্যালেরিয়া—২৪৭, নিউমোনিয়া—২৪৮, কালাজ্বর—২৪৯, মেনিনজাইটিস জ্বর—২৫০, ২২। হুপিং কাশি—২৫০, ২৩। মূর্ছা, হিষ্টিরিয়া, মৃগী ও সন্ন্যাসরোগ—২৫১, ২৪। পক্ষাঘাত—২৫৪, ২৫। বসন্ত—২৫৪, ২৬। প্লেগ—২৫৬, ২৭। চুলকানি, খোস-পাঁচড়া—২৫৭, ২৮। হার্টডিজিজ ও সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস্—২৫৯-২৬০, ২৯। সিরোসিস্ অফ লিভার—২৬১, ৩০। গ্যাসট্রাইটিস্ ও পেপটিক আলসার—২৬৩, ৩১। কোলাইটিস্—২৬৪, ৩২। নেফ্রাইটিস্—২৬৬, ৩৩। স্লীপ-ডিসক্, ফ্রোজেন শোল্ডার ও স্পন্ডিলাইটিস্—২৬৮।
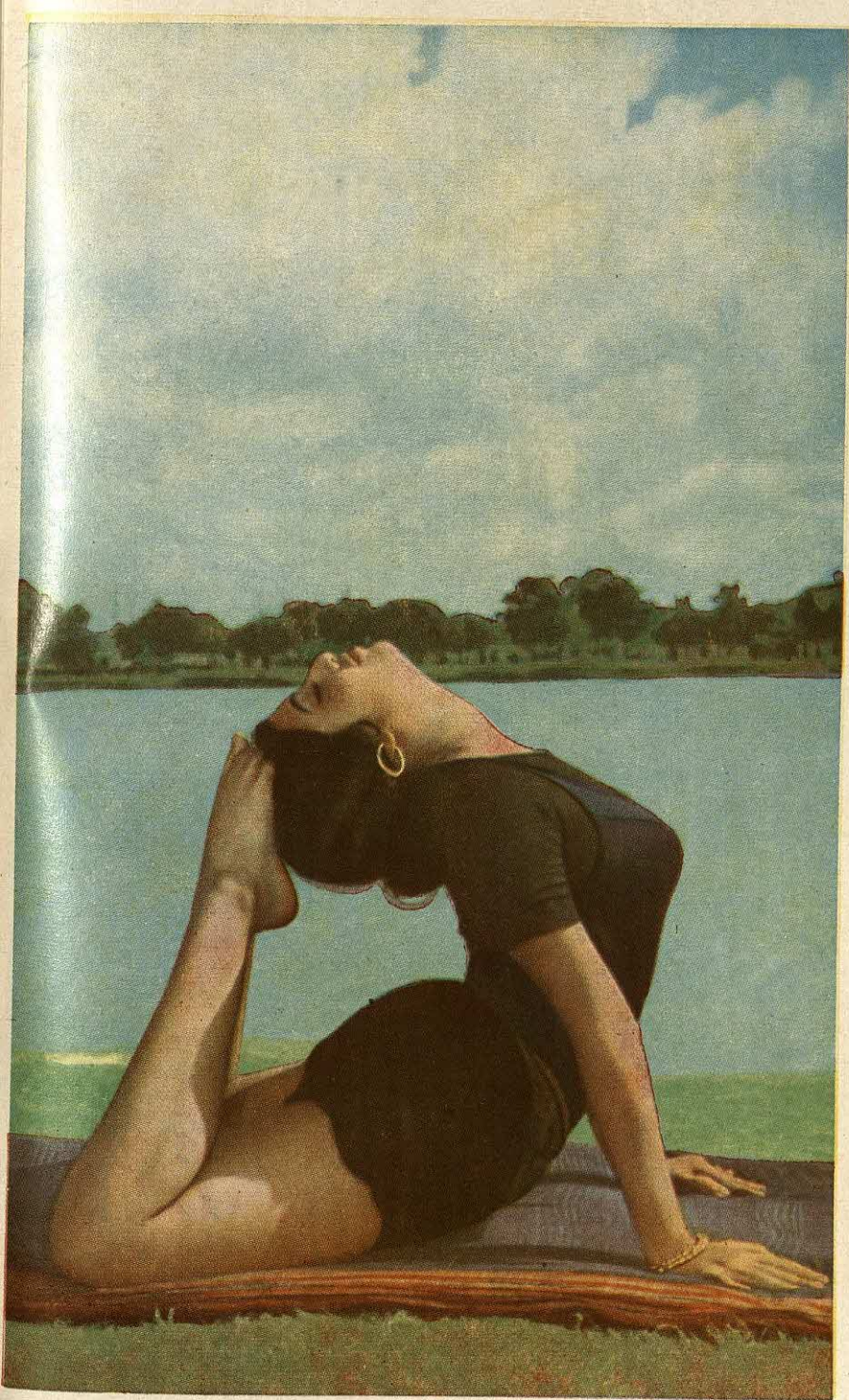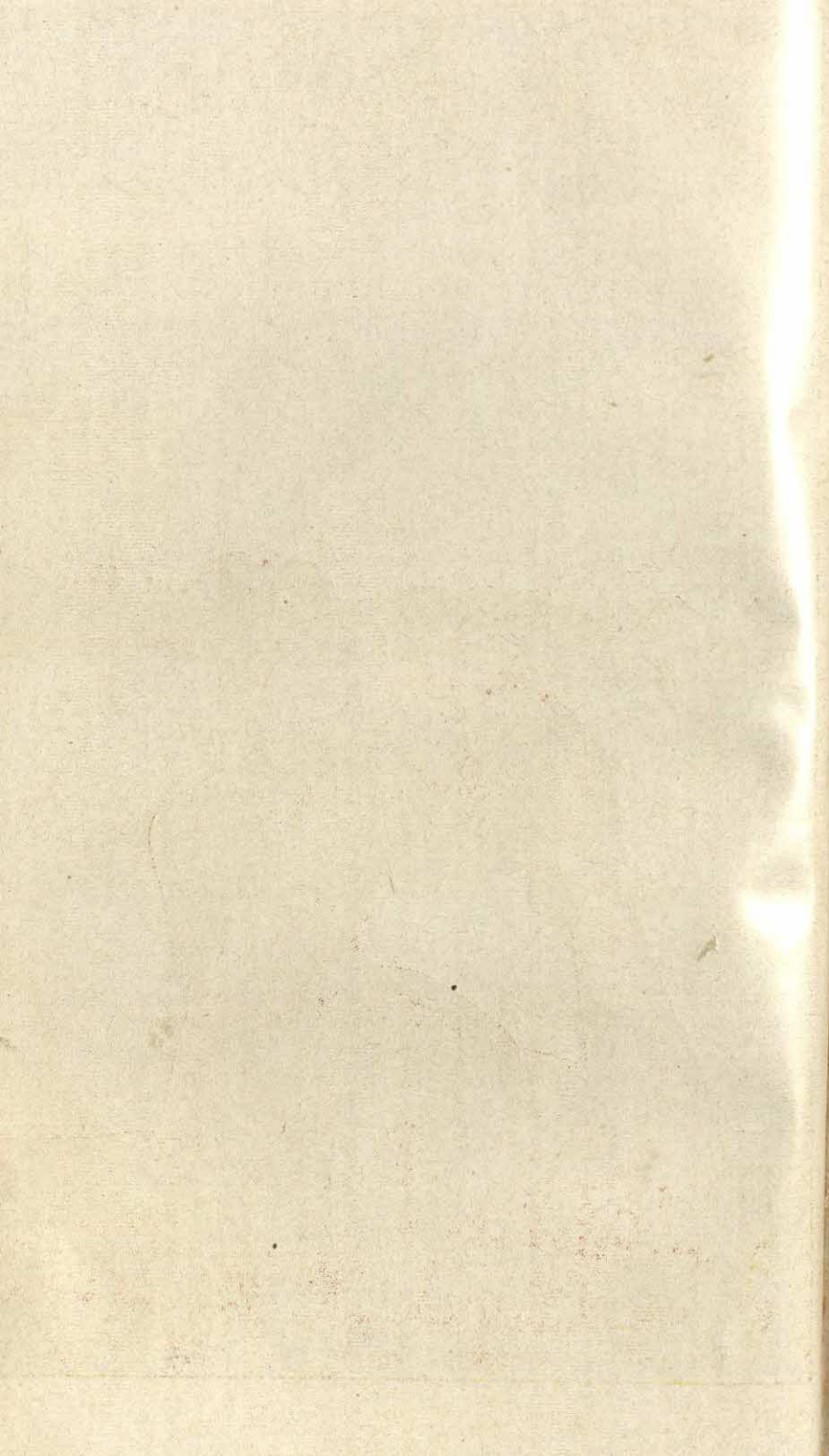
প্রথম অধ্যায়

স্বাস্থ্য ভালো রাখার উপযোগী কয়েকটি সাধারণ উপায়

১। সকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যা ত্যাগ করা উচিত। মুখ ধুয়েই এক থেকে দু'গ্লাস জল পান করা ভাল। তাতে সহজে কোন পেটের রোগ হয় না।

২। জল পান করেই কিছুক্ষণ খোলা জায়গায় পায়চারী করা উচিত। সকালের বিশুদ্ধ, আর্দ্র, অক্সিজেনযুক্ত বায়ু শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

৩। খালি পেটে চা বা কফি খাওয়া ঠিক নয়। খাওয়ার পূর্বে বা সঙ্গে অবশ্য কিছু খাওয়া প্রয়োজন।

৪। যতদূর সম্ভব আহার নিয়মিত ও পরিমিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। খিদে না থাকলে খাওয়া উচিত নয়। জেদ করে, বাজী রেখে বা লোভে পড়ে কখনও বেশী খাওয়া ঠিক নয়, ক্ষারধর্মী খাবারের চেয়ে অম্লধর্মী খাবার বেশী খাওয়া উচিত নয়।

৫। সপ্তাহে এক বেলা অথবা ১৫ দিনে একদিন উপবাস করলে পাকস্থলীর কর্মক্ষমতা ঠিক থাকে—দেহও রোগ মুক্ত থাকে। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় রাত্রে উপবাস করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

৬। আহারের সময় জল পান করা ঠিক নয়। আহারের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পরে জল পান করা উচিত। দিনে যত বেশী জল পান করা যায় স্বাস্থ্যের পক্ষে ততই উপকার। বেশী জল পান করলেও কোন ক্ষতি হয় না।

৭। তাড়াহুড়ো করে বা অন্যমনস্ক হয়ে আহার করা ঠিক নয়। আহারের সময় কথা বলা উচিত নয়।

৮। খাদ্যবস্তু ভাল করে চিবিয়ে খাওয়া বাঞ্ছনীয়। খাবার যত চিবিয়ে খাওয়া যায়, তত তাড়াতাড়ি তা হজম হয়।

৯। দুপুরে খাবার সময় ১২টা এবং রাত্রে খাবার সময় ৯টার পূর্বে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা, বেশী রাত্রে খেলে খাদ্যবস্তু ঠিকমত হজম হয় না। তাই রাত্রের আহার 'হালকা' ধরনের হওয়া উচিত। অধিক রাত্রে দুধ বা ঐ জাতীয় কিছু খাবার ছাড়া আর কিছু খাওয়া উচিত নয়।

১০। রাত্রে আহারের অন্ততঃ আধ-ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা পরে ঘুমাতে যাওয়া উচিত।

১১। অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর বিশ্রাম না নিয়ে খাওয়া ঠিক নয়, তেমনি আহারের পরও অবশ্যই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

১২। রোদ থেকে এসে বা অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা জল পান করা ঠিক নয়।

১৩। একজন বয়স্ক ব্যক্তির সাধারণতঃ দৈনিক ৭।৮ ঘণ্টা ঘুমানো উচিত। সুস্থ শরীরে দিবানিদ্রা শরীরের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর।

১৪। আহারের পর ভালো করে দাঁত পরিষ্কার করা উচিত। তাতে খাবারের কুচি দাঁত ও মাড়ির ফাঁকে জমে থাকতে পারে না। ফলে সহজে দাঁত নষ্ট হয়ে যায় না বা মাড়ির কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, দাঁত রোগগ্রস্ত হলে পেটের রোগ হতে বাধ্য।

১৫। মিষ্টি অথবা দুধ খেয়ে মুখ ধোওয়া উচিত। কোন কিছু গরম জিনিস খেয়ে বা পান করে সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা জিনিস খাওয়া বা পান করা উচিত নয়।

১৬। সকাল-সন্ধ্যায়, স্নানের সময় এবং বাইরে থেকে এসে মুখে জল দিয়ে, চোখ বন্ধ না করে, চোখে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দেওয়া এবং কপাল, ঘাড়, গলা ও হাত-পা ধোয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

১৭। মাঝে মাঝে নাক দিয়ে জল টানলে সহজে সর্দি-কাশি হয় না বা মাথা ধরে না।

১৮। দিনে অন্ততঃ দুবার স্নান করা উচিত। সুস্থ শরীরে গরম জলে স্নান করা ঠিক নয়।

১৯। রোদ থেকে এসে বা পরিশ্রমের পর বিশ্রাম না নিয়ে স্নান করা উচিত নয়।

২০। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—সবারই বয়স অনুযায়ী কিছু না কিছু ব্যায়াম করার প্রয়োজন আছে। আহার, নিদ্রা ও বিশ্রাম যেমন শরীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, তেমনি ব্যায়াম করাও অবশ্য প্রয়োজন।

২১। মনে ঈর্ষা, ক্রোধ প্রভৃতি কুচিন্তাকে ঠাঁই দেওয়া ঠিক নয়। মন যতদূর সম্ভব প্রফুল্ল রাখা বাঞ্ছনীয়। সব সময় নিজেকে একটা না একটা কাজে ব্যস্ত রাখা ভালো।

২২। সামান্য অসুখ-বিসুখে যখন তখন ওষুধ খাওয়া ঠিক নয়। সাধারণ অসুখ-বিসুখ হলে উপযুক্ত বিশ্রাম ও উপবাস করলে ঠিক হয়ে যায়।

২৩। অম্ল গরম অবস্থায় খাওয়া ঠিক নয়। রাত্রে দই না খাওয়াই ভালো।

২৪। চা, কফি যত কম খাওয়া যায় তত ভালো। কোন মাদক দ্রব্য, পান, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি না খাওয়া উচিত।

যোগ-ব্যায়াম অভ্যাসকারীদের কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

শুধু ওষুধ খেলে যেমন রোগ নিরাময় হয় না, তার সঙ্গে কিছু নিয়ম-নিষেধ পালন করতে হয়, তেমনি শুধু যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস করলে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় না—সঙ্গে কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। নিয়মিত যোগ-ব্যায়াম অভ্যাসে শরীর যে সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এর সঙ্গে চাই পরিমিত ও যতদূর সম্ভব নিয়মিত আহার, বিশ্রাম, সংযম, নিয়মানু-বর্তিতা, আত্মবিশ্বাস, অটুট মনোবল ও একাগ্রতা।

নিয়মিত যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস করতে হলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন ঃ

১। ৫।৬ বছর বয়স থেকে আরম্ভ করে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস করা যায়। তবে, প্রয়োজন অনুযায়ী কয়েকটি বেছে নিতে হবে। সব বয়সে সব রকম আসন করা যায় না। কমবয়েসী ছেলে-মেয়েদের কোন আসন

২ বারের বেশী করা ঠিক নয়। ছেলেদের ১৪।১৫ বছর বয়েসের পূর্বে আর মেয়েদের ঋতু প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রাণায়াম ও মুদ্রা অভ্যাস করা উচিত নয়।

২। সকাল, সন্ধ্যা ও স্নানের পূর্বে বা রাত্রে যে কোন সময় যোগ-ব্যায়াম করা যায়। তবে, সে সময় যেন ভরপেট না থাকে। অল্প কিছু খেয়ে আধ ঘণ্টা পরে আসন করা যেতে পারে, কিন্তু প্রাণায়াম বা মুদ্রা খালি পেটে অভ্যাস করাই বাঞ্ছনীয়। প্রাতঃক্রিয়াদির পর আসন করা ভাল। তবে, যাদের কোষ্ঠবদ্ধতা, পেট ফাঁপা প্রভৃতি রোগ আছে, তারা সকালে ঘুম থেকে উঠেই বিছানায় কয়েকটি নির্দিষ্ট আসন ও মুদ্রা করতে পারে। যাদের অনিদ্রা-রোগ আছে, তাদের রাত্রে খাবার পর শোবার পূর্বে কিছুক্ষণ বজ্রাসন করা উচিত।

৩। যাদের শরীরে কোন রোগ বা অসমতা আছে অথবা যাদের বয়স অত্যন্ত কম বা বেশী, তাদের জন্য অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিশ্চয়ই নিতে হবে। শুধু বই পড়ে বা ছবি দেখে তাদের যোগ-ব্যায়াম করা ঠিক নয়। এতে উপকারের পরিবর্তে অপকার হবার সম্ভাবনাই বেশী।

৪। আসন, মুদ্রা বা প্রাণায়ামে একটি ভঙ্গিমায় বা প্রক্রিয়ায় একবারে যতটুকু সময় সহজভাবে করা যায় বা থাকা যায়, ঠিক ততটুকু সময় করা বা থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে, কোন ক্ষেত্রে কয়েকটি নির্দিষ্ট আসন ছাড়া, একবারে ১ মিনিটের বেশী থাকা উচিত নয়। পদ্মাসন, ধ্যানাসন, সিদ্ধাসন ও বজ্রাসনে ইচ্ছামতো সময় নেওয়া যেতে পারে।

৫। একবারে ৭।৮টির বেশী আসন অভ্যাস করা ঠিক নয়। আসনের সঙ্গে বয়স অনুযায়ী ও প্রয়োজনমতো দু' একটি প্রাণায়াম, মুদ্রা অভ্যাস করলে অল্প সময়ে আরো ভালো ফল পাওয়া যায়। এক একটি আসন বা মুদ্রা অভ্যাসের পর প্রয়োজন-মতো শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। ৫।৭ মিনিট খালি হাতে কিছু ব্যায়ামের পর আসন বা মুদ্রা করলে ফল খুব দ্রুত পাওয়া যায়। কিন্তু কোন শ্রমসাধ্য কাজ বা ব্যায়ামের পর বিশ্রাম না নিয়ে, কোন প্রকার যোগ-ব্যায়াম করা উচিত নয়। সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

৬। আসন প্রভৃতি অভ্যাসকালে জোর করে বা ঝাঁকুনি দিয়ে কোন ভঙ্গিমা বা প্রক্রিয়া করা ঠিক নয়। আসন অবস্থায় মুখে যেন কোন বিকৃতি না আসে।

৭। আসন অভ্যাসকালে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। কিন্তু মুদ্রা বা প্রাণায়ামে নিয়মানুযায়ী শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৮। কম্বল, প্যাড্ বা পাতলা তোষকের ওপর আসন অভ্যাস করা বাঞ্ছনীয়। শক্ত মাটি বা পাকা মেঝেতে অভ্যাস করলে, যে কোন সময়ে দেহে চোট লাগতে পারে।

৯। আলো-বাতাসহীন বা বদ্ধ ঘরে যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস করা ঠিক নয়। এমন জায়গায় অভ্যাস করতে হবে, যেখানে বায়ুর সঙ্গে প্রচুর অক্সিজেন নেওয়া যায়।

১০। ১২।১৩ বছরের উপর এবং ৪৫।৪৬ বছরের নীচে (স্বাস্থ্যানুযায়ী বয়স-সীমা কম-বেশি হতে পারে) মেয়েদের স্বাভাবিক কারণে মাসে ৪।৫ দিন কোন আসন করা ঠিক নয়। তবে, ধ্যানাসন, শবাসন প্রভৃতি অভ্যাস করা যায়।

১১। সন্তানসম্ভবা হলে ৩ মাস পর্যন্ত কিছু সহজ আসন বা প্রাণায়াম করা যেতে পারে, কিন্তু মুদ্রা-অভ্যাস একবারে করা উচিত নয়। সন্তান প্রসবের ৩ মাস পর আবার ধীরে ধীরে সব আসনাদি অভ্যাস করা বাঞ্ছনীয়। গর্ভাবস্থায় সকাল ও সন্ধ্যায়, খোলা জায়গায় পায়চারী করা বিশেষ উপকারী।

১২। আসনাদি অভ্যাসকালে এমন কোন পোষাক পরা উচিত নয়, যাতে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। ছেলেদের ল্যাঙোট বা কৌপীন ব্যবহার করা উচিত।

১৩। যোগ-ব্যায়াম অভ্যাসকালে 'কথা বলা' বা অন্যমনস্ক হওয়া ঠিক নয়। কারণ মনের সঙ্গে দেহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যোগ-ব্যায়ামের মূলমন্ত্র। একাগ্রতাই অভীষ্ট ফল এনে দিতে পারে।

১৪। যোগ-ব্যায়ামে তাড়াতাড়ি ফল পাবার আশা করা ঠিক নয়। এতে বিশ্বাস ও ধৈর্যের একান্ত প্রয়োজন। নিয়মিত সময়ে ও নিয়মমতো যোগ-ব্যায়াম অভ্যাসে সুফল আসবেই।

১৫। যতটা সম্ভব মন প্রফুল্ল রাখা বাঞ্ছনীয়। কুচিন্তা বা দুশ্চিন্তা মনে যেন না আসে।

অন্যান্য ব্যায়ামের সঙ্গে যোগ-ব্যায়ামের পার্থক্য কোথায়?

এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে হ'লে ব্যায়ামের উদ্দেশ্য কি এবং সু-স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার। ব্যায়ামের উদ্দেশ্য যদি দেহে অসাধারণ পুষ্টি ও অমিত শক্তিধারণ হয় এবং এ দুটি গুণ যার আছে তাকে যদি সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী বলা হয়, তবে তা যোগ-ব্যায়াম দ্বারা লাভ করা সম্ভব নয়। আর যদি ব্যায়ামের উদ্দেশ্য হয় শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখা, দেহে রোগ প্রতিরোধ শক্তি বজায় রাখা এবং জরা-বার্ধক্যকে দূরে রাখা, তবে যোগ-ব্যায়াম অদ্বিতীয়। দ্বিতীয়টি যে ব্যায়ামের উদ্দেশ্য, আর যে ব্যক্তি এইসব গুণের অধিকারী তাকে যে সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী বলা যায়, সে বিষয়ে কারো বোধহয় দ্বিমত থাকতে পারে না।

দেহের স্বাভাবিক গঠন, পুষ্টি ও শক্তিলাভ যোগ-ব্যায়াম দ্বারা সম্ভব—কিন্তু স্ফীত পেশী ও অমিত শক্তিলাভ যোগ-ব্যায়াম দ্বারা সম্ভব নয়।

দেহে শুধু মাংসপেশী অস্বাভাবিক স্ফীত হ'লে বা অসাধারণ শক্তি থাকলেই রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না বা তার অধিকারীকে সুস্থদেহী বলা যায় না। তাই যদি হতো, তবে বড় বড় কুস্তিগীর বা মিঃ হারকিউলিস্, মিঃ ইউনিভার্স ও মিঃ মাস্‌ল্‌ম্যান অকালে মারা যেতেন না। প্রকৃতপক্ষে, এই সব লোকের দেহে প্রায়ই অকালে জরা-বার্ধক্য দেখা দেয় বা মৃত্যু হাতছানি দেয়। দীর্ঘকাল যন্ত্র নিয়ে অথবা অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য ব্যায়াম করলে শরীরের অত্যধিক শক্তি ক্ষয় হয়—দেহে অত্যধিক পৈশিক ক্রিয়া হয়। দেহে যতো বেশী পৈশিক ক্রিয়া হয়, শরীরে ততো বেশী কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস উৎপন্ন হয়। আর দেহে যতো বেশী কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস উৎপন্ন হয়, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ততো বেশী বৃদ্ধি পায়—কারণ হৃদ্‌যন্ত্র এই বিষাক্ত গ্যাস দেহ থেকে বের করে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। শারীর বিজ্ঞানে এটা পরীক্ষিত সত্য যে, দেহে কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস-এর পরিমাণ আমাদের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাব, অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য কাজে বা জোরে দৌড়ানোর সময় আমাদের হৃদ্-স্পন্দন বৃদ্ধি পায়—জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস বইতে থাকে। কারণ আর কিছু নয়, শ্রমসাধ্য কাজে বা দৌড়ানোর সময় দেহে অত্যধিক পৈশিক ক্রিয়া এবং প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস উৎপন্ন হয়। তখন ঐ গ্যাস দেহ থেকে বের করে দিতে ফুস্‌ফুস্ যথাসাধ্য চেষ্টা করে। একই কারণে এবং একইভাবে শ্রমসাধ্য ব্যায়ামে হৃদ্‌যন্ত্রকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে

হয়। কিন্তু দিনের পর দিন যদি হৃদ্‌যন্ত্রকে এইভাবে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়, তবে তার কর্মক্ষমতা কত দিন ঠিক থাকতে পারে? ফলে সেও দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান শ্রমসাধ্য ব্যায়ামে দেহের পেশীর পুষ্টি ও ওজন বাড়তে থাকে। তখন দুর্বল হৃদ্‌যন্ত্র বিশাল দেহ চালানোর ক্ষমতা হারায় এবং একদিন বিকল হয়ে পড়ে। যেমন, চার অশ্বশক্তি ইঞ্জিন যদি কোন বড় মালবাহী লরীতে লাগানো হয় তবে সেই ইঞ্জিন কতদিন সেই লরীকে টানতে পারবে? তাই আমরা প্রায়ই শুনতে পাই বা খবরের কাগজে দেখতে পাই, অনেক কুস্তিগীর বা অমুক শ্রেষ্ঠদেহী অল্প বয়সে হৃদ্‌রোগে বা রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এমনও দেখা যায়, অনেক পালোয়ান বা শ্রেষ্ঠদেহী দীর্ঘদিন কর্মক্ষমতা-হীন পঙ্গু দেহ নিয়ে কোন রকমে বেঁচে আছেন। কেন এমন হয়? কারণ তাঁরা শুধু প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করবার জন্য বা সাধারণ লোকের হাততালি কুড়োবার জন্য শরীরের শুধু একটা দিকের প্রতি নজর দিয়েছেন—দেহের অন্যান্য দেহ-যন্ত্রের দিকে তাকাবার সময় পাননি। যোগ-ব্যায়াম ছাড়া অন্য কোন ব্যায়ামে দেহের সর্বাঙ্গীন ব্যায়াম হয় না।

যোগ-ব্যায়ামের মুখ্য উদ্দেশ্য দেহের স্নায়ুতন্ত্র ও দেহ-যন্ত্রগুলির স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা ঠিক রাখা। স্নায়ুতন্ত্র দেহ-যন্ত্রকে পরিচালিত করে দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে খবর মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডে পেঁছে দেয়, আবার সেখান থেকে আদেশ বহন করে দেহের প্রয়োজনীয় অঙ্গকে চালিত করে। দেহের কোন অংশের স্নায়ু যদি বিকল হয়ে যায়, তবে দেহের সেই অংশটি অসাড় হয়ে পড়ে। আজ পর্যন্ত এমন কোন ব্যায়াম আবিষ্কৃত হয়নি যার দ্বারা এই অত্যাবশ্যক স্নায়ু-তন্ত্রের ব্যায়াম হয়। কুস্তি বা উগ্র যন্ত্র-ব্যায়ামে এই স্নায়ুজাল অনেক সময় বিকল হয়ে যায়—মস্তিষ্ক ও হৃদ্‌যন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সকল ব্যায়ামে দেহের শুধু কয়েকটি নির্দিষ্ট অংশের ব্যায়াম হয়।

জীবদেহের সকল যন্ত্রই তন্তুময়। আবার এই তন্তু কোষ দ্বারা গঠিত। কোষের গঠন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দরকার নিয়মিত প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ এবং নালীহীন গ্রন্থিসমূহের প্রয়োজনমতো রস-নিঃসরণ। অন্যদিকে চাই দেহের বিষাক্ত ও অসার পদার্থের অপসারণ। কোষের গঠন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দরকার প্রোটিন, শর্করা ইত্যাদি নানাজাতীয় খাদ্য ও অক্সিজেন। এই অক্সিজেন আমরা প্রায় সবটুকু প্রশ্বাসের মাধ্যমে পাই। সুতরাং, দেহের পরিপাক-যন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্র যদি সবল ও সক্রিয় না থাকে, তবে দেহের কোষ, তন্তু বা পেশী কিছুই সুস্থ থাকতে পারে না।

শ্বাসযন্ত্র ও পরিপাক-যন্ত্রগুলি দেহের দেহ-গহ্বরে অবস্থিত। দেহ-গহ্বর দুভাগে বিভক্ত—বক্ষ-গহ্বর ও উদর-গহ্বর। হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস্ বক্ষ-গহ্বরে এবং পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, অগ্ন্যাশয় প্রভৃতি পরিপাক-যন্ত্রগুলি উদর-গহ্বরে অবস্থিত। এই দুই গহ্বরের মাঝে ডায়াফ্রাম নামে একটি বিশেষ ধরনের শক্ত পেশীর পর্দা আছে। ফুস্‌ফুসের নিজের কোন কাজ করার ক্ষমতা নেই। ডায়াফ্রাম-এর পেশী, বক্ষ-প্রাচীর ও পেটের দেওয়ালের পেশীর সাহায্যে তাকে কাজ করতে হয় (ফুস্‌ফুস্ গঠন ও কার্যপ্রণালী দেখ)। শ্বাস নেওয়ার সময় ডায়াফ্রাম উদর-গহ্বরে নেমে যায় এবং চাপ দেয়। ফলে, উদরস্থ যন্ত্রগুলি একটু নীচের দিকে চলে যায় এবং তলপেট

উঁচু হয়ে ওঠে। আবার পেট ও তলপেটের পেশী সঙ্কুচিত হলে ও ডায়াফ্রামের পেশী প্রসারিত হলে শ্বাস বেরিয়ে যায়। পরিপাক-যন্ত্রগুলি যথাস্থানে ফিরে আসে। এইভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পরিপাক-যন্ত্রগুলিও ওঠা-নামা করে—ফলে স্বতঃক্রিয়ভাবে মৃদু মর্দন হয় বা ব্যায়াম হয়।

পরিপাক-ক্রিয়া সক্রিয় রাখতে হলে পেট ও তলপেটের পেশীগুলির সঙ্কোচন ও প্রসারণ ক্ষমতা বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। হজমশক্তিহীন ব্যক্তিদের তলপেটের পেশী শক্ত ও দুর্বল হয়ে যায়। ভুজংগাসন, উষ্ট্রাসন, ধনুরাসন, অর্ধ-চন্দ্রাসন প্রভৃতি আসনগুলি তলপেটের সম্মুখস্থ পেশীগুলি প্রসারিত ও পিঠের পেশীগুলি যেমন সঙ্কুচিত করে, তেমনি পদ-হস্তাসন, যোগমুদ্রা, পশ্চিমোত্থানাসন, জানুশিরাসন, হলাসন প্রভৃতি আসনগুলি পেটের পেশীগুলি সঙ্কুচিত ও পিঠের পেশীগুলি প্রসারিত করে। অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন দ্বারা পেট ও পিঠের দু-পাশের পেশীর উত্তম ব্যায়াম হয়। শলভাসনের দ্বারা ডায়াফ্রাম-এর খুব ভাল ব্যায়াম হয়। আবার উড্ডীয়ান ও নৌলি দ্বারা তলপেটের পেশীর আরো ভাল ব্যায়াম হয়। প্রাণায়াম-এর মত হৃদ্‌যন্ত্রের জন্য আর দ্বিতীয় ব্যায়াম নেই।

রক্ত-সংবহন-তন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের দেহের সর্বত্র রক্ত চলাচল করে এবং রক্ত থেকে দেহকোষগুলি প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে। এই রক্ত-সংবহন-তন্ত্রের প্রধান যন্ত্র হচ্ছে হৃৎপিণ্ড (হৃৎপিণ্ডের গঠনপ্রণালী ও কাজ দেখ)। তাছাড়া ধমনী (Artery), শিরা (Vein), জালকশ্রেণী (Capillaries) এবং লসিকানালী (Lymphatics) এই তন্ত্রের অন্তর্গত। এই হৃৎপিণ্ড এক বিশেষ ধরনের পেশী দ্বারা নির্মিত। দেহে রক্ত চলাচল এই হৃৎপিণ্ডের পেশীর সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। হলাসন, সর্বাঙ্গাসন, শলভাসন প্রভৃতি আসন দ্বারা হৃৎপিণ্ডের খুব ভাল ব্যায়াম হয়। সমস্ত দেহে রক্ত আনা-নেওয়া করতে ধমনী ও শিরার মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। ধমনীর যেমন দেহের উপরাংশে রক্ত পাঠাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়, তেমনি দেহের নিম্নাংশ থেকে রক্ত টেনে আনতে শিরার অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। আর এই মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয় হৃৎপিণ্ডকে। সর্বাঙ্গাসন, শীর্ষাসন প্রভৃতি আসনকালে হৃৎপিণ্ড কিছুক্ষণের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম পায়। এই সব আসনে দেহের ঊর্ধ্বাংশে প্রচুর রক্ত সঞ্চালিত হয়।

আগেই বলা হয়েছে, অক্সিজেন দেহ-কোষের পুষ্টির অন্যতম উপাদান। অত্যাবশ্যক অক্সিজেনের প্রায় সবটাই আমরা বায়ু থেকে ফুস্‌ফুসের মাধ্যমে পাই। সুতরাং, ফুস্‌ফুসের পেশী ও বায়ু-কোষের কর্মক্ষমতা কমে গেলে দেহে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে, দেহে দেহ-কোষ গঠন ও পুষ্টিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়—শরীরও দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া, প্রতি ৩ মিনিটে দেহের সমস্ত রক্ত একবার করে ফুস্‌ফুসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। এইভাবে ২৪ ঘণ্টায় ৪৮০ বার দেহের সমস্ত রক্ত ফুস্‌ফুসের মধ্য দিয়ে চালিত হয়। দেহের এমন একটি অত্যাবশ্যক যন্ত্রের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শল্‌ভাসন, উষ্ট্রাসন, ধনুরাসন প্রভৃতি আসন ও প্রাণায়াম ছাড়া আর কোন প্রকার ব্যায়াম আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

আগেই বলা হয়েছে, দেহ-যন্ত্রগুলির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দেহে উৎপন্ন বিষাক্ত গ্যাস ও অসার পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেওয়া অবশ্য দরকার। কার্বন ডাই-অক্সাইড্, ইউরিয়া, ইউরিক প্রভৃতি এ্যাসিড এবং মল-মূত্র প্রভৃতি অসার পদার্থ

দেহে জমে থাকলে প্রথমে দেহে নানাপ্রকার ব্যাধির সৃষ্টি করে, পরে দেহের সব যন্ত্র বিকল করে দেয়। শেষ পরিণাম—অকাল মৃত্যু। দেহ-যন্ত্র কার্বন ডাই-অক্সাইড্ নিঃশ্বাসের সাহায্যে, কফ-পিত্তাদি মলের সঙ্গে অথবা মুখ দিয়ে, আর ইউরিক ও ইউরিয়া প্রভৃতি এ্যাসিড মূত্রের সঙ্গে দেহ থেকে বের করে দেয়। আর লবণজাতীয় বিষাক্ত পদার্থগুলি ঘর্মগ্রন্থির সাহায্যে ত্বকের মাধ্যমে ঘামের আকারে দেহ থেকে বের হয়ে যায়। সুতরাং, এই সব নিঃসারক যন্ত্রগুলি সুস্থ ও সক্রিয় থাকলে দেহে উৎপন্ন এই সব বিষাক্ত ও অসার পদার্থ সহজেই দেহ থেকে বের হয়ে যেতে পারে। শ্বাস-যন্ত্রের কথা আগেই বলেছি, দেহের বৃক্কদ্বয়, মূত্রাশয়, মলনালী প্রভৃতি সুস্থ ও সক্রিয় রাখতে নৌলি, উড্ডীয়ান ইত্যাদি যোগ-ব্যায়াম অতুলনীয়। অন্য কোন ব্যায়ামে শরীরের এই সকল যন্ত্রের সঠিক ব্যায়াম হয় না।

আমাদের দেহের গ্রন্থিগুলি প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। নালী-যুক্ত ও নালীহীন। লালাগ্রন্থি, ঘর্মগ্রন্থি, অশ্রুস্রাবী প্রভৃতি গ্রন্থিগুলি নালীযুক্ত গ্রন্থি। লালাগ্রন্থি থেকে রস নিঃসৃত হয়ে খাদ্যের সঙ্গে মিশে খাদ্য পাকস্থলীতে পেঁছুতে ও হজম হতে সাহায্য করে। ঘর্মগ্রন্থির সাহায্যে দেহ থেকে ঘাম বের হয় আর অশ্রুস্রাবী-গ্রন্থির জন্য চোখ দিয়ে জল পড়ে। থাইরয়েড্, প্যারা-থাইরয়েড্, পিটিউটারী, পিনিয়্যাল, এ্যাড্রিনাল প্রভৃতি গ্রন্থিগুলি নালীহীন গ্রন্থি। এই সব গ্রন্থি থেকে যে রস নিঃসৃত হয়, তাকে হরমোন বলে। হরমোন রক্তের সংগে সরাসরি মিশে যায় এবং দেহের সকল ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রের গঠন, পুষ্টি ও সক্রিয়তায় সাহায্য করে (গ্রন্থি-পরিচয় দ্রষ্টব্য)। একমাত্র যোগ-ব্যায়াম ছাড়া আজ পর্যন্ত এমন কোন ব্যায়াম আবিষ্কৃত হয়নি, যার দ্বারা গ্রন্থি সুস্থ ও সক্রিয় রাখা যায়।

ব্যায়াম বহু প্রকার আছে। এর দ্বারা হাত, পা, কাঁধ প্রভৃতি অংশের পেশীর খুব ভাল ব্যায়াম হয়। ঐ সব ব্যায়ামে দেহের সব পেশীর ব্যায়াম হয় কি? যোগ-ব্যায়াম ছাড়া অন্য কোন ব্যায়ামে হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস্ ও অন্ত্রের পেশীর ব্যায়াম হয় না।

মেরুদণ্ড আমাদের দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আছে। এরই স্থিতি-স্থাপকতা ও সবলতার ওপর দেহের যৌবনশক্তি ও কর্মক্ষমতা নির্ভর করে। পদ-হস্তাসন, জানু-শিরাসন, পশ্চিমোত্থানাসন, অর্ধ-মৎস্যেন্দ্রাসন, অর্ধ-কূর্মাসন, অর্ধ-চন্দ্রাসন, শশঙ্গাসন, উষ্ট্রাসন, ধনুরাসন, ভুজঙ্গাসন, হলাসন প্রভৃতি আসনগুলি মেরুদণ্ড সবল ও নমনীয় রাখতে সাহায্য করে।

ধ্যানাসন, পদ্মাসন, সিদ্ধাসন প্রভৃতি আসন দ্বারা দেহে শারীরিক ব্যায়াম হয় না। কিন্তু, দেহের ও মনের প্রভূত উপকার হয়। এইসব আসনকালে দেহে পেশীর ক্রিয়া হয় না বল্লেও চলে। ফলে, দেহে অতি সামান্য কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস উৎপন্ন হয়। হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুসের কাজ মন্থর হয়—ফলে, তারাও কিছুটা বিশ্রাম পায়। মস্তিষ্ক ও দেহ ভারমুক্ত হয় ও বিশ্রাম পায়। মানসিক বিশ্রামে ও চিত্ত-শুদ্ধিতে আসনগুলি অদ্বিতীয়। তাছাড়া, এই সব আসনে পেটের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর রক্ত চলাচল করে। ফলে, হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়।

আমি যুক্তিতর্কের মাধ্যমে একথা বোঝাতে চাইছি না যে, অন্য কোন ব্যায়ামে আমাদের শরীরের ও মনের উপকার হয় না? নিশ্চয় হয়। কিন্তু, যোগ ব্যায়ামের মতো সর্বাঙ্গীন উপকার হয় না।

আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামের পার্থক্য ও উপকার

আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়াম সব প্রক্রিয়ারই মূল লক্ষ্য এক—শরীরকে সবল, সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখা—শুধু পথ আলাদা। আসন ও মুদ্রায় প্রধানত কাজ দেহের ধমনী, শিরা, উপশিরা ; স্নায়ুজাল, পেশী, শ্বাস-যন্ত্রাদি ও গ্রন্থিগুলিকে সবল ও সক্রিয় রাখা এবং পরিপাক ও নিঃসরণ-ক্রিয়াকে ঠিকভাবে পরিচালিত করা। আর প্রাণায়ামের প্রথম ও বিশেষ প্রভাব শ্বাস-যন্ত্রাদির ওপর—তারপর দেহের অন্যান্য অংশে। প্রাণায়ামকে দৈহিক ব্যায়াম না বলে, একটি উত্তম শ্বাস ব্যায়াম বলা যেতে পারে। শারীর-বিজ্ঞানের মতে প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য হ'লো শ্বাসগতির নিয়ন্ত্রণ।

সব আসন না করা গেলেও ৫।৬ বছর বয়স থেকে অনেক আসন অভ্যাস করা যায়, কিন্তু ১৪।১৫ বছরের কম বয়সের ছেলে-মেয়েদের প্রাণায়াম ও মুদ্রা অভ্যাস করা উচিত নয়।

আসন অভ্যাসকালে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে, কিন্তু মুদ্রা ও প্রাণায়াম অভ্যাসকালে নিয়মানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রাণায়ামে মন একাগ্রভাবে শ্বাসগতির অনুগামী থাকবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও তার উপাদান

প্রথমে একটিমাত্র জীবকোষ নিয়ে মাতৃগর্ভে একটি জীবের সৃষ্টি হয়। সেই মুহূর্ত থেকে একের পর এক কোষ সৃষ্টি হয়ে জীব বাড়তে থাকে। এই বৃদ্ধি মানবদেহে কম-বেশী প্রায় পঁচিশ বছর ধরে চলে। এই বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দেহ ভিতর ও বাইরে নিয়ত কাজ করে যায়। এই কাজের জন্য দেহের কোষগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয় পূরণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। আবার এই কাজের জন্য দেহে শক্তির প্রয়োজন হয়। এই শক্তি আমরা খাদ্যবস্তু থেকে তাপ আকারে পাই। তাহলে দেখা যাচ্ছে খাদ্যের কাজ হ'লো দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণ করা এবং দেহে তাপ সৃষ্টি ক'রে দেহ-যন্ত্রকে সক্রিয় রাখা।

দেহের উপাদান ও খাদ্যঃ যোগ-ব্যায়াম অভ্যাসকারীদের খাদ্য সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ না থাকলেও, বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ জেনে রাখা বাঞ্ছনীয়। আর এই খাদ্যের গুণাগুণ জানতে হলে, আমাদের দেহের উপাদান সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

দেহের মূল উপাদান বায়ু ও অক্সিজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও বিভিন্ন প্রকার ধাতব লবণ। এগুলির দ্বারা আমাদের দেহ গঠিত। এই লবণ-সমূহ নানাপ্রকার পদার্থ মিশ্রণে গঠিত। এই মৌলিক পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, লিথিয়াম, বেরিয়াম সালফার, ফস্‌ফরাস্, ক্লোরিন, ফ্লোরিন, আওডিন ও সিলিকন্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে প্রথম ১০টি ক্ষার (এ্যালকালি)-জাতীয় এবং শেষ ৬টি অম্ল (এ্যাসিড)-জাতীয়। ক্ষারজাতীয় পদার্থগুলির ভিতর ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম আর অম্লজাতীয় পদার্থের মধ্যে সালফার, ফস্‌ফরাস্, ক্লোরিন আমাদের দেহে বিশেষভাবে প্রয়োজন।

এখন এই চার প্রকার বায়ু ও বিভিন্ন প্রকার লবণের দেহে কার কি কাজ এবং এই সব উপাদান কোন্ কোন্ খাদ্য থেকে বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় তা জানতে পারলে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য নির্বাচন অনেকটা সহজ হয়ে যায়।

অক্সিজেনঃ আমাদের দেহে অক্সিজেনের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। খাদ্য-বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের দেহের শতকরা ৬২ ভাগ অক্সিজেন দ্বারা গঠিত।

অক্সিজেনের অভাব ঘটলে, যেমন জ্বলন্ত প্রদীপ আস্তে আস্তে নিভে যায় তেমনি আমাদের দেহে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিলে জীবন-দীপও ধীরে ধীরে নিভে আসে।

অক্সিজেন দেহ গঠন করে, দেহের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে, দেহ-যন্ত্র সক্রিয় রাখে, নিয়ত দগ্ধ হয়ে জঠরাগ্নিকে উদ্দীপ্ত করে ও দেহের তাপ রক্ষা করে। অক্সিজেন

প্রায় সব রকম খাদ্যের মধ্যে থাকে, তবে রসাল ফল ও শাক-সবজির মধ্যে বেশী অক্সিজেন পাওয়া যায়।

কার্বন: কার্বন অন্যান্য বায়ুর সঙ্গে মিশে দেহে শক্তি যোগায়, দেহের তাপ রক্ষা করে, দেহগঠনে সাহায্য করে ইত্যাদি। কার্বন-বায়ু আমাদের দেহে অত্যাবশ্যক, কিন্তু এই বায়ু প্রয়োজনাতিরিক্ত দেহে জমলে দেহ রুগ্ন হয়। দেহ মারাত্মক কার্বন-বিষে জর্জরিত হয়ে নানা রোগ ডেকে আনে। আমাদের দেহে যেমন অক্সিজেন দগ্ধ হয়ে কার্বনে পরিণত হয়, তেমনি বৃক্ষদেহে কার্বন দগ্ধ হয়ে অক্সিজেনে রূপান্তরিত হয়। এইভাবে জীব-জগৎ ও বৃক্ষ-জগৎ একে অপরকে সাহায্য করে।

অধিক কার্বন-সমৃদ্ধ খাদ্য—ঘি, মাখন, চর্বি, চাল, গম, ভুট্টা, যব, জই, জোয়ার, বাজরা, খেজুর, কিস্‌মিস্, চিনি, গুড়, মিছরি, মধু, আলু, কলা ইত্যাদি।

হাইড্রোজেন: আমাদের দেহে রক্ত, রস, শুক্র ও গ্রন্থির অন্তর্মুখী রসের কার্যকারিতার মূলে এই হাইড্রোজেন বায়ু।

হাইড্রোজেন-সমৃদ্ধ খাদ্য—সবুজ ও টাটকা শাক-সবজি এবং সব রকম রসাল ফল। নারকেলে প্রচুর হাইড্রোজেন পাওয়া যায়।

নাইট্রোজেন: নাইট্রোজেন আমাদের দেহ গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, স্নায়ু ও পেশী-গঠনে সহায়তা করে, দেহের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে এবং অক্সিজেন, কার্বন প্রভৃতি বায়ুর সমতা রক্ষা করে।

নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধ খাদ্য—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, গুঁড়া দুধ, ছানা, বিভিন্ন প্রকার ডাল ও বাদাম।

ক্যালসিয়াম: দেহে ক্যালসিয়ামের অনেক কাজ। ক্যালসিয়াম দন্ত ও অস্থি গঠন করে, জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত করে, হৃদ্‌যন্ত্র, স্নায়ু ও পেশী সক্রিয় রাখে, দেহের কোন স্থানে কেটে গেলে রক্ত পড়া বন্ধ করে, খাদ্যের স্নেহপদার্থ ও লৌহগঠিত লবণ গ্রহণে দেহকে সাহায্য করে। মায়ের বুকে দুধ সরবরাহ করে, শুক্র ধাতুর স্বাভাবিক গাঢ়ত্ব রক্ষা করে ইত্যাদি। নারী ও শিশুদের ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশী। শিশুদের দৈনিক প্রায় ১ গ্রাম এবং স্তনদানকারী মেয়েদের দৈনিক প্রায় ২ গ্রাম ক্যালসিয়াম দরকার হয়।

ক্যালসিয়াম-সমৃদ্ধ খাদ্য—দুধ, গুঁড়া দুধ, দই, পনির, ঘোল, ডিমের কুসুম, ছোট মাছ, বিভিন্ন প্রকার বাদাম ও ডাল, লেবু, কমলালেবু, আম, আনারস, পেঁপে, আঙ্গুর, বেদানা, ডালিম, আপেল, আমলকী প্রভৃতি সমস্ত প্রকার রসাল ফল, পুঁই-ডাঁটা প্রভৃতি সমস্ত প্রকার সবুজ শাক (পালংশাকের অক্‌জালিক এ্যাসিড আছে, তাই পালংশাকের ক্যালসিয়াম আমাদের দেহের কোন কাজে লাগে না)। চাল, গম, জোয়ার, ভুট্টা, রাঙা আলু, মুলা, গাজর, বীট, সাগু, পশু-পাখীর মাংস প্রভৃতিতেও অল্প পরিমাণে ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। দুধ সব চেয়ে বেশী ক্যালসিয়াম প্রধান খাদ্য।

পটাসিয়াম: পটাসিয়াম দেহের পেশী, তন্তু প্রভৃতিকে সবল ও সক্রিয় রাখে, প্রাণকোষ নির্মাণে সাহায্য করে এবং খাদ্য হজম করতে সহায়তা করে।

পটাসিয়াম-সমৃদ্ধ খাদ্য—প্রায় সমস্ত প্রকার শর্করাজাতীয় খাদ্য, শাক-সবজি, ফল, বিভিন্ন রকম বাদাম প্রভৃতি। প্রায় সব নিরামিষ খাদ্যে কম-বেশী পটাসিয়াম পাওয়া যায়। আমিষজাতীয় খাদ্যের মধ্যে পশু-পাখীর যকৃতে অল্প পরিমাণে এই লবণ পাওয়া যায়।

সোডিয়াম : সোডিয়াম দেহের প্রাণকোষ, তন্তু, পেশী প্রভৃতি গঠনে সহায়তা করে, খাদ্য হজম করতে সাহায্য করে, দেহের রোগ-বিষ নষ্ট করে এবং ক্যালসিয়ামের কাজেও সাহায্য করে।

সোডিয়াম-সমৃদ্ধ খাদ্য—প্রায় সব রকম পটাসিয়াম-সমৃদ্ধ খাদ্যের মধ্যে সোডিয়াম পাওয়া যায়।

লৌহ : লৌহ রক্তের হিমোগ্লোবিন বা রঞ্জক পিত্ত প্রস্তুত করতে প্রয়োজন হয়। যকৃৎ ক্ষরিত বিভিন্ন রসের মধ্যে একটির নাম রঞ্জক পিত্ত বা হিমোগ্লোবিন। এই রঞ্জক পিত্ত খাদ্যরসকে রঞ্জিত করে রক্তে পরিণত করে। রঞ্জক পিত্তের মধ্যে রক্তের লোহিত কণিকার সৃষ্টি হয়। এই লোহিত কণিকাই ফুসফুস সংগৃহীত বায়ু থেকে অক্সিজেন নিয়ে দেহের সর্বত্র সরবরাহ করে। আবার এই লোহিত কণিকাই দেহের কার্বন-বিষ সংগ্রহ করে আনে এবং নিশ্বাসের সঙ্গে বের করে দেয়। লৌহ আমাদের দেহে অত্যাবশ্যক। যকৃৎ দুর্বল হয়ে পড়লে ঠিকমত রঞ্জক পিত্ত উৎপন্ন হয় না। ফলে প্রথমে দেহে রক্তাল্পতা রোগ এবং পরে নানা রোগ দেখা দেয়। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের দেহে লৌহ-লবণের বেশী প্রয়োজন। মেয়েদের মাসিক রক্তক্ষরণের জন্য প্রচুর রক্ত বের হয়ে যায় এবং গর্ভবতী মেয়ে তার সন্তানকে নিয়ত লৌহগঠিত খাদ্য সরবরাহ করে। এই সব ঘাটতি পূরণের জন্য মেয়েদের প্রচুর লৌহ-সমৃদ্ধ খাদ্যের প্রয়োজন। ছেলে-মেয়েদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহে রক্ত বৃদ্ধি হওয়া দরকার। তাই কমবয়েসী ছেলে-মেয়েদেরও প্রচুর লৌহগঠিত খাদ্য প্রয়োজন। গর্ভবতী বা স্তনদানকারী মেয়েদের দৈনিক প্রায় ১৫ মিলিগ্রাম লৌহ-লবণ দেহে দরকার হয়। সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম ছেলেদের প্রায় ১২ মিলিগ্রাম লৌহ-লবণ দৈনিক দেহে প্রয়োজন হয়।

লৌহ সমৃদ্ধ খাদ্য :—পশুপাখীর যকৃত, মাংস, ডিম, মাছ, ঢেঁকিছাঁটা চাল, বজরা, গম, জোয়ার, ল্যাটুস, পেঁয়াজ, মুলা, তরমুজ, শালগম, সয়াবিন, শশা, তালমিশ্রি, করোলা, পালংশাক, নটেশাক, লালশাক, কাঁচকলা, চালকুমড়া, বরবটী, পেঁপে, পান ইত্যাদি।

ম্যাঙ্গানিজ : ম্যাঙ্গানিজ যকৃৎ ক্ষরিত রঞ্জক পিত্তের মধ্যে একটি উপাদান। এটি লৌহের যাবতীয় কাজে সাহায্য করে। দেহের স্নায়ু, পেশী প্রভৃতিকে সুস্থ ও সক্রিয় রাখে। দেহের রোগ-বিষ নষ্ট করে দেহকে রোগাক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

ম্যাঙ্গানিজ-সমৃদ্ধ খাদ্য—বিভিন্ন প্রকার ডাল ও বাদাম, আখরোট, ফুলকপি, লেটুস এবং শাক-সবজি।

ফস্‌ফরাস্ : ফস্‌ফরাস্ দন্ত, অস্থি, পেশী, তন্তু, স্নায়ু প্রভৃতি গঠনে ও তাদের ক্ষয়ক্ষতি পূরণে সাহায্য করে। তাছাড়া ক্যালসিয়ামের যাবতীয় কাজে সহায়তা করে।

ফস্‌ফর্যাস্-সমৃদ্ধ খাদ্য—সমুদ্রের ও নদীর ছোট ছোট মাছে সব চেয়ে বেশী ফস্‌ফরাস্ পাওয়া যায়। আমিষ ও নিরামিষ সব খাদ্যেই কম বেশী ফস্‌ফরাস্ আছে, তাই দেহে কোন দিন ফস্‌ফরাসের অভাব হয় না।

ম্যাগনেশিয়াম : ম্যাগনেশিয়াম দন্ত, অস্থি, তন্তু, স্নায়ু প্রভৃতি গঠনে ও তাদের ক্ষয়ক্ষতি পূরণে সাহায্য করে।

ম্যাগনেশিয়াম-সমৃদ্ধ খাদ্য—বিভিন্ন প্রকার বাদাম, তরিতরকারী ও শাক-সবজি।

সাল্‌ফার : সাল্‌ফার প্লীহা ও যকৃৎকে সুস্থ ও সক্রিয় রাখে, চুলের ও দেহের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষা করে।

সাল্‌ফার-সমৃদ্ধ খাদ্য—কাঁচা ডিম, ভুট্টা, যবের ছাতু, বাঁধাকপি, শাক-সবজি, পেঁয়াজ, মূলা প্রভৃতি।

ফ্লোরিন: ফ্লোরিন অস্থি ও দন্ত গঠনে এবং সংরক্ষণে বিশেষ প্রয়োজন। এটি ক্যালসিয়ামের সাহায্যকারী। চোখের স্বাস্থ্যরক্ষায় এর বিশেষ দরকার।

ফ্লোরিন-সমৃদ্ধ খাদ্য—বীট, বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি, ডিম ও কড্‌লিভার অয়েল।

ক্লোরিন: ক্লোরিন পটাসিয়াম ও সোডিয়ামের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করে, খাদ্য জীর্ণ করে এবং দেহের যাবতীয় দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেয়।

ক্লোরিন-সমৃদ্ধ খাদ্য—নারকেল, খেজুর, টমাটো, আনারস, কলা, বাঁধাকপি এবং বিভিন্ন রকমের সবুজ শাক-সবজি।

সিলিকন্‌: সিলিকন্‌ দেহের ধমনী, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি নরম ও নমনীয় রাখে, গায়ের রং এবং চুলের স্বাস্থ্যশ্রী বৃদ্ধি করে। ক্যালসিয়ামের সংগে দন্ত ও অস্থি গঠনে এবং সংরক্ষণে সাহায্য করে।

সিলিকন্‌-সমৃদ্ধ খাদ্য—যাবতীয় রসাল ফল, মূলা, বাঁধাকপি, শাক-সবজি ইত্যাদি।

আইওডিন: আইওডিন থাইরয়েড্‌ গ্রন্থির প্রধান খাদ্য। থাইরয়েড্‌ গ্রন্থি রক্ত থেকে আইওডিন নিয়ে পুষ্টি লাভ করে। এই আইওডিনপুষ্ট থাইরয়েড্‌ গ্রন্থির অন্তর্মুখী রস দেহের সর্বত্র সরবরাহ করে দেহের যৌবনশক্তি ও জীবনীশক্তি অটুট রাখে। যৌবন-আরম্ভে যদি থাইরয়েড্‌ গ্রন্থি থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী আইওডিন সংগ্রহ করতে না পারে, তাহলে পিটুইটারী গ্রন্থি দুর্বল হয়ে যায়। ফলে, দেহ বিকৃত হয়। বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিরও অভাব ঘটে। দেহে আইওডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ হয়। স্বামী-স্ত্রীর দেহে আইওডিনের অভাব থাকলে সন্তান নাও হতে পারে—আর হলেও সন্তান বোবা, বুদ্ধিহীন অথবা বিকৃত হয়। তাছাড়া, দেহের প্রাণকোষ নির্মাণে, স্নায়ু-জাল নিয়ন্ত্রণে এবং ক্যালসিয়ামের কাজে আইওডিনের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আইওডিনের অভাব ঘটলে, দেহে আস্তে আস্তে জরা নেমে আসে।

আইওডিন-সমৃদ্ধ খাদ্য—সমুদ্রের মাছ ও লবণ, সবুজ শাক-সবজি, তরিতরকারি, পেঁয়াজ, আনারস, তেঁতুল ও বিভিন্ন টকজাতীয় ফল। তাছাড়া ধনে, জিরে, গোলমরিচ, আদা প্রভৃতিতেও কিছু আইওডিন পাওয়া যায়।

তামা: তামা লৌহের কাজে সাহায্য করে। তামার সহায়তা ছাড়া লৌহ রক্তে হিমোগ্লোবিন সৃষ্টি করতে পারে না।

তামা-সমৃদ্ধ খাদ্য—প্রায় সব লৌহ-সমৃদ্ধ খাদ্যে কম-বেশী তামা পাওয়া যায়।

দেহের উপাদান ও খাদ্যের উপাদান আমরা পূর্বেই সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এখন দেখা যাক—কোন্‌ খাদ্যে, কি জাতীয় খাদ্যে কি পরিমাণ মোটামুটি খাদ্যের উপাদান ও তাপমূল্য আছে।

খাদ্য উপাদান ও তাপমূল্য ১০০ ভাগে

খাদ্যশস্য

খাদ্যের নাম	প্রোটিন	স্নেহজাতীয়	শর্করাজাতীয়	ধাতব লবণ	তাপমূল্য
আতপ চাল (ঢেঁকী ছাঁটা)	৮·৮	.৭	.৮০	.৬	৩৫০
আতপ চাল (কলে ছাঁটা)	৫·৬	.৩	৭৮.৬	.৪	৩৪৭.৫
সিদ্ধ চাল (ঢেঁকী ছাঁটা)	৯	.৭	৭৬.৫	৮.৭	৩৫২
সিদ্ধ চাল (কলে ছাঁটা)	৫·৯	.৫	৭৮.৯	.৮	৩৪৬
আটা	১২·২	১.৭	৭২.২	১.৯	৩৫৩
ময়দা	১১	১	৭৪.১	.৫	৩৫৮
মুড়ি	৭·৫	.২	৭৩.৯	৩.৭	৩২৭.৫
চিড়া	৭·৭	.০১	৭৭	৩.৩	৩৪৩.৫
খই ও মুড়ি	৭·২	.২	৭৬.৫	১.৮	৩৪২
যব	১২	১.২	৭০	১.৭	৩৩৪.৫
ভুট্টা	১১·৯	৩.৭	৬৬.৭	১.৫	৩৪২
বাজরা	১১.৭	৫.১	৬৭.১	২.৮	৩৬০
সাগু	·২	.১	৮৬.৯	.৩	৩৫০
সয়াবিন	৪৩·৭	২০	১০	৪.৫	৪৩৩
মসুরি	২৫·১	০.৬	৬০	২.৩	৩৪৭
খেসারী	২৮·১	০.৭	৫৮.৩	৩	৩৫৭
মুগ	২৪·১	১.৩	৫৭	৩.৭	৩৩৫
মাষকলাই	২৪	১.৫	৬০.১	৩.৫	৩৫১
মটর	২৩	১.৪	৬৩.৪	২.৩	৩৫৮
ছোলা	২২·৬	৫.১	৫৯	২.৩	৩৭৩
অড়হর	২২·২	১.৭	৫৭	৩.৭	৩৩৪
বরবটি	২৪·৫	০.৮	৫৫.৬	৩.১	৩২৭

বাদাম ও স্নেহজাতীয় খাদ্য

খাদ্যের নাম	প্রোটিন	স্নেহজাতীয়	শর্করাজাতীয়	ধাতব লবণ	তাপমূল্য
চীনাবাদাম	৩১·৬	৩৯.৭	১৯.৪	২.১	৫৬০.৯
হিজল বাদাম	২১·৩	৪৭	২২.৪	২.৩	৫৯৬
সাধারণ বাদাম	২০·২	৫৮.৭	১১	৩	৬৫৬
আখরোট	১৫·৭	৬৪.৬	১০.৯	১.৭	৬৮৭
পেস্তা	১৯·৭	৫৩.৭	১৬.১	২.৫	৬২৭
তিল	২০·২	৩৭	২৮.৭	২.৩	৫৩১
সরিষার তেল	২১·৯	৩৯.৫	২৩.৭	৪.৩	৫৪২
কডলিভার অয়েল	০	১০০	০	০	৯০০
নারকেল তেল	৩·৫	৪.৭৪	৪.৭	০.৩	৫৪৭
বনস্পতি	০	১০০	০	০	৯০০

দুধ ও দুধজাতীয় খাদ্য

খাদ্যের নাম	প্রোটিন	স্নেহজাতীয়	শর্করাজাতীয়	ধাতব লবণ	তাপমূল
মায়ের দুধ	১.২	৩.৯	৭.০	০.১	৬৭
গরুর দুধ	১.৭	৩.৭	৪.৮	০.৫	৬৫
ছাগলের দুধ	৩.৭	৫.৬	৪.৭	০.৮	৮৪
মহিষ দুধ	৪.৩	৮.৯	৫.১	০.৮	১১৭
গাধার দুধ	১.৭	১	৬.৫	.৫	৪৭
দই	২.৯	২.৯	৩.৪	.৭	৫১
ঘোল	.৮	১.১	০.৫	০.১	১৫
ঘি	×	৯৯.২	×	×	৯২২
মাখন	১.৫	৮৫	×	১.৫	৭৯০
ছানা	২১.৫	১৭.৫	.৭৬	১.৭৫	২৫২
পনির	২৪.১	২৫.৩	৬.৩	৪.২	৩৪৮
সরতোলা গুড়া দুধ	৩৮	১	৫১	৬.৮	৩৫৭
সরতোলা দুধ	২.৫	০.১	৪.৬	.৭	২৯

তরি-তরকারি

খাদ্যের নাম	প্রোটিন	স্নেহজাতীয়	শর্করাজাতীয়	ধাতব লবণ	তাপমূল্য
ওল	২.৩	৩	১৮.৫	.৯	৮০
মান কচু	২.৪	১.২	২২.৩	১.৬	৯৯.৯
অন্যান্য কচু	৩.৭	.৩	২২.৬	১.৫	১০০
আলু	১.৮	০.১	২৩	০.৫	৯৯
মেটে আলু	০.৯	০.২	৩৮.৬	১	১৬০
মিঠে আলু	১.৩	০.২	৩০.৫	০.৯	১৩১
মূলা	০.৭	০.৩	৭.৪	১	৩৫
বীট	১.৭	০.২	১৩.২	০.৮	৬২
গাজর	০.৯	০.১	১০.৬	১.২	৪৭
ওলকপি	৩.৫	০.২	৬	.৯	৩০
শালগম	০.৫	০.২	৭.৫	০.৭	৩৪
রসুন	৬.৩	১.১	২.৯	১	১৩২
পেঁয়াজ	১.৯	০.১	১৩.২	০.৫	৬২
কাঁচকলা	১.৫	০.৩	১৪.৫	০.৫	৬৬
থোড়	০.৫	০.২	৯.৭	০.৬	৪২
মিঠে কুমড়া	০.৫	০.১	৩.৩	০.২	১৫
চালকুমড়া	০.৫	০.১	৪.৩	০.৩	২০
লাউ	০.৩	০.১	২.৯	০.৫	১৩
বেগুন	১.৩	০.৩	৬.৫	০.৫	৩৪
বিলাতি বেগুন	২	০.১	৪.৫	০.৬	২৭
ঝিঙগা	০.৫	০.১	৩.৬	০.৩	১৮

খাদ্যের নাম	প্রোটিন	স্নেহজাতীয়	শর্করাজাতীয়	ধাতব লবণ	তাপমূল্য
বাঁধাকপি	১·৮	০.১	৬.৩	০.৭	৩৩
ফুলকপি	৩·৫	০.৫	৫.৩	১.৫	৩৯
উচ্ছে	২·৯	১	১.০	১.৪	৬০
করলা	১·১	০.১	৪.৩	০.৮	২৫
কাঁঠালবীচি	৬·৭	০.৫	৩৮.৫	১.৫	১৮৪
ঢ্যাঁড়স	২·২	০.২	৭.৬	০.৭	২৭
সিম	৪·৫	০.২	১০	১	৫৯
সজিনা	২·৫	০.১	৩.৫	২	২৬
বীন	১·৭	০.১	৪.৫	০.৫	২৬
পেঁপে	০·৫	০.২	৯.৫	০.৪	৪০

শাক-সব্জি

খাদ্যের নাম	প্রোটিন	স্নেহজাতীয়	শর্করাজতীয়	ধাতব লবণ	তাপমূল্য
পুঁই শাক	৫·৩	×	×	২·৫	×
পালং শাক	১·৯	০.৯	৪	১.৫	৩২
কলমি শাক	৩	০.৫	৪.৩	১	৩২
নটে শাক	৫	০.৫	৫.৭	৩	৪৭
বেথুয়া শাক	৪·৭	০.৫	৩.৭	৩.৩	৩৭
খেসারী শাক	৬	১	৭.৬	১	৬৪
ছোলা শাক	৭	১.৫	১১.৫	২	৫২
সরিষা শাক	৫	০.৫	৭	২.৫	৫২
ধনে শাক	৩·৩	০.৫	৬.৫	১.৭	৪৫
পুদিনা শাক	৪·৮	০.৬	৮	১.৫	৬৭
মেথি শাক	৫	১	১০	১.৬	৬৭
হেলেঞ্চা	৩	০.২	৫.৫	২.৩	৩৫
সজনে পাতা	৬·৭	০.২	১৩.৫	২.৩	৯৬
ল্যাটুস	২·২	০.৩	৩	১.২	২৩
নিমপাতা	৭·১	১	২.৩	৩.৫	১৫৮

ফল

খাদ্যের নাম	প্রোটিন	স্নেহজাতীয়	শর্করাজাতীয়	ধাতব লবণ	তাপমূল্য
কলা	১·৩	০.২	৩৬.৪	০.৭	১৫০
আম	০·৬	০.১	১১.৮	০.৪	৫০
কাঁঠাল	২	০.১	১৯	০.৮	৮৪
পেয়ারা	১·৫	০.২	১৪.৫	০.৭	৬০
নারকেল	৪·৫	৪১.৬	১৩	১	৪৪৪
জাম	৩·২	০.১২	৩.২	১.৭	১২
লিচু	২·৮	০.২৩	৬.৩	১	২২
আনারস	০·৬	০.১	১২	০.৫	৫০

খাদ্যের নাম	প্রোটিন	স্নেহজাতীয়	শর্করাজাতীয়	ধাতব লবণ	তাপমূল্য
কমলালেবু	১	0.৩	১0.৫	0.৪	৪৯
তরমুজ	0·১	0.২	৩.৮	0.২	১৭
ফুটি	১·৩	0	৪	0.৭	১২
জামরুল	0·৫	১0	১0	0.৫	৪৪
কুল	0·৮	0.১	১২.৮	0.৪	৫৫
তেঁতুল	৩·১	0.১	৬৭.৪	২.৯	২৮৩
ডালিম	১·৬	১0	১৪.৫	0.৭	৬৫
আপেল	0·৪	0.১	১৩.৪	0.৩	৫৬
আঙুর	১	0.১	১0	0.৪	৪৫
খেজুর	৩	0.২	৬৭.৩	১.৩	২৮৩
কিসমিস্	২	0.২	৭৭.৩	২	৩১৯
জলপাই	১·৪	0.১	৩৩.৭	১	১৪১
লেবু	১	১	১১	0.৩	৫৭
বেল	0·৭	0.৭	১৬.২	0.৮	৭৫

মিষ্টিজাতীয় খাদ্য

খাদ্যের নাম	প্রোটিন	স্নেহজাতীয়	শর্করাজাতীয়	ধাতব লবণ	তাপমূল্য
খেজুর গুড়	১·৪৬	0.২৬	৮৬.৭	.0৫	৩৬৪
তালগুড়	১·৩৭	0.১১	৮৭.৩৭	0.৫	৩৬৫
আখের গুড়	0·৪	0.১	৯৫	0.৬	৩৮৩
চিনি	0	0	৯৬.৫	0	৩৯0
মধু	0·৫	0	৭৩	0.৩	৩২৫

ঝাল ও মসলা

খাদ্যের নাম	প্রোটিন	স্নেহজাতীয়	শর্করাজাতীয়	ধাতব লবণ	তাপমূল
কাঁচালংকা	৪·৮	২.৭	২৭.৩	১.৮	১৫৩
জিরা	১৮·৭	১৫	৩৬.৬	৫.৮	৩৫৬
গোলমরিচ	১১·৫	৬.৮	৪৯.৫	৪.৫	৩0৫
ধনে	১৪·১	১৬	২১.৫	৪.৪	২৮৮
লবঙ্গ	৫·২	৮.৯	৪৭.৯	৫.২	২৯৩
হলুদ	৬·৩	৫	৬৯.৪	৩.৫	৩৪৯
আদা	২·৩	১	১২.৩	১.২	৬৭৭
এলাচি	১0·২	২.২	৪২	৪.৫	২২৯

এখন দেখা যাক মানবদেহের কোন বয়সে কতটুকু তাপমূল্যের দরকার। আধুনিক খাদ্য-বিজ্ঞানীদের মতে বয়সানুযায়ী দেহে নিম্নলিখিত তাপমূল্য দরকার।

বয়স	তাপমূল্য
১ থেকে ৩ বৎসর	৮৪০ থেকে ১০০০
৪ থেকে ৭ „	১০০১ থেকে ১৪০০
৮ থেকে ১০ „	১৪০১ থেকে ১৯২০
১১ থেকে ১৫ এবং তদূর্ধ্ব	১৯২১ থেকে ২৪০০

বিঃ দ্রঃ—Food & Nutrition in India by an Indian Dietarian Food Bulletin by Government of India এবং অন্যান্য Publication থেকে সংগৃহীত।

খাদ্যের উপাদান

খাদ্যের যে বস্তুর জন্য তাকে খাদ্য বলা হয়, সেই বস্তুই ঐ খাদ্যের উপাদান (Nutrient)। কোন খাদ্যের খাদ্যমূল্য ও তার উপাদানের শ্রেণী কতটুকু পাওয়া যাবে সকলই নির্ভর করে খাদ্যবস্তুর ওপর। আধুনিক খাদ্য-বিজ্ঞানীদের মতে খাদ্যের উপাদান মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—(১) প্রোটিন, (২) কার্বোহাইড্রেট, (৩) স্নেহপদার্থ, (৪) বিভিন্ন ধাতব লবণ এবং (৫) ভিটামিন।

কোন একটি খাদ্যে এক বা একাধিক উপাদান থাকতে পারে। প্রোটিন, কার্বো-হাইড্রেট, স্নেহজাতীয় পদার্থ আমাদের খাদ্যের প্রধান অংশ ব'লে তাদের প্রধান উপাদান বলা হয় এবং ধাতব লবণ ও ভিটামিন খাদ্যে কম থাকে বলে তাদের আনুষঙ্গিক উপাদান বলে।

প্রোটিনঃ আমাদের দেহ অসংখ্য কোষ সমন্বয়ে গঠিত। এই সব জীবকোষের প্রধান উপাদান হলো প্রোটিন। প্রোটিন দেহ বৃদ্ধি করে, দেহের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে, দেহের সারাংশ ও পেশী প্রভৃতি গড়ে তোলে এবং দরকার হলে দেহে তাপও সৃষ্টি করে। তাছাড়া এ্যান্টি বডি নামক একপ্রকার প্রোটিন পদার্থ দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে। রক্তের মধ্যে রঞ্জক পিত্ত নামক প্রোটিন ফুস্‌ফুস্ থেকে বায়ুর অক্সিজেন নিয়ে দেহের সর্বত্র পরিবেশন করে। পেপ্‌সিন, ট্রিপ্‌সিন প্রভৃতি জারক রস প্রোটিন থেকে সৃষ্ট হয়।

প্রোটিন খাদ্যে নাইট্রোজেন বায়ুরই প্রাধান্য। প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য ছাড়া অন্য কোন খাদ্যে নাইট্রোজেন পাওয়া যায় না, তাই প্রোটিনকে নাইট্রোজেনাস্ খাদ্য বলা হয়। প্রোটিন-প্রধান খাদ্যে অক্সিজেন, কার্বন ও হাইড্রোজেন বায়ু কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে, আমাদের দেহের প্রধান উপাদান হলো প্রোটিন। এই প্রোটিন কতকগুলো এ্যামিনো এ্যাসিডের সাহায্যে দেহের মধ্যে তৈরী হয়। কতক-গুলো এ্যামিনো এ্যাসিড দেহ নিজে প্রস্তুত করে অভাব মিটাতে পারে না, তাই বাইরের খাদ্যদ্রব্যর সাহায্যে এই এ্যামিনো এ্যাসিড নিয়ে আসতে হয়। এই এ্যামিনো এ্যাসিডকে অত্যাবশ্যক এ্যামিনো এ্যাসিড বলে। আরজিনাইন্, লিউমিন্ প্রভৃতি এই ধরনের এ্যামিনো অ্যাসিড। যে সমস্ত এ্যামিনো এ্যাসিড দেহ নিজে প্রস্তুত করে তাকে বলা হয় অপ্রয়োজনীয় এ্যামিনো এ্যাসিড।

প্রোটিনকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করলে প্রথমে কতকগুলো এ্যামিনো এ্যাসিড এবং হাইড্রোজেন, কার্বন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ উৎপন্ন হয়।

মানবদেহে চর্বি বা কার্বোহাইড্রেট সঞ্চয়ের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু প্রোটিন সঞ্চয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রোটিন খাওয়া কখনও উচিত নয়। অতিরিক্ত প্রোটিন দেহের কোন কাজে আসে না বরং দেহকে রুগ্ন করে। তা শরীরের ভিতরে দূষিত পদার্থ সৃষ্টি করে দেহে নানা রোগ ডেকে আনে। সাধারণতঃ ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের প্রোটিনের প্রয়োজন কম। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় যেমন গর্ভাবস্থায় বা স্তনদানকালে মেয়েদের শরীরে প্রোটিনের বেশী প্রয়োজন হয়, কারণ, তার কিছু অংশ সন্তানকে দিতে হয়। একজন সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম পুরুষের দৈনিক প্রোটিন প্রয়োজন হয় ৬৫ থেকে ৭০ গ্রাম। মেয়েদের সাধারণতঃ ১০ গ্রাম কম হলেও কোন ক্ষতি হয় না। অবশ্য দেশ ও কাজ অনুযায়ী এই প্রয়োজনীয়তা কম-বেশী হতে পারে। আমাদের দেশে দেহের বৃদ্ধিকাল জন্মদিন থেকে প্রায় ২৫/৩০ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কিন্তু শীতপ্রধান দেশে এ বৃদ্ধি আরো কয়েক বছর পর্যন্ত চলে। এই বৃদ্ধিকাল পর্যন্ত দেহে বেশী প্রোটিন দরকার হয়। নিম্নে বয়স অনুযায়ী ছেলে-মেয়েদের সাধারণতঃ যতটুকু প্রোটিন প্রয়োজন তা দেওয়া হল।

শিশু	১	বছর	থেকে	৬	বছর	২৫	থেকে	৪৫	গ্রাম
"	৬	"	"	৯	"			৬০	"
বালক	১০	"	"	১৭	"			৮০	"
বালিকা	১০	"	"	১৭	"			৭০	"
পুরুষ	১৮	"	"	২৫	"	৮০	"	৮৫	"
নারী	১৮	"	"	২৫	"	৭০	"	৭৫	"
নারী গর্ভাবস্থায় বা স্তনদান কালে						৭৫	"	৮৫	"
পুরুষ	২৫	বছর	থেকে	৬০	"			৬৫	"
নারী	২৫	"	"	৬০	"			৫০	"

অবশ্য আগেই বলা হয়েছে যে, দেশ ও কাজ অনুযায়ী এর প্রয়োজনীয়তা কম বা বেশী হতে পারে।

আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্য থেকে প্রোটিন পাওয়া যায়।

প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্য—মাংস, ডিম, মাছ, পশু-পাখীর যকৃৎ (লিভার). বৃক্ক (কিড্‌নি), দুধ, দই, ছানা, পনির, সয়াবীন, বিভিন্ন প্রকার বাদাম ও ডাল, শাক-সবজি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্য—চাল, গম, ভুট্টা, রাগী, আলু, গাজর, বীট, শালগম ও বিভিন্ন প্রকার ফল।

কার্বোহাইড্রেট (শর্করাজাতীয় খাদ্য) ঃ

কার্বোহাইড্রেট কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন-এর সমন্বয়ে গঠিত। সাধারণতঃ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ২ ঃ ১ অনুপাতে থাকে। তাই, এই জাতীয় খাদ্যকে কার্বোহাইড্রেট বলা হয়। আমাদের দেহে কার্বোহাইড্রেটের অনেকগুলো কাজ করতে হয়। যেমন—(১) তাপ ও শক্তি সরবরাহ করা। সেইজন্য কার্বোহাইড্রেটের আর এক নাম জ্বালানি খাদ্য। (২) খাদ্যের প্রোটিন, ভিটামিন ও ধাতব লবণ গ্রহণে সাহায্য করা। (৩) প্রোটিনকে তাপ উৎপাদনের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া।

(৪) স্নেহজাতীয় পদার্থ দহনে সাহায্য করে কিটোনিস্ নামক একপ্রকার রোগ থেকে দেহকে রক্ষা করা। (৫) অন্ত্রে একপ্রকার জীবাণু থেকে ভিটামিন-বি ও কে তৈরী করে, দেহে ঐ সকল ভিটামিনের অভাব পূরণ করা এবং (৬) কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের হাত থেকে দেহকে রক্ষা করা। সেলুলোজ নামক কার্বোহাইড্রেট কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ দূর করে।

প্রয়োজনাতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট-সমৃদ্ধ খাদ্য না খাওয়াই উচিত। আধুনিক খাদ্য-বিজ্ঞানীদের মতে একজন পূর্ণবয়স্ক ছেলে-মেয়ের দৈনিক ১২ থেকে ১৬ আউন্স কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। অবশ্য, গর্ভবতী ও স্তনদানকারী মেয়েদের একটু বেশী প্রয়োজন হয়। অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট অন্ত্রে জমে পচে গ্যাস ও এ্যাসিড সৃষ্টি করে। ফলে, প্রথমে অজীর্ণ, পেটফাঁপা রোগ দেখা দেয় এবং পরে নানা জটিল রোগ দেহকে আক্রমণ করে। দাঁতের ক্ষয়রোগ এবং মেদবৃদ্ধি রোগ এই অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট থেকে আসে। তাছাড়া, দেহে অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট থাকলে দেহ খাদ্যের অন্যান্য দ্রব্য (যেমন—প্রোটিন, লবণ, ভিটামিন প্রভৃতি) প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করতে পারে না।

প্রথম শ্রেণীর কার্বোহাইড্রেট-সমৃদ্ধ খাদ্য—চিনি, মিছরি, গুড়, মধু, সিমলা আলু, সাগু, গম, যব, ভুট্টা, চাল, রাগী, জই, বজরা, জোয়ার, শুকনো ফল, বিভিন্ন প্রকার ডাল, হলুদ, তেঁতুল প্রভৃতি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্বোহাইড্রেট-সমৃদ্ধ খাদ্য—কলা, মুলা, বীট, গাজর, পেঁয়াজ, আলু, মিষ্টি আলু, আম, কাঁঠাল ও কাঁঠালবীচি, নারকেল, বিভিন্ন রকমের বাদাম, এলাচী, লবঙ্গ, জিরে, ধনে, মরিচ, আদা, সীম, তরিতরকারী, শাকসবজি প্রভৃতি।

স্নেহপদার্থ : কার্বোহাইড্রেটের মত স্নেহপদার্থকেও দেহে অনেক কাজ করতে হয়। যেমন—

(১) তাপ ও শক্তি উৎপাদন করা।

(২) তাপের অপচয় বন্ধ করা।

(৩) দেহের মসৃণতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করা।

(৪) ভিটামিন 'এ', 'ডি', 'ই' এবং 'কে'-কে দ্রবীভূত করে দেহের গ্রহণযোগ্য করা।

(৫) লিনো-লেয়িক, এ্যারাচি-ডোনিক প্রভৃতি কতকগুলো এ্যাসিড তৈরী করে দেহকে সুস্থ রাখা।

দেহ নিজে এই এ্যাসিডগুলি তৈরী করতে পারে না, অথচ দেহে এগুলোর অভাব ঘটলে এক্জিমা প্রভৃতি চর্মরোগ দেখা দেয়—শরীরের ত্বক শুষ্ক ও খস্‌খসে হয়ে যায়।

(৬) অসময়ে দেহ-যন্ত্রকে চালু রাখা।

আমরা যদি কোন কারণে কোন সময় খাদ্য গ্রহণ করতে না পারি, অথবা ইচ্ছা করে উপবাস করি, তবে দেহের সঞ্চিত চর্বি দেহ-যন্ত্রকে চালু রাখতে সাহায্য করে।

(৭) দেহকে কাজের ও চলাফেরার উপযোগী করা।

আমাদের দেহ অস্থিময়। সেকারণে দেহে যদি কিছু পরিমাণ চর্বি না থাকত, তবে চলাফেরার অসুবিধা হতো।

স্নেহজাতীয় খাদ্য যেমন আমাদের দেহে অত্যাবশ্যক, তেমনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্নেহজাতীয় খাদ্য দেহের পক্ষে অনিষ্টকর। অত্যধিক স্নেহজাতীয় খাদ্য অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ সৃষ্টি করে। দেহে অতিরিক্ত মেদ জন্মায়, হৃদ্‌রোগ ও বহুমূত্র রোগের সৃষ্টি করে। আবহাওয়ার তারতম্য অনুসারে একজন পূর্ণবয়স্ক নারী বা পুরুষের দৈনিক ৬৫ থেকে ৮০ গ্রাম স্নেহজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। এমন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত, যা থেকে মোট প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তির শতকরা ২৫ ভাগ স্নেহজাতীয় খাদ্য থেকে পাওয়া যেতে পারে। স্নেহজাতীয় খাদ্য আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার হইতে পারে।

প্রথম শ্রেণীর স্নেহজাতীয় খাদ্য—ঘি, ভিটামিন-'এ' মিশ্রিত বনস্পতি বা ডালডা, কড্ ও শার্ক মাছের তেল, সরিষা-বাদাম ও নারকেল তেল, ছানা, পনির, গুঁড়া দুধ, বিভিন্ন প্রকার বাদাম, পেস্তা, সয়াবীন, আখ্‌রোট ও নারকেল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নেহজাতীয় খাদ্য—মাখন, জীব জন্তুর চর্বি, চর্বিযুক্ত মাছ ও পশু-পাখীর মাংস, ডিম, দুধ, বিভিন্ন রকমের বাদাম ও ডাল এবং বিভিন্ন শর্করা-জাতীয় খাদ্য।

ধাতব লবণ

দেহগঠনে প্রোটিনের পরই ধাতব লবণের নাম করা যেতে পারে। আমাদের দেহের প্রায় ৪ ভাগ বিভিন্ন ধাতব লবণ দ্বারা গঠিত।

বিভিন্ন প্রকারের ধাতব লবণ কতকগুলো মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণ। আমাদের শরীরের লবণের মধ্যে প্রায় ২০টি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। যেমনঃ—১। ক্যাল-সিয়াম, ২। লৌহ, ৩। পটাসিয়াম, ৪। ম্যাঙ্গানিজ, ৫। সোডিয়াম, ৬। তামা, ৭। ম্যাগনেসিয়াম, ৮। জিঙ্ক, ৯। বেরিয়াম, ১০। লিথিয়াম, ১১। ফস্‌ফরাস্, ১২। আয়োডিন, ১৩। ক্লোরিণ, ১৪। সালফার, ১৫। ফ্লোরিণ, ১৬। সিলিকন প্রভৃতি। এর মধ্যে প্রথম ১০টি ক্ষারজাতীয় এবং শেষের ৬টি অম্লজাতীয়—এরা দেহে অম্ল বা এ্যাসিড উৎপাদন করে। খাদ্যে ক্ষারজাতীয় পদার্থ এবং অম্লজাতীয় পদার্থ প্রয়োজন অনুপাতে থাকলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে এবং যে কোন একটির অনুপাত কম বেশী হলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। এখন দেখা যাক কিভাবে ধাতব লবণ আমাদের শরীরে কাজ করে, ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস্ দাঁত ও হাড়ের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। শিশুদের এ দুটি পদার্থের অভাব হলে দাঁত ও হাড় অপুষ্ট ও দুর্বল হয়। ম্যাগনেসিয়ামও একাজে সাহায্য করে, লৌহ ও তামার সাহায্যে। রক্তে হিমোগ্লোবিন উৎপন্ন হয়, আয়োডিন থাইরক্‌সিন হরমোন, জিঙ্ক (Jink) জারকরস উৎপাদনে সাহায্য করে, তেমনি লৌহ ও ফস্‌ফরাস্ দেহে কোষ (Cell) বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। শরীর সুস্থ ও সক্রিয় রাখতে হলে প্রয়োজনানুসারে ধাতব লবণ নিশ্চয়ই শরীরকে দিতে হবে এবং মনে রাখা দরকার দৈনিক নানাভাবে ২৫ থেকে ৩০ গ্রাম লবণ আমাদের শরীর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। গরমকালে এই পরিমাণ নিশ্চয়ই বেড়ে যায়।

ভিটামিনঃ খাদ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহজাতীয় পদার্থ ও ধাতব লবণ ছাড়া আরো একটি সূক্ষ্ম উপাদান আছে। এর অভাব ঘটলে দেহ সহজেই রোগে আক্রান্ত হয়। এই সূক্ষ্ম উপাদানটির নাম ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। প্রোটিন, কার্বো-হাইড্রেট, স্নেহপদার্থ ও ধাতব লবণের তুলনায় দেহে ভিটামিনের প্রয়োজন খুব কম।

কিন্তু ভিটামিন এমন একটি উপাদান যার অভাবে দেহযন্ত্র অচল। ভিটামিন প্রত্যক্ষ-ভাবে দেহগঠনে অংশ না নিলেও দেহের বৃদ্ধিতে, ক্ষয় পূরণে বা তাপ ও শক্তি সৃষ্টিতে তার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আমাদের দেহের আভ্যন্তরীণ কর্মযজ্ঞ অনেকটা এই ভিটামিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভিন্ন ভিটামিন দেহের বিভিন্ন অংশে নিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। ভিটামিনগুলির মধ্যে আবার কতকগুলো একাধিক উপাদানে গঠিত।

ভিটামিন 'এ': ভিটামিন-এ (১) খাদ্যবস্তু পরিপাক করে ও ক্ষুধার উদ্রেক করে। (২) ত্বক্ ও শ্লেষ্মাঝিল্লীকে সুস্থ ও সক্রিয় রেখে দেহকে রোগাক্রমণ থেকে রক্ষা করে। (৩) চোখের কাজ ঠিক রাখে। (৪) রক্তের অবস্থা স্বাভাবিক রাখে। (৫) দেহ-বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। দেহে চর্বির সঙ্গে মিশে ভিটামিন সঞ্চিত থাকে।

সবুজ শাক-সবজি থেকে ভিটামিন 'এ' বেশী পাওয়া যায়। তাছাড়া উদ্ভিদের হলুদ অংশে ক্যারোটিন নামক একপ্রকার পদার্থ থাকে। এ থেকে শরীরে ভিটামিন 'এ' উৎপন্ন হয়। গাজর এই জাতীয় উদ্ভিদ।

প্রথম শ্রেণীর ভিটামিন 'এ'-যুক্ত খাদ্য—সব রকমের শাক-সবজি (বিশেষ করে সবুজ শাক-সবজি), বাঁধাকপি, পেঁপে, পাকা আম, কাঁঠাল, পশু-পাখীর চর্বি, যকৃৎ, বৃক্ক, কড্ ও শার্ক মাছের তেল, চর্বিযুক্ত মাছ, ডিমের কুসুম, ঘি, মাখন, দুধ প্রভৃতি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ভিটামিন 'এ' যুক্ত খাদ্য—গাজর, অঙ্কুরিত ছোলা, রাঙাআলু, টমাটো প্রভৃতি।

ভিটামিন 'বি': ভিটামিন-বি প্রায় ১৫টি ভিটামিন মিশ্রণে গঠিত। তাই এই ভিটামিনকে ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স বলে। ভিটামিন-বি (১) খাদ্য হজম করতে সহায়তা করে ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। (২) শর্করাজাতীয় খাদ্যের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। (৩) হৃদ্‌যন্ত্র ও স্নায়ুমণ্ডলী সতেজ ও সক্রিয় রাখে। (৪) স্তনদানকারী মেয়েদের দেহে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। (৫) রোগ আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করে ইত্যাদি। দেহে ভিটামিন বি-এর অভাব ঘটলে মুখের ভিতরে ও জিহ্বায় ঘা হয়। প্লীহা, যকৃৎ, বৃক্ক-এর আকার বড় হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, বেরিবেরি, রিকেট প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়।

প্রথম শ্রেণীর ভিটামিন-বি-যুক্ত খাদ্য—পশু-পাখীর যকৃৎ, ডিম, লেটুস, শালগম, টমাটো, আখরোট ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ভিটামিন-বি-যুক্ত খাদ্য—সয়াবীন, ঢেঁকিছাঁটা চাল, গম, যব, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, ছোলা, জই, বিভিন্ন প্রকার ডাল, গাজর, বাঁধাকপি, পশুপাখীর বৃক্ক, মস্তিষ্ক, মাংস, দুধ, পনির, বিভিন্ন প্রকার বাদাম, নারকেল, আলু, শাক-সবজি, ইত্যাদি।

ভিটামিন 'সি': ভিটামিন-সি (১) দাঁত ও হাড়ের পুষ্টি ও ক্ষয় পূরণ করে। (২) রক্তের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখে। (৩) রোগ আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করে। (৪) পাকস্থলী সুস্থ ও তার কর্মক্ষমতা বজায় রাখে, ইত্যাদি। দেহে ভিটামিন-সি-এর অভাব ঘটলে দাঁত ক্ষয়ে যায়, দাঁতের গোড়া থেকে রক্ত পড়ে, হাত-পায়ের গাঁট ফুলে ওঠে ও ব্যথা হয়। দেহের ওজন কমে যায়, মেজাজ খিট্‌খিটে হয় ও অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে পড়তে হয়।

প্রথম শ্রেণীর ভিটামিন-সি যুক্ত খাদ্য—পাতিলেবু, কমলালেবু, বিভিন্ন প্রকার টক

ফল, পেয়ারা, ডালিম, নটেশাক, পালংশাক, বাঁধাকপি, ওলকপি, অঙ্কুরিত ছোলা, মটর, সজনে ডাঁটা ও পাতা, গোল আলু, টমাটো ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ভিটামিন-সি যুক্ত খাদ্য—গাজর, শালগম, সীম, ফুলকপি, পেঁপে, লেটুস, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, কলা, তরমুজ, আপেল, আনারস, দুধ, স্যালাড্ (কাঁচা-সবজি) ইত্যাদি।

ভিটামিন 'ডি'ঃ ভিটামিন-ডি দাঁত ও হাড় গঠন ও পুষ্টিতে বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া, দেহে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করে। দেহে ভিটামিন-ডি-এর অভাব ঘটলে দাঁত ও হাড় দুর্বল হয়ে যায়, হাঁটতে কষ্ট হয়, রিকেট রোগ দেখা দেয়, শরীর ফ্যাকাসে হয়ে যায়। অতি সহজে ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-কাশি হয়, কোমর ও পায়ের গাঁটে ব্যথা হয় এবং শেষ অবস্থায় মেরুদণ্ড ও পায়ের হাড় বেঁকে যায়। শিশুদের দেহে এই ভিটামিনের অভাব হলে, শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না, দাঁত উঠতে দেরী হয়। উঠলেও, নরম ও অপুষ্ট হয়। হাড় বৃদ্ধি হয় না, হাড় নরম হয়ে শেষ পর্যন্ত বেঁকে যায়, সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারে না, রিকেট রোগ হয়, প্রায়ই সর্দি-কাশিতে ভোগে ইত্যাদি।

আমাদের দেহের ত্বক সূর্য রশ্মি থেকে প্রচুর ভিটামিন-ডি সংগ্রহ করতে পারে।

ভিটামিন-ডি-যুক্ত খাদ্য—কড্ ও শার্ক মাছের তেল, বিভিন্ন চর্বিযুক্ত মাছ, জীব-জন্তুর চর্বি ও যকৃৎ, ঘি, মাখন, ছানা, পনির, ডিমের কুসুম, সবুজ তরিতরকারি ও শাক-সবজি ইত্যাদি।

ভিটামিন 'ই'ঃ ভিটামিন-ই শুক্র ধাতুর একটি প্রধান উপাদান। এই ভিটামিনের অভাবে মেয়েরা সন্তান লাভে বঞ্চিতা হন। মেয়েদের গর্ভে অসময়ে সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি সন্তান ধারণের ক্ষমতা চিরতরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ভিটামিন-ই দেহের তন্তু গঠনে সাহায্য করে, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে, করোনারী থ্রম্বোসিস ও ডায়াবেটিস রোগ-আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করে, বৃদ্ধ বয়সে রক্তের চাপ কমাতে ও শিথিল গ্রন্থি কার্যক্ষম রাখতে সাহায্য করে, তোতলানো রোগ দূর করে, শিশুর মন ও বুদ্ধির বিকাশ করতে সাহায্য করে, অগ্ন্যাশয় ও যকৃতের প্রদাহ রোগ দূর করে।

ভিটামিন-ই-যুক্ত খাদ্য—সবুজ তরিতরকারি ও শাক-সবজি, খই, পশু-পাখীর যকৃৎ, ডিমের কুসুম, বিভিন্ন প্রকার বাদাম, পেস্তা, অঙ্কুরিত ছোলা, গম, মটরশুঁটি ইত্যাদি।

ভিটামিন 'এইচ'ঃ ভিটামিন-এইচ দেহকে চর্মরোগ থেকে রক্ষা করে, চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখে, মাথায় টাক পড়া বন্ধ করে।

ভিটামিন-এইচ যুক্ত খাদ্য—সবুজ তরিতরকারি ও শাক-সবজি, বিভিন্ন রকম ফল এবং ডিম।

ভিটামিন 'কে'ঃ ভিটামিন-কে রক্ত জমাট বাঁধতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। দেহের হাড় গঠনে এবং পুষ্টিতেও ভিটামিন 'কে' বিশেষভাবে প্রয়োজন। গর্ভবতী ও স্তন-দানকারী মেয়েদের এই ভিটামিনের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কারণ মায়ের দেহে ভিটামিন-কে-এর অভাব থাকলে শিশুর হাড় বৃদ্ধি হয় না।

ভিটামিন-কে-যুক্ত খাদ্য—সবুজ তরিতরকারি ও শাক-সবজি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, সয়াবীন প্রভৃতিতে প্রচুর ভিটামিন-কে পাওয়া যায়। আটা, ময়দা, চাল ও বিভিন্ন

রকম ফলের মধ্যেও কিছু পরিমাণ এই ভিটামিন পাওয়া যায়। তাছাড়া দেহ নিজেই অন্ত্রের মধ্যস্থ জীবাণু থেকে কিছুটা এই ভিটামিন তৈরী করে।

ভিটামিন 'পি'ঃ এই ভিটামিনটি ভিটামিন-সি-এর বিশেষ সাহায্যকারী। তাছাড়া, এটি রক্তবাহী ধমনী, শিরা-উপশিরার দেওয়াল মজবুত ও স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে। ভিটামিন-'পি'-এর প্রভাবে দেহে করোনারী থ্রম্বোসিস রোগ সহজে আক্রমণ করতে পারে না।

ভিটামিন-পি যুক্ত খাদ্য—পাতিলেবু, কাগজি লেবু, কমলা লেবু, বিভিন্ন প্রকার টক ফল ইত্যাদি। যেসব খাদ্য থেকে ভিটামিন-'সি' পাওয়া যায়, সেসব খাদ্যেও ভিটামিন-'পি' কম বেশী পাওয়া যায়।

নিকোটিনিক এ্যাসিডঃ ভিটামিন 'বি'-এর মত এই ভিটামিনটিও কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যকে দেহের কাজে লাগাতে সাহায্য করে। প্রত্যেক প্রাণীর এই ভিটামিন বিশেষ দরকার। দেহে এর অভাব ঘটলে পেলেগ্রা নামক একপ্রকার মারাত্মক রোগ দেখা দিতে পারে। গায়ে চামড়ায় ভাঁজ পড়ে এবং দেহে নানাপ্রকার চর্মরোগ দেখা দেয়।

নিকোটিনিক এ্যাসিড-যুক্ত খাদ্য—মাছ ও মাংসে প্রচুর পরিমাণে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। তাছাড়া আটা, আলু, সবুজ তরি-তরকারি ও শাক-সবজিতেও এই ভিটামিন পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

যোগ-ব্যায়াম অভ্যাসকারীদের আরো কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বিষয় জেনে রাখা ভাল

পাচনতন্ত্র ও পরিপাক-ক্রিয়া

এ পর্যন্ত আমরা দেহের উপাদান, খাদ্যের উপাদান এবং কোন্ কোন্ খাদ্যে কি কি উপাদান পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে মোটামুটি জানতে পারলাম। কিন্তু দেহের উপাদান অনুযায়ী খাদ্য উপাদান গ্রহণ করলেই তো সেই খাদ্যবস্তু দেহের গ্রহণোপযোগী হবে না! খাদ্যবস্তু হজম করে দেহের কাজের উপযোগী করাও তো দরকার। এ কাজ ঠিকমত জানতে গেলে আমাদের পাচনতন্ত্র ও পরিপাক ক্রিয়া সম্বন্ধে একটু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

বিভিন্ন রকম খাদ্যদ্রব্যের মধ্য থেকে গ্লুকোজ ও ধাতব লবণ প্রভৃতি সামান্য কয়েকটি দ্রব্যকে দেহ সরাসরি তার নিজের কাজে লাগাতে পারে। অধিকাংশ খাদ্য-বস্তু যতক্ষণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে গ্রহণোপযোগী অবস্থায় না আসে ততক্ষণ দেহের কোন কাজে লাগে না। খাদ্যদ্রব্য এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে দেহের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় পরিণত হওয়াকে পরিপাক-ক্রিয়া বলে। এই পরিপাক-ক্রিয়ায় আমাদের মুখগহ্বর, অন্ননালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, পিত্তাশয়, বৃহদন্ত্র প্রভৃতি দেহ-যন্ত্রগুলি সরাসরি অংশ গ্রহণ করে। এই দেহ-যন্ত্রগুলিকে বলা হয়—পাচনতন্ত্র। আমাদের মুখের মধ্যে পারটিড্ (Pertid), সাব্লিংগুয়াল (Sub-lingual) ও সাব্ম্যাক্সিলারী (Submaxilary) গ্রন্থি থেকে নিয়ত লালা নিঃসৃত হচ্ছে। এই লালায় জল ছাড়াও টায়ালিন (Ptyalin), মিউসিন (Mucin) ও কিছু ধাতব লবণ থাকে। লালার জলীয় অংশ খাদ্যদ্রব্যকে ভিজিয়ে নরম করে, মিউসিন অংশ খাদ্যবস্তুকে পিচ্ছিল করে অন্ননালীর ভিতর দিয়ে পাক-স্থলীতে যেতে সাহায্য করে, আর টায়ালিন নামক জারক পদার্থটি খাদ্যের শ্বেতসার-জাতীয় পদার্থকে ভেঙ্গে মলটোজে (Maltose) রূপান্তরিত করে। খাদ্যদ্রব্য যাতে টায়ালিনের সঙ্গে ঠিকমত মিশ্রিত হতে পারে, সেইজন্য খাদ্যদ্রব্য ভালভাবে চিবিয়ে খাওয়া উচিত।

পাকস্থলীর কাজ ঃ খাদ্যদ্রব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে অন্ননালীর ভেতর দিয়ে পাকস্থলীতে গিয়ে পেঁছায়। এখন পাকস্থলীর কাজ আরম্ভ হচ্ছে। পাক-স্থলীর ওপরের অংশকে ফান্ডাস্ (Fundus) বলা হয়। এই ফান্ডাসে শ্রেণী ও পরিমাণ অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য আধ ঘন্টা থেকে দু'ঘন্টা পর্যন্ত থাকে। এই সময় খাদ্যের শ্বেতসারজাতীয় অংশের আরো কিছু অংশ মলটোজে পরিণত হবার সুযোগ পায়। তারপর ফান্ডস্ থেকে ধীরে ধীরে ঐ খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীর নীচের দিকে চলে যেতে থাকে। এই সময় পাকস্থলী-নিঃসৃত পাচক রস (Gastric juice) খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিশতে থাকে। এই পাচক-রসে প্রধানতঃ থাকে হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড, প্রো-রেনিন, পেপসিনোজেন ও লাইপেস। রেনিন, পেপসিন ও লাইপেস তিনটিই পাকস্থলীর জারক পদার্থ (Enzyme)। এর সাহায্যে খাদ্যবস্তু সহজেই হজম হয়। হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডের কিন্তু পাকস্থলীতে অনেক কাজ করতে হয়। যেমন—(১) এই এ্যাসিডের সাহায্যে প্রো-রেনিন ও পেপসিনোজেন থেকে যথাক্রমে রেনিন ও পেপসিন উৎপন্ন হয়, (২) খাদ্যের শর্করা অংশ গ্লুকোজে রূপান্তরিত

পাচনতন্ত্র
(Digestive System)

হয়, (৩) খাদ্যের প্রোটিন অংশ নরম করে পরিপাকে সাহায্য করে, (৪) খাদ্যের সঙ্গে কোন রোগ-বীজাণু থাকলে তা ধ্বংস করে, (৫) খাদ্যের লৌহজাতীয় উপাদান শোষণ করতে সাহায্য করে, এবং (৬) পাকস্থলীর নিম্ন-দ্বার (Pylorus) খুলতে সহায়তা করে। খাদ্যদ্রব্য কতক্ষণ পাকস্থলীতে থাকবে, তা নির্ভর করে খাদ্যদ্রব্যের শ্রেণী ও পরিমাণের ওপর। তবে, সাধারণত ৪।৫ ঘণ্টা খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে থাকে। তরল খাদ্য ১৫ মিঃ থেকে ২০ মিঃ থাকে। এই সময় লাইপেস স্নেহজাতীয় পদার্থের সামান্য কিছু অংশ ফ্যাটি এ্যাসিড ও গ্লিসারিন-এ রূপান্তরিত করে, রেনিন দুধ ছানায় পরিণত করে; পেপসিন খাদ্যের প্রোটিন অংশ থেকে প্রোটিয়োস (Proteoses) ও পেপটোন (Peptone) উৎপন্ন করে। অধিকাংশ স্নেহ পদার্থের পাকস্থলীতে পাতলা মণ্ড (Chyme) পরিণত হয়। এই মণ্ড পাকস্থলী সঙ্কোচন ও প্রসারণের সাহায্যে ক্ষুদ্রান্ত্রে পাঠিয়ে দেয়। এখন শুরু হলো ক্ষুদ্রান্ত্রের কাজ।

ক্ষুদ্রান্ত্রের কাজঃ খাদ্য-মণ্ড প্রায় ৫ ঘণ্টা ক্ষুদ্রান্ত্রে থাকে। এখানে তার পরিপূর্ণ রূপান্তর হয়, পাকস্থলীর পিছন দিকে আছে অগ্ন্যাশয় (Pancreas)। একটি সরু নলের দ্বারা এই অগ্ন্যাশয় ক্ষুদ্রান্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যবস্তু আসার সঙ্গে সঙ্গে অগ্ন্যাশয় থেকে অ্যামাইলোপ্সিন (Amylopsin), ষ্টিয়াপ্সিন (Steapsin), ট্রিপসিন (Tripsin) প্রভৃতি জারক রসযুক্ত ক্লোমরস (Pancreatic juice) এসে খাদ্য-মণ্ডের সঙ্গে মেশে।

এই ক্লোমরস ক্ষারধর্মী। এই ক্লোমরসের সংস্পর্শে এসে খাদ্যদ্রব্যের আম্লিক ধর্ম কিছুটা কমে যায় এবং মৃদু ক্ষারধর্মে রূপান্তরিত হয়। অ্যামাইলোপ্সিন অবশিষ্ট শ্বেতসার অংশ মলটোজে পরিণত করে, ক্ষুদ্রান্ত্রে কাঁচা শ্বেতসার পদার্থও মলটোজে রূপান্তরিত হয়। যে সকল প্রোটিনের পাকস্থলীতে কোন পরিবর্তন হয় না, সেগুলিও এখানে ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপ্সিন দ্বারা পেপ্টোন ও প্রোটিয়োসে রূপান্তরিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের এই সব কাজে আরো দুইটি দেহযন্ত্র সাহায্য করে। তাদের নাম হলো যকৃৎ (Lever) ও পিত্তাশয় (Gall bladder)। যকৃতে উৎপন্ন পিত্তরস পিত্তাশয়ে এসে জমা হয়। একটি সরু নলের ভেতর দিয়ে এই রস ক্ষুদ্রান্ত্রে যায় এবং স্নেহপদার্থ খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। এইরূপ নানা প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হয়। এইখানে কিন্তু ক্ষুদ্রান্ত্রের কাজ শেষ হয় না। পরিপাক-প্রাপ্ত খাদ্য দেহের কাজে লাগানোর বেশীর ভাগ কাজও এই ক্ষুদ্রান্ত্রের করতে হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল শলাকা আছে। এগুলোকে ভিলাই (Villi) বলা হয়। এই ভিলাইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহা কৈশিকনালী (Capillary blood Vessels) আছে। এগুলোর সাহায্যে খাদ্য-নির্যাস রক্তের মধ্যে শোষিত হয় এবং ফুস্ফুস্ ও হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে ভুক্ত খাদ্যের কিয়দংশ এবার বৃহদন্ত্রে চলে যায়। এখন আরম্ভ হলো—বৃহদন্ত্রের কাজ।

বৃহদন্ত্রের কাজঃ বৃহদন্ত্রে ভুক্ত খাদ্যের অবশিষ্টাংশের জলীয় অংশ শোষণ করে দেহের কাজে লাগানো হয়। আর পরিত্যক্তাংশ মলে পরিণত হয়ে বৃহদন্ত্রের পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণের সাহায্যে মলদ্বার (Rectum) দিয়ে দেহের বাইরে চলে যায়। কোন সুস্থ ব্যক্তির স্বাভাবিক পরিপাক ক্রিয়া শেষ হতে ৮।৯ ঘণ্টা সময় লাগে।

তাহলে, দেহের খাদ্য-দ্রব্য মুখ-গহ্বরে আসার পর কতকগুলো দেহ-যন্ত্র একযোগে কাজ করলে, তবে সেই খাদ্যদ্রব্য দেহের গ্রহণোপযোগী হয়। এই পাচনতন্ত্রের যে কোন একটি যন্ত্র যদি অকেজো হয়ে পড়ে, তবে গোটা শরীর আস্তে আস্তে বিকল হয়ে আসে। এই পাচনতন্ত্রকে সবল ও সক্রিয় রাখার একমাত্র উপায় যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস। অন্য কোন ব্যায়াম দ্বারা দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদি সুস্থ ও সক্রিয় রাখা সম্ভব নয়।

বিপাক-ক্রিয়া (Metabolism)

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা গেল যে, পাচনতন্ত্র ও পরিপাক-ক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য হজম হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত হবার পরই শুধু দেহের গ্রহণোপযোগী হয়ে দেহের উপকারে লাগে। অর্থাৎ, দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয় ও ক্ষয়পূরণ, পুষ্টি-সাধন, তাপ ও শক্তি উৎপাদন সম্ভব হয়, রক্তের ভেতর দিয়ে খাদ্যদ্রব্য দেহের বিভিন্ন কোষে হাজির হয় এবং দেহের নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। দেহের বিভিন্ন কোষে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্যের এই রূপান্তর সাধিত হয়, তাকে বলা হয় বিপাক-ক্রিয়া (Metabolism)। এই বিপাক-ক্রিয়ার দুটি দিক আছে। একদিকে খাদ্য নির্যাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ দেহ-গঠনে, দেহের ক্ষয়পূরণে ও পুষ্টিতে বিভিন্ন দ্রব্য-গুলি প্রস্তুত করে। বিপাক-ক্রিয়ার এই কাজগুলিকে বলা হয় অ্যানাবলিজম্ (anabolism)। অন্যদিকে শোধিত খাদ্যদ্রব্যগুলি আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে দেহে প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে এবং শেষে কার্বন ডাই-অক্সাইড্, জল, গ্যাস, ইউরিয়া, ইউরিক প্রভৃতি এ্যাসিডগুলি দেহ থেকে ঘাম ও মল-মূত্রাকারে বের হয়ে যায়। এ কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে—দেহে শক্তি সরবরাহ করা, পেশীর সঙ্কোচন, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, হরমোন ও এন্‌জাইম সৃষ্টি, স্নায়ুর পরিবহন ও খাদ্যদ্রব্য হজম প্রভৃতি কাজে সাহায্য করা। বিপাক-ক্রিয়ার (Metabolism) এই সমস্ত কাজকে বলা হয় কেটাবলিজম্ (Catabolism)। অ্যানাবলিজম্ ও কেটাবলিজম্ এই দুইয়ের মিলিত প্রক্রিয়াকে বলা হয় বিপাক-ক্রিয়া বা মেটাবলিজম্।

মেটাবলিজম্ প্রক্রিয়ায় থাইরয়েড্ গ্রন্থি (Thyroid gland) সব চেয়ে বেশী কাজ করে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত থাইরক্সিন (Thyroxin) হরমোনটি মেটাবলিজম্ প্রক্রিয়াকে উত্তেজিত করে। এরই প্রভাবে কেউ বা অতিরিক্ত পরিশ্রমী হয় আবার কেউ বা কর্মবিমুখ হয়।

রেচন-তন্ত্র (Excretory System)

আমরা পাচনতন্ত্র ও পরিপাক-ক্রিয়ায় জেনেছি যে, খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রে হজম হয় এবং দেহের গ্রহণোপযোগী অংশ রক্তের সঙ্গে মিশে দেহের সর্বত্র পরিচালিত হয়। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের সবটুকু তো হজম হয় না—বেশ কিছু অংশ ক্ষুদ্রান্ত্রে পড়ে থাকে। তার সঙ্গে থাকে পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, পিত্তাশয়, অগ্ন্যাশয়, যকৃৎ প্রভৃতির নিঃসৃত এন্‌জাইম ও অন্যান্য পদার্থ। ক্ষুদ্রান্ত্রের জীবাণু, খাদ্যদ্রব্যের এই অবশিষ্টাংশ পচিয়ে নানাপ্রকার পদার্থের সৃষ্টি করে। একত্রে এই সকল পদার্থকে মল বলে। এই মল শরীরের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক। বৃহদন্ত্র এই মল দেহ থেকে বের করে দেয়।

খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজনীয় অংশ রক্তের সঙ্গে মিশে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। দেহের বিভিন্ন কোষ নিজেদের প্রয়োজনানুযায়ী সেগুলি গ্রহণ করে এবং নিজেদের বৃদ্ধি, পুষ্টি, ক্ষয়পূরণ ও শক্তি সঞ্চয় প্রভৃতি কাজে লাগায়। দেহকোষ এই সব কাজগুলি করার সময় দেহে কতকগুলি দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক পদার্থ, যেমন— কার্বন ডাই-অক্সাইড্ (Carbon Di-oxide), ইউরিক এ্যাসিড (Uric Acid), ইউরিয়া (Urea), ক্রিয়েটিনিন (Creatinine), ধাতব লবণ (Inorganic Salt) ও জল (Water) প্রভৃতি সৃষ্টি হয়।

ফুস্ফুস্ কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস ও কিছু জল বাষ্পে রূপান্তরিত অবস্থায় দেহ থেকে বের করে দেয়। ধাতব লবণ ও কিছু জল ঘর্মগ্রন্থি ত্বকের ভেতর দিয়ে ঘামের আকারে বের করে দেয়। ইউরিয়া, ইউরিক এ্যাসিড প্রভৃতি—নাইট্রোজেন গঠিত পদার্থগুলি—আমাদের বৃক্কদ্বয় মূত্রাকারে দেহ থেকে বের করে দেয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, দেহের বিষাক্ত ক্ষতিকারক পদার্থগুলি বের করতে হলে ফুস্ফুস্, ঘর্মগ্রন্থি ও ত্বক, বৃক্ক, বৃহদন্ত্র সুস্থ ও সক্রিয় থাকা দরকার। আর দেহের এই যন্ত্রগুলি সুস্থ ও সক্রিয় রাখার একমাত্র ব্যায়াম হলো যোগ-ব্যায়াম।

শ্বসন-তন্ত্র (Respiratory System)

জীবন ধারণের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তার প্রায় বেশীর ভাগই আমরা খাদ্যদ্রব্য থেকে পাই। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের এই শক্তি দেহের কাজে লাগাতে হ'লে দরকার হয় অক্সিজেনের সাহায্য। দেহ-যন্ত্র খাদ্যের দেহের গ্রহণোপযোগী অংশের সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা এই শক্তি উৎপন্ন করে। আর এই অক্সিজেন আমরা বেশীর ভাগ বায়ু থেকে পাই। আমাদের দেহে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস, বিষাক্ত জল প্রভৃতি নানারকম পদার্থের সৃষ্টি হয়। আগেই বলা হয়েছে, এইসব বিষাক্ত পদার্থ দেহের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক। এগুলো অনবরত দেহ থেকে বের করে দিতে হয়। আমরা শ্বসন-তন্ত্রের সাহায্যে দেহের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস ও কিছু জলীয় বিষাক্ত পদার্থ বাষ্পে রূপান্তরিত করে দেহ থেকে বের করে দিই। আর এই শ্বসন-তন্ত্রের প্রধান যন্ত্র হচ্ছে—ফুস্ফুস্ (Lungs)।

শ্বসনক্রিয়া বলতে আমরা সাধারণতঃ শ্বাস-প্রশ্বাসকেই (Expiration-Inspiration) বুঝি। আসলে কিন্তু শ্বসনক্রিয়ার এইটুকু সব নয়—শ্বসনক্রিয়ার একটু অংশ মাত্র। একে বাহ্যিক শ্বসনক্রিয়া (External Respiration) বলে। এই বাহ্যিক শ্বসনক্রিয়ায় আমরা প্রশ্বাসের গৃহীত বায়ু থেকে ফুস্ফুসের জালকের (Capillaries) মধ্য দিয়ে অক্সিজেন রক্তে গ্রহণ করি এবং রক্ত থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস ও কিছু বিষাক্ত জলীয় বাষ্প ফুস্ফুসের মধ্য দিয়ে নিঃশ্বাসের সাহায্যে দেহ থেকে বের করে দিই। শ্বসনক্রিয়ার এই কাজটুকুকে বলা হয় বাহ্যিক শ্বসনক্রিয়া।

ফুস্ফুস্ ছাড়াও তো দেহের অসংখ্য বিভিন্ন কোষে এইরূপ অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস ও বিষাক্ত জলীয় বাষ্প আদান-প্রদান হয়। এই সব কাজ

বুঝতে হ'লে আমাদের ফুস্‌ফুস্‌, অন্যান্য শ্বসনক্রিয়ার যন্ত্রগুলির গঠনপ্রণালী ও তাদের কাজ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা থাকা দরকার।

ফুস্‌ফুসের গঠনপ্রণালী ও তার কাজঃ আমাদের বুকের পাঁজরের ঠিক নীচে একটি শক্ত পেশীযুক্ত পরদা দেহ-গহ্বরকে দু'ভাগে ভাগ করে রেখেছে। এই পর্দাটাকে বলা হয় ডায়াফ্রাম (Diaphragm)। দেহগহ্বরে ডায়াফ্রামের ওপরের অংশকে বক্ষ-গহ্বর (Chest Cavity) আর নীচের অংশকে উদর-গহ্বর (Abdominal Cavity) বলা হয়। এই বক্ষ-গহ্বরে ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃৎপিন্ড—দেহের দুটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র অতি যত্নে, অতি সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা আছে। বুকের পাঁজরের নীচে বক্ষ-গহ্বরের দু'দিকে দু'টি ফুস্‌ফুস্‌ আছে। ফুস্‌ফুস্‌ দুটি অসংখ্য বায়ু-কোষ (Air Cell) দ্বারা গঠিত। আবার এই বায়ু কোষগুলি অসংখ্য জালক (Capillaries) দ্বারা আবৃত। সাধারণ লোকের ধারণা ফুস্‌ফুস্‌ দেহের একটি স্বয়ংচালিত যন্ত্র—আসলে কিন্তু তা নয়, ফুস্‌ফুসের বায়ু গ্রহণ বা ত্যাগ করবার কোন ক্ষমতা নেই। দেওয়ালের পেশী ও ডায়াফ্রামের সাহায্যে তার কাজ করতে হয়, ডায়াফ্রামের উপরের অংশ কিছুটা উঁচু। দেখতে অনেকটা গম্বুজের মত। ডায়াফ্রামের পেশী সঙ্কুচিত হলে তার উপরের অংশ নীচে নেমে যায়; ফলে বক্ষ-গহ্বরের উপর-নীচ দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বৃদ্ধি পায়, আবার পাঁজরের হাড়গুলি (Ribs) নীচের দিকে একটু নেমে আসে। বক্ষ-প্রাচীরের পেশী সঙ্কুচিত হলে বুকের পাঁজরের সামনের দিক উপর দিকে উঠে যায়—ফলে বক্ষ-গহ্বর দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বৃদ্ধি পায়। ডায়াফ্রাম ও বক্ষ-প্রাচীরের পেশী একই সঙ্গে সঙ্কুচিত হয়; ফলে বক্ষ-গহ্বরের আয়তনও বৃদ্ধি পায়। এই কারণে গভীর শ্বাস নিলে বুকের ছাতি ২।৩ ইঞ্চি বৃদ্ধি পায়। বক্ষ-গহ্বরের আয়তন বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে ফুস্‌ফুসের আয়তনও বৃদ্ধি পায় এবং তার ভেতরকার বায়ুর চাপ কমে যায়। কিন্তু ফুস্‌ফুসের বাইরে বায়ুর চাপ একই থাকে অর্থাৎ ফুস্‌ফুসের ভেতরের বায়ুর চাপ অপেক্ষা বাইরের বায়ুর চাপ বেশী থাকে। ব্যায়ামের সময় নাসাপথ ও শ্বাসনালী দ্বারা ফুস্‌ফুসের ভেতরের বায়ুর সঙ্গে বাইরের বায়ুর যোগাযোগ থাকায় উচ্চ-চাপ নিম্ন-চাপ নিয়মানুসারে ফুস্‌ফুসের নিম্ন-চাপ বায়ুর দিকে ধাবিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে আমরা প্রশ্বাস বলি।

এখন দেখা যাক, উদর-গহ্বরের অবস্থা কি? ডায়াফ্রাম নীচের দিকে নেমে গেলে উদর-গহ্বরে চাপ পড়ে—ফলে সঙ্গে সঙ্গে পেট ফুলে ওঠে। আবার ওদিকে বায়ু ফুস্‌ফুসের ভেতরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ডায়াফ্রাম ও বক্ষ-প্রাচীরের পেশীর সঙ্কোচন শেষ হয়; ফলে ডায়াফ্রাম উপর দিকে উঠে আসে ও বুকের খাঁচার হাড় (Ribs) নীচের দিকে নেমে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে।

বক্ষ-গহ্বরের আয়তন কম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুস্‌ফুসের আয়তনও কমে যায়; ফলে ফুস্‌ফুস্‌ থেকে খানিকটা বায়ু বের হয়ে আসে এবং পেট নীচের দিকে নেমে যায়। ফুস্‌ফুস্‌ থেকে এই বায়ু বের হয়ে যাওয়াকে আমরা নিঃশ্বাস বলি। আর পেটের এই ওঠা-নামাকে বলা হয় উদর শ্বাস-প্রশ্বাস (Abdominal breathing)।

আগেই বলা হয়েছে, ফুস্‌ফুস্‌ ছাড়াও দেহের বিভিন্ন কোষে রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড্‌ গ্যাস প্রভৃতি আদান-প্রদান হয়। এখন দেখা যাক, এই কাজ কি করে সম্ভব হয়। রক্ত ফুস্‌ফুস্‌ থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং

দুই ফুস্‌ফুসের শিরার (Pulmonary artery) সাহায্যে হৃৎপিণ্ডে পাঠিয়ে দেয়। হৃৎপিণ্ড এই অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত ধমনীর সাহায্যে দেহের বিভিন্ন কোষে পাঠিয়ে দেয়। এই কোষে জালক ও কোষের সূক্ষ্ম প্রাচীরের মধ্য দিয়ে অক্সিজেন কোষের মধ্যে চলে যায় এবং কোষের উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস প্রভৃতি ঐ প্রাচীরের মধ্য দিয়ে রক্তে এসে পৌঁছায়। রক্ত এবার শিরার মাধ্যমে ঐ দূষিত গ্যাস নিয়ে এসে হৃৎপিণ্ডে জমা দেয়। হৃৎপিণ্ড সঙ্গে সঙ্গে দুই ফুস্‌ফুস্ ধমনীর সাহায্যে এই দূষিত রক্ত ফুস্‌ফুসে জমা দেয়। কোষ ও রক্তের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস প্রভৃতি আদান-প্রদানকে বলা হয় আভ্যন্তরীণ শ্বসনক্রিয়া (Internal Respiration)। ফুস্‌ফুস্ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঐ কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস ও দূষিত জলীয় বাষ্প (বাহ্যিক শ্বসনক্রিয়া দ্বারা) দেহ থেকে বের করে দেয়।

তাহলে ফুস্‌ফুসের সাহায্যে দেহ প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পায় ও বিষাক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস ও জলীয় বাষ্প দেহ থেকে বের করে দিতে পারে। আর এই ফুস্‌ফুস্‌কে সবল ও সক্রিয় রাখার একমাত্র উপায় হলো যোগ-ব্যায়াম।

রক্ত-সংবহন-তন্ত্র (Blood Circulatory System)

আমাদের দেহের অসংখ্য বিভিন্ন কোষে খাদ্যদ্রব্যের সারাংশ পৌঁছে দেওয়া এবং ঐ সকল কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস ও অন্যান্য দূষিত অসার পদার্থ ফুস্‌ফুস্, বৃক্ক, ঘর্মগ্রন্থি প্রভৃতিতে পরিবহন করে দেহ থেকে অপসারণে সাহায্য করাই এই তন্ত্রের প্রধান কাজ। এই তন্ত্রের কাজ হলো—(১) অন্ত্র ও যকৃৎ থেকে খাদ্যদ্রব্যের সারাংশ দেহের বিভিন্ন কোষে পৌঁছে দেওয়া। (২) ফুস্‌ফুস্ থেকে অক্সিজেন বিভিন্ন কোষে নিয়ে যাওয়া এবং ঐ কোষ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস ও বিষাক্ত জলীয় বাষ্প ফুস্‌ফুসে টেনে নিয়ে আসে। (৩) নাইট্রোজেন গঠিত ইউরিয়া, ইউরিক প্রভৃতি এ্যাসিড বৃক্কে (Kidney) নিয়ে যাওয়া। (৪) হরমোন্ নামক দেহের একটি অত্যাবশ্যক পদার্থ প্রয়োজন অনুযায়ী দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেওয়া। (৫) নানাপ্রকার রোগ-বীজাণুর হাত থেকে দেহকে রক্ষা করা। (৬) দেহের তাপ সৃষ্টিকারী অঙ্গ—যথা, মাংসপেশীর সঙ্গে তাপ-অপসরণকারী—যথা, ত্বক ও ফুস্‌ফুসের সংযোগ রক্ষা করে দেহের উত্তাপকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে সাহায্য করা এবং (৭) রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করা।

এই সংবহন-তন্ত্রের প্রধান যন্ত্র হচ্ছে হৃৎপিণ্ড। তাছাড়া রক্ত (Blood), ধমনী (Arteries), শিরা (Veins), জালকশ্রেণী (Capillaries) এবং লসিকানালী (Lymphatics) এই সংবহন-তন্ত্রের অন্তর্গত। এখন দেখা যাক, কে কিভাবে এই তন্ত্রকে সাহায্য করে।

হৃৎপিণ্ডঃ হৃৎপিণ্ড একপ্রকার বিশেষ ধরনের মাংসপেশী। এই মাংসপেশী ভীষণ শক্ত এবং এর সঙ্কোচন ও প্রসারণ ক্ষমতাও খুব বেশী। এটি একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। দেহের অন্য কোন যন্ত্রের উপর এর কাজ নির্ভর করে না। ভ্রূণের প্রায় পাঁচ মাস বয়স থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যন্ত্রটি অবিরাম কাজ করে যায়। হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক অবস্থায় ৫ ইঞ্চি লম্বা, ২½ ইঞ্চি চওড়া ও ২½ ইঞ্চি মত পুরু, দেখতে অনেকটা

থলির মত। বক্ষ-গহ্বরে, বুকের পাঁজরের ঠিক নীচে বাঁদিকে হৃৎপিন্ডটি এক প্রকার তরল পদার্থের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। এর উপর দিকটা চওড়া ও উঁচু এবং নীচের দিকটা সরু ও নীচু। হৃৎপিন্ডের উপর ও নীচে দুটি করে মোট চারটি কক্ষ আছে। উপরের কক্ষ দুটিকে বলা হয় অলিন্দ (Auricle) আর নীচের কক্ষ দুটিকে বলে নিলয় (Ventricle)। দু'দিকে অলিন্দ ও নিলয়ের মাঝে একটি করে কপাট (Valve) আছে। এই কপাট একমাত্র নিলয়ের দিকে খুলতে পারে অর্থাৎ রক্ত কেবল অলিন্দ থেকে নিলয়ে যেতে পারে,—নিলয় থেকে অলিন্দে আসতে পারে না। একটি শক্ত পেশীময় পরদা ডান ও বাঁদিকের অলিন্দ ও নিলয়কে ভাগ করে রেখেছে। ডানদিকের অলিন্দে দুটি মহাশিরা এসে যুক্ত হয়েছে। একটি শিরা দেহের নিম্নাংশ থেকে দূষিত রক্ত টেনে ডান অলিন্দে নিয়ে আসে। উপর ও নীচের এই দুটি মহাশিরাকে বলা হয় ঊর্ধ্ব-মহাশিরা (Superior Vanae Cave) এবং নিম্ন-মহাশিরা (Inferior Vanae Cave)। ডানদিকের অলিন্দ থেকে এই দূষিত রক্ত ডানদিকের নিলয়ে যায় এবং সেখান থেকে ফুসফুস ধমনীর (Pulmonary artery) সাহায্যে দুই ফুসফুসে চলে যায়। নিলয় থেকে ফুসফুস ধমনী বের হয়ে দুটি শাখায় ভাগ হয়ে দুই ফুসফুসে প্রবেশ করেছে। ফুসফুসে রক্ত শোধিত ও অক্সিজেন নিয়ে ফুসফুসের চারটি শিরার (Pulmonary Veins) সাহায্যে হৃৎপিন্ডের বাঁ অলিন্দে চলে আসে এবং বাঁ অলিন্দ থেকে বাঁ নিলয়ে চলে যায়। এই বাঁ নিলয় থেকে মহাধমনী (Aorta) ও তার শাখা-প্রশাখার সাহায্যে দেহের সর্বত্র চালিত করে। প্রতি হৃদস্পন্দনে প্রায় ৪ আউন্স রক্ত মহাধমনীতে প্রবেশ করে। এই রক্ত যাতে আবার নিলয়ে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য বাঁ নিলয়ে ও মহাধমনীর সংযোগস্থলে একটি কপাট (Valve) আছে। এই কপাটটিকে বলা হয় সেমি-লুনার (Semi-luner)। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ডানদিকের অলিন্দ ও নিলয় দূষিত রক্তের জন্য আর বাঁদিকের অলিন্দ ও নিলয় বিশুদ্ধ রক্তের জন্য ব্যবহৃত হয়।

হৃৎপিন্ডের স্পন্দন বলতে কি বুঝায় ?

বুকে কান পেতে রাখলে আমরা তালে তালে একটি ঢিপ্-ঢিপ্ শব্দ শুনতে পাই অথবা দেহের কোন অংশের—বিশেষ করে হাত-পায়ের ধমনী আঙুল দিয়ে চেপে রাখলে আমরা স্পন্দন বুঝতে পারি। এই স্পন্দনকে বা ঐ ঢিপ্-ঢিপ্ শব্দকে বলা হয় হৃদ্‌ধ্বনি। আবার হৃদ্‌ধ্বনিকে দুভাগ করে প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি ও দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি বলা হয়। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক লোকের প্রতি মিনিটে প্রায় ৭২ বার এই হৃদ্‌ধ্বনি হয়। এই সংখ্যার কম-বেশী অসুস্থতার লক্ষণ। তাই ডাক্তার এসে প্রথমে রোগীর হৃদ্‌ধ্বনি পরীক্ষা করেন। হৃৎপিন্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে এই হৃদ্‌ধ্বনি হয়। আগেই বলেছি, হৃৎপিন্ড দুটি অলিন্দ ও দুটি নিলয় দ্বারা গঠিত। উপরের অলিন্দে প্রথম স্পন্দন আরম্ভ হয়ে নীচের নিলয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতি স্পন্দনে সময় লাগে ০·৮ সেকেন্ড। অতএব প্রতি ০·৮ সেকেন্ডে হৃৎপিন্ডে একবার করে স্পন্দন হয়। রক্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে অলিন্দ দুটি সংকুচিত হতে আরম্ভ করে—ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে অলিন্দ ও নিলয়ের কপাট খুলে যায় এবং রক্ত নিলয়ে প্রবেশ করে। এখন নিলয়ে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাবার ফলে অলিন্দে ও নিলয়ের মাঝের কপাট সজোরে বন্ধ হয়ে যায়। এই বন্ধ হওয়ার সময় যে আন্দোলন

(vibration) হয়, তাকে বলা হয়, প্রথম হৃদ্‌ধ্বনি। আবার নিলয় থেকে ফুস্‌ফুস্‌ ধমনী ও মহাধমনীতে প্রায় ৩ থেকে ৪ আউন্স রক্ত সজোরে প্রবেশ করে এবং ধমনীতে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ধমনী ও নিলয়ের সংযোগস্থলের অর্ধ-চন্দ্রাকার কপাটটি বন্ধ হয়ে যায়। এই বন্ধ হওয়ার জন্য যে আন্দোলন হয়, তাকে বলা হয় দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দু'টি হৃদ্‌ধ্বনি হতে সময় লাগে ০·৮ সেকেন্ড। ধমনীর প্রাচীরের পেশী প্রসারিত হয়ে এই রক্ত গ্রহণ করে, কিন্তু পেশী সংকোচন ও সম্প্রসারণশীল বলে পরক্ষণেই সঙ্কুচিত হয়। ধমনী-প্রাচীরের এই প্রসারণ সঙ্কোচনের ফলে নাড়ীতে স্পন্দন সৃষ্টি হয়। এই স্পন্দনে রক্ত ধমনীর ভিতর দিয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সেইজন্য হৃদ্‌স্পন্দনের তালে তালে ধমনীও স্পন্দিত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দেহে হৃদ্‌পিন্ডের কাজ সবচেয়ে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ।

রক্ত (Blood)ঃ রক্ত মৃদু ক্ষারজাতীয় একটি তরল পদার্থ। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দেহে ৬ থেকে ৮ কোয়ার্ট (Quart) এই তরল পদার্থ থাকে। এই তরল পদার্থে কিছুটা অক্সালেটের জলীয় দ্রবণ মিশিয়ে কিছুক্ষণ একটা পাত্রে রেখে দিলে উপরে স্বচ্ছ তরল পদার্থ ও নীচে অসংখ্য কণিকা দেখা যায়। রক্তের এই জলীয় অংশকে বলে রক্তরস (Plasma)। দেহের মোট রক্তের অর্ধেকের বেশী এই রক্তরস। আর বাকী অংশ কণিকাসমূহ। এই কণিকা তিন প্রকার—(১) লোহিত কণিকা, (২) শ্বেত কণিকা, (৩) অনুচক্রিমা। তাহলে লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা, অনুচক্রিমা ও রক্তরস—এই চার প্রকার উপাদানে রক্ত গঠিত।

লোহিত কণিকা (Red Corpuscle)ঃ রক্তের বিভিন্ন কণিকার মধ্যে এই লোহিত কণিকার সংখ্যা বেশী। লোহিত কণিকার কোষে কোন নিউক্লিয়াস নেই—তাই খালি চোখে দেখা যায় না। এক বিন্দু রক্তে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোহিত কণিকা দেখা যায়। হিমোগ্লোবিন নামক একপ্রকার লৌহগঠিত পদার্থের জন্য লোহিত কণিকার রং লাল হয়—ফলে রক্তের রং-ও লাল হয়। এই লোহিত কণিকা রক্তে প্রায় ১২০ দিন বিচরণ করে। তারপর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আমাদের দেহের প্লীহাগ্রন্থি এই ধ্বংসপ্রাপ্ত লোহিত কণিকা দেহ থেকে বের করে দেয়। লোহিত কণিকার প্রধান কাজ হল ফুস্‌ফুস্‌ থেকে অক্সিজেন নিয়ে দেহের বিভিন্ন কোষে পেঁছে দেওয়া ও সেখান থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও বিষাক্ত জলীয় বাষ্প ফুস্‌ফুসে নিয়ে যাওয়া। দেহের অস্থিমজ্জায় এই লোহিত কণিকার জন্ম।

শ্বেত কণিকা (White Corpuscle)ঃ শ্বেত কণিকা লোহিত কণিকার তুলনায় আকারে বড় এবং এতে নিউক্লিয়াস আছে। রক্তে শ্বেত কণিকার সংখ্যা অনেক কম। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে প্রায় ৮০০০ শ্বেত কণিকা দেখা যায়। নিউক্লিয়াস ও আকারে তারতম্য হেতু শ্বেত কণিকার প্রকারভেদ দেখা যায়। পুরুষের দেহ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দেহে এর সংখ্যা কম দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকার শ্বেত কণিকার মধ্যে লিউকোসাইট (Leucocyte) এবং লিম্ফোসাইট (Lymphocyte) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লিউকোসাইট শ্বেত কণিকা দেহের অস্থিমজ্জা থেকে আর লিম্ফোসাইট শ্বেত কণিকা লসিকা কলা (Lymph Nodes) থেকে উৎপন্ন হয়। এই শ্বেত কণিকা আমাদের দেহে দেহরক্ষীর কাজ করে। কোন রোগ-জীবাণু যদি আমাদের দেহে প্রবেশ করে, তবে এই শ্বেত কণিকা সঙ্গে সঙ্গে ঐ

সকল রোগ-জীবাণুকে আক্রমণ করে। দু'পক্ষে লড়াই হয়। যুদ্ধে হতাহত উভয়-পক্ষেই হয়। যুদ্ধে শ্বেত কণিকার জয় হলে আমরা সুস্থ থাকি আর পরাজয় ঘটলে রোগাক্রান্ত হই। উভয়পক্ষের মৃত সৈনিকদের দেহ পচে কলারসের সঙ্গে মিশে পুঁজ (Pus) আকারে দেহে এক জায়গায় জমা হয় এবং ঐ জায়গা ফুলে ওঠে। দু'একদিন পরে ঐ জায়গা পেকে যায় এবং পুঁজ বের হয়ে যায়। তাছাড়া শ্বেত কণিকা ক্ষতিগ্রস্ত কলা পুনর্গঠনে এবং রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

অনুচক্রিকা (Platelets)ঃ অনুচক্রিমা আকারে অতি ক্ষুদ্র। এরা অনেক-গুলি, একত্রিত হয়ে দল বেঁধে থাকে। এক ঘন মিলিমিটার রক্তে প্রায় ২,৫০,০০০ অনুচক্রিমা দেখা যায়। প্লীহা ও অস্থির লোহিত মজ্জার মধ্যে অনুচক্রিমার জন্ম। রক্ত জমাট বাঁধার কাজে এই অনুচক্রিমার বিশেষ প্রয়োজন হয়। রক্তের মধ্যে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় রক্ত জমাট বাঁধে, এই প্রক্রিয়াকে তখন তঞ্চন (Coagulation) বা জমাট-বাঁধা বলে। ফুসফুস্ হৃৎপিণ্ড বা মস্তিষ্কের কোন ক্ষুদ্রনালীতে এই ভাবে রক্ত জমাট বাঁধলে করোনারী থ্রম্বোসিস্ বা সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস্ রোগ হয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

রক্তরস (Plasma)ঃ রক্তরস দেখতে স্বচ্ছ অথচ কিছুটা ঘন। রক্তরসের শতকরা ৯০ ভাগ জল, বাকী ১০ ভাগ কঠিন পদার্থ। এই ১০ ভাগ অ্যালবুমিন, ফাইব্রিনোজেন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রোটিন জাতীয় পদার্থ দ্বারা সমৃদ্ধ। এই সব প্রোটিন জাতীয় পদার্থ রক্তের চাপ স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম্, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম জাতীয় ধাতব লবণও এই রক্তরসে দ্রবীভূত থাকে। কার্বোহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ ও প্রোটিন প্রভৃতি খাদ্যের সারাংশ এবং ফুসফুস্ গৃহীত অক্সিজেন গ্যাস, হরমোন নামক কতকগুলি এন্‌জাইম এবং নানাপ্রকার রোগ-প্রতিষেধক পদার্থ এই রক্তরসে দেখা যায়। বিপাক ক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাসও এই রক্তরসের সাহায্যে ফুসফুসে আসে।

ধমনী, শিরা, জালক ও লসিকা নালী

আমরা আগেই জেনেছি হৃৎপিণ্ড থেকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন-যুক্ত রক্ত যে পাইপ লাইন দিয়ে দেহের সর্বত্র বাহিত হয়, তাকে বলা হয় ধমনী (Artery)। হৃৎপিণ্ড থেকে এরূপ একটি ধমনী বের হয়েছে। এই ধমনী বাঁ নালী থেকে বের হয়ে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং শেষে প্রতিটি প্রশাখা ধমনী কতকগুলি জালকে (Capillaries) বিভক্ত হয়েছে। এই জালকের মাধ্যমে রক্ত বিভিন্ন কোষে খাদ্যদ্রব্যের সারাংশ পেঁছে দেয়। আবার অন্য দিকে কোষ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস ও বিভিন্ন প্রকার দূষিত পদার্থ ফুসফুসে নিয়ে আসে। কারণ এই জালকশ্রেণী একত্রিত হয়ে প্রশাখা শিরা গঠন করে। কয়েকটি প্রশাখা শিরা একত্রিত হয়ে একটি শিরা হয়, আবার কয়েকটি শিরা একত্রিত হয়ে একটি মহাশিরা হয়। এই মহাশিরা কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস ও নানাজাতীয় দূষিত পদার্থ ফুসফুসে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু সবটুকু অসার ও দূষিত পদার্থ জালকশ্রেণী গ্রহণ করতে পারে না। এইজন্য অবশিষ্ট দূষিত ও অসার পদার্থ অন্য এক প্রকার

পাইপ লাইনের সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি প্রধান শিরায় গিয়ে পড়ে, এই প্রকার পাইপ লাইনের নাম লসিকা নালী (Lymphatics)।

জালক (Capillaries)ঃ দেহে ধমনী ও শিরার প্রান্ত এই জালকশ্রেণী। এরই মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যের সারাংশ, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ রক্তের মধ্যে আদান-প্রদান হয়। জালকের একপ্রান্ত ধমনীর সংগে এবং অন্য প্রান্ত শিরার সংগে যুক্ত। এই জালক কলাকোষের চারপাশে ঘিরে আছে—ফলে রক্ত খাদ্যের সারাংশ, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস প্রভৃতি অতি সহজে আদান-প্রদান করতে পারে। এই জালক অতি সরু এবং সূক্ষ্ম। আমাদের দেহে এক বর্গ ইঞ্চি জায়গায় প্রায় ১৫,৬২,৫০০টি জালক আছে। দেহের সমস্ত জালক পাশাপাশি রাখলে প্রায় ৬২,০০০ মাইল দীর্ঘ হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেহে এই জালক কত নিবিড়ভাবে বর্তমান এবং কত আবশ্যক। এই জালকশ্রেণী সুস্থ ও সক্রিয় রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে যোগ-ব্যায়াম।

রক্তচাপ (Blood Pressure)ঃ ধমনীর ভিতর দিয়ে রক্ত অগ্রসর হবার সময় ধমনী-প্রাচীরে আঘাত লাগে। ধমনী-প্রাচীরে রক্তস্রোত যে শক্তিতে আঘাত করে তাকেই রক্তের চাপ বলা হয়। এই চাপ নির্ভর করে ধমনী-প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতার উপর। রক্তবাহী ধমনীগুলি রুগ্ন ও দুর্বল হয়ে পড়লে বা যে কোন কারণে তার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে গেলে রক্ত স্বাভাবিকভাবে তার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে পারে না। হৃৎপিণ্ডকে অতিক্রিয় ক'রে রক্ত পাঠাবার জন্য আরো চাপ সৃষ্টি করতে হয়—ফলে রক্তস্রোত ধমনী-প্রাচীরে স্বাভাবিক অপেক্ষা আরো জোরে আঘাত করে—ধমনী-প্রাচীরে আরো জোরে চাপ দেয়। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক লোকের স্বাভাবিক রক্তচাপ তার বয়সের অর্ধেকের সংগে ১০০ যোগ করলে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, কোন লোকের বয়স যদি ৪০ বছর হয় তবে তার রক্তের চাপ ১২০ মিলিমিটার হওয়া উচিত। তবে পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের রক্তের চাপ সাধারণত ১০ থেকে ১৫ মিলিমিটার কম থাকে, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের রক্তের চাপ ১১০ মিলিমিটারের কম হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

অবশ্য, এই রক্তচাপ আরো নানা কারণে কম বেশী হতে পারে। যেমন মানসিক চিন্তায়, উৎকণ্ঠায়, খাদ্য গ্রহণের পর, বা জোরে জোরে শ্বাস নিলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। ঠাণ্ডা বা গরম জলে স্নান করলেও রক্তচাপ কম বেশী হয়। মেয়েদের ঋতুকালে রক্তচাপ হ্রাস পায়, কিন্তু গর্ভাবস্থায় বা প্রসবকালে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। এইভাবে সাময়িকভাবে রক্তচাপ কম বেশী হলে রক্তের উচ্চচাপ বা নিম্নচাপ রোগ বলা ঠিক নয়। আমাদের দেহে নানাপ্রকার বিষে রক্ত দূষিত হতে পারে আর এই দূষিত রক্ত ধমনী ও শিরার কোমলতা ও নমনীয়তা নষ্ট করে দেয়—ফলে ঐগুলি শক্ত হয়ে যায় এবং তখনি আসে রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগ। আবার অধিক চর্বি জাতীয় খাবার গ্রহণ করলে—সেই অনুযায়ী ব্যায়াম ও পরিশ্রম না করলে ঐ অতিরিক্ত চর্বি দগ্ধ হতে পারে না। ঐ চর্বি তখন ধমনী ও শিরার প্রাচীরে জমতে আরম্ভ করে—রক্ত চলাচলের পথ সঙ্কুচিত করে দেয়। ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগ দেখা দেয়। এই রক্তচাপ রোগ থেকে দূরে থাকতে হলে দেহের পরিপাক ক্রিয়া ও রেচন তন্ত্র, শ্বসন-ক্রিয়া ও রক্ত-সংবহন-তন্ত্র সুস্থ ও সক্রিয় রাখা প্রয়োজন। আর এই প্রক্রিয়া সক্রিয় রাখার একমাত্র উপায় হলো পরিমিত আহার, ব্যায়াম ও যোগ-ব্যায়াম।

মেরুদণ্ড (Vertebral Column)

দেহের সব অংশের অস্থির গঠন ও তাদের কার্যপ্রণালী আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। এখানে শুধু মেরুদণ্ড সম্বন্ধে একটু আলোচনা করছি। কারণ, মেরুদণ্ডের সবলতা ও স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে আমাদের শরীরের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও কর্ম-ক্ষমতা।

আমাদের দেহের পিছনদিকে করোটির (Skull) নীচ থেকে যে দেহকাণ্ডটি বস্তিপ্রদেশ পর্যন্ত নেমে গেছে তাকে মেরুদণ্ড (Vertebral Column) বলে। এই মেরুদণ্ডটি কিন্তু একখানি অস্থি দ্বারা নির্মিত নয়। ৩৩ খানি ছোট ছোট ছিদ্রযুক্ত অস্থি দ্বারা এই মেরুদণ্ড গঠিত। এক এক খণ্ড অস্থিকে ভার্টিব্রা বা কশেরুকা (Vertebrae) বলে। প্রত্যেক কশেরুকা দেখতে একরকম না হলেও এদের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। প্রত্যেকটি কশেরুকার মধ্যে একটি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রকে নিউরাল গহ্বর (Neural Cavity) বলা হয়। এই গহ্বরের ঠিক সামনে একটি অস্থিময় নল আছে। এই নলটিকে বলা হয় সেণ্ট্রাম (Centram)। ঠিক তার অপরদিকে নিউরাল গহ্বরের চারদিকে কতকগুলো ছোট ছোট উদ্গত অংশ আছে। এই অংশেই কশেরুকাগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়। যুক্ত অঞ্চলের কশেরুকার সঙ্গে আবার বুকের পাঁজরের অস্থিগুলি (Ribs) যুক্ত থাকে। এই সংযোগস্থলেও অনুরূপ উদ্গত অংশ আছে। এখানে সেণ্ট্রাম থাকে সামনের দিকে এবং উদ্গত অংশগুলি থাকে পিছনদিকে। প্রত্যেক দুটি কশেরুকার মাঝখানে তরুণাস্থির (Cartilage) একটি পুরু আস্তরণ আছে। এই তরুণাস্থির সুস্থতার উপর নির্ভর করে মেরুদণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা। মেরুদণ্ড সংলগ্ন পেশী সঙ্কুচিত হলে তরুণাস্থিও সঙ্কুচিত হয়—ফলে কশেরুকা পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসে। আবার পেশী শিথিল হলে তরুণাস্থিও নিজের জায়গায় ফিরে যায় এবং কশেরুকাগুলি পরস্পর থেকে দূরে চলে যায়। দেহ সামনে, পিছনে, ডাইনে ও বাঁয়ে বাঁকালে ঐ একই ক্রিয়া হয়। দুটি কশেরুকার মাঝে এই তরুণাস্থি থাকায় শরীর যে কোন দিকে বাঁকানো সম্ভব হয়।

যৌবনকে অটুট রাখতে এবং দেহকে কার্যক্ষম রাখতে এই তরুণাস্থির ভূমিকা দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তরুণাস্থি তার স্থিতিস্থাপকতা হারালে দেহে অকালে বার্ধক্য নেমে আসে।

আবার কশেরুকাগুলি একের পর এক এমনভাবে সাজান রয়েছে যে ওদের নিউরাল গহ্বরগুলি মিলে একটি ফাঁপা নলের সৃষ্টি হয়েছে। এই নলের ভিতর দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ডটি প্রবাহিত হয়েছে। মেরুদণ্ডটির বিভিন্ন অংশের কাজ অনুযায়ী তাকে ৫টি অংশে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—(১) গ্রীবাদেশীয় অংশ (Cervical Vertebrae)—করোটি প্রথম ৭ খানি কশেরুকা নিয়ে এই অংশটি গঠিত। (২) বক্ষদেশীয় অংশ (Thoracic Vertebrae)—গ্রীবাদেশীয় অংশের পরের ১২ খানি কশেরুকা নিয়ে এই অংশটি গঠিত। এই কশেরুকার প্রত্যেকটির সঙ্গে এক জোড়া করে বুকের পাঁজরের অস্থি (Ribs) যুক্ত আছে। (৩) কটিদেশীয় অংশ (Lumber Vertebrae)—বক্ষদেশীয় অংশের পরবর্তী ৫ খানি কশেরুকা নিয়ে এই অংশ গঠিত। (৪) ত্রিকাস্থি (Sacral Vertebrae)—কটিদেশীয় অংশের

পর ৫ খানি কশেরুকা এই অংশের অন্তর্গত। পরিণত বয়সে এই ৫ খানি অস্থি একসঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। (৫) অনুত্রিকাস্থি (Coccygeal Vertebrae)—অবশিষ্ট ৪ খানি কশেরুকা নিয়ে এই অংশ গঠিত। যে সকল জীবের লেজ আছে তাদের এই অনুত্রিকাস্থি অনেক বড় হয় এবং তাতে অনেকগুলি কশেরুকা থাকে।

পেশী (Muscles)ঃ কঙ্কালের উপর মাংসপেশীর আবরণে দেহ গঠিত। এর মধ্যে আবার অসংখ্য ধমনী, শিরা, উপশিরা, স্নায়ু প্রভৃতি রয়েছে। আমাদের দেহে বিভিন্ন প্রকারের পেশী আছে। কতকগুলো পেশী আমাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর না করে দেহের অভ্যন্তরে নিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। যেমন—হৃৎপিন্ড, খাদ্যনালী পেশী, পাকস্থলী পেশী, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের পেশী। খাদ্যবস্তু মুখ-গহ্বর থেকে নীচে নেমেই আপনা থেকে খাদ্যনালী দিয়ে প্রথমে পাকস্থলীতে, তারপর ক্ষুদ্রান্ত্রে, শেষে বৃহদন্ত্রে চলে যাচ্ছে। খাদ্যনালী, পাকস্থলী ও অন্ত্রের পেশী নিজে থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। সেইরূপ হৃৎপিন্ড ভ্রূণের পাঁচ মাস কাল বয়স থেকে মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত অবিরাম কাজ করে যায়। কারো ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর তার কাজ নির্ভর করে না। দেহের এই ধরনের পেশীকে মসৃণ পেশী (Smooth Muscles) বলে। আবার কতকগুলো পেশীর এক বা উভয় প্রান্ত অস্থি বা হাড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই জাতীয় পেশীই আমাদের দেহে বেশী। এই সব পেশীতে ফিকা ও গাঢ় রঙের ডোরা কাটা থাকে। তাই এই জাতীয় পেশীকে ডোরাকাটা পেশী (Striated Muscles) বলে।

ডোরাকাটা পেশীগুলি অতি সহজেই উত্তেজিত হতে পারে এবং অতি অল্প সময়ে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। মসৃণ পেশী সহজে উত্তেজিত হয় না আর সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হতে বেশ সময় লাগে, মসৃণ তন্তুতে পাকস্থলী ও অন্ত্রের পেশীসমূহের একবার সঙ্কুচিত হতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে।

পেশীর গঠনঃ হাড়ের সঙ্গে যুক্ত পেশী কতকগুলো লম্বা সরু সরু তন্তু (Fibres) একত্রে মিলিত হয়েছে। এক একটি তন্তুর মধ্যে একই আবরণীর (Membrane) মধ্যে একাধিক নিউক্লিয়াস আছে। সুতরাং এক একটি তন্তু একাধিক কোষ (Cell) দ্বারা গঠিত বলা যেতে পারে। কিন্তু মসৃণ পেশীর তন্তুতে একটিমাত্র নিউক্লিয়াস থাকে। সুতরাং ঐ তন্তু মাত্র একটি কোষ দ্বারা গঠিত।

পেশীর কাজঃ পেশীর প্রধান কাজ দেহে গতি সঞ্চার করা। দেহের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পেশীর সাহায্য ছাড়া কাজ করতে পারে না। ডোরাকাটা পেশীগুলি একপ্রকার শক্ত সাদা ফিতের (Tendon) মাধ্যমে হাড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পেশীর দুই প্রান্ত এই সাদা ফিতের সাহায্যে নিকটস্থ হাড়ের সংযোগ-স্থলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। আমাদের দেহে পেশীতে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় স্নায়ু তাড়না (Nerve impulses) থেকে। স্নায়ু তাড়নায় পেশীতে যখন উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তখন ঐ পেশী সঙ্কুচিত হয়ে পেশী সংলগ্ন হাড়কে সচল করে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহের ঐ অঙ্গে গতির সৃষ্টি হয়। তাই হাত উঠানো-নামানো, দৌড়ান, সাঁতার কাটা, লাফ দেওয়া, ব্যায়াম করা প্রভৃতি কাজ সম্ভব হয়। তাই দেহে পেশীর সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের সম্বন্ধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একে অপরকে বাদ দিয়ে কোন কাজ করতে পারে না। অবশ্য, মসৃণ পেশীর কথা আলাদা, মসৃণ পেশী আমাদের অল্পই আছে। পেশী বলতে সাধারণতঃ ডোরাকাটা পেশীই বুঝায়। দেহে প্রায় ৬০০-রও বেশী অস্থি-সংযুক্ত ডোরাকাটা পেশী আছে।

পেশীর আর একটি কাজ হল দেহের তাপ সৃষ্টি করা। একজন সুস্থ লোকের দেহের তাপ ৯৮·৬° ফাঃ। সবরকম প্রাকৃতিক অবস্থায় এবং সব ঋতুতে দেহে এই একই তাপমাত্রা থাকে। কম বেশী হওয়া মানেই অসুস্থতার লক্ষণ। আমাদের দেহ থেকে অনবরত নিঃশ্বাসের সঙ্গে ও ত্বকের মাধ্যমে তাপ বের হয়ে যাচ্ছে। তাই দেহের তাপ সবসময় ৯৮·৬° ফাঃ রাখার জন্য দেহপ্রকৃতি নিজে ব্যবস্থা করে রেখেছে। দেহের পেশীসমূহ এই তাপ উৎপাদন করে। খাদ্যদ্রব্য থেকে আমরা যে শক্তি (Energy) পাই, তাকে রাসায়নিক (Chemical) শক্তি বলে। পেশী সঙ্কোচনের সময় দেহের শক্তিতে পরিণত হয়ে পেশী সঙ্কোচনে সাহায্য করে। রাসায়নিক-শক্তি যান্ত্রিক-শক্তিতে রূপান্তরিত হবার সময় দেহে তাপ সৃষ্টি করে। রাসায়নিক-শক্তির শতকরা ৭০।৮০ ভাগ এইভাবে দেহে রূপান্তরিত হয়। আবার আমরা শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে দেহে যে অক্সিজেন গ্রহণ করি তা পেশীর মধ্যে কার্বন ও হাইড্রোজেনের সঙ্গে রাসায়নিক সম্মেলন হয়। এই রাসায়নিক শক্তির কিছু অংশ প্রোটোপ্লাজমাস্থ যৌগিক-পদার্থগুলিতে গিয়ে সেগুলিকে জীবন্ত করে তোলে এবং অবশিষ্টাংশ দেহে তাপ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এইভাবে পেশী দেহে তাপ উৎপাদন করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শরীর সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখতে দেহে পেশীরও এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। আর দেহের সমস্ত পেশীকে কেবলমাত্র যোগ-ব্যায়ামের সাহায্যে সুস্থ ও সক্রিয় রাখা যায়।

স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System)

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, গায়ে কোন জায়গায় মশা বসার সঙ্গে সঙ্গে হাত সেখানে মশা তাড়াতে চলে যায়। হাত কি করে জানতে পারে দেহের কোন জায়গায় মশা বসেছে? কে তাকে মশা তাড়াতে হুকুম দেয়? তেমনি কোন লোভনীয় খাবার দেখলে আমাদের মুখে জল আসে। দেখার কাজ চোখের আর সুগন্ধ পাওয়ার কাজ নাকের। তবে মুখে জল আসতে গেল কেন? চোখের কাছে কোন পোকামাকড় এলে সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা দুটি বন্ধ হয়ে যায়। কে বলে দেয় এই পোকা-মাকড়ের অস্তিত্ব? কার হুকুমে চোখের পাতা দুটি বন্ধ হয়ে যায়? কে বা বন্ধ করে? একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, আমাদের হাত, পা, চোখ, নাক, কান প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেন কোন অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কে যেন দেহের মধ্যে বসে দেহের প্রতিটি অংশের খবরাখবর নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে যেমন তার কাছে খবর নিয়ে যাওয়া হয় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে দেহের নির্দিষ্ট অংশে তার আদেশ পেঁছে দেওয়াও হয়। এরূপ দ্রুত খবরাখবর দেওয়াই হলো স্নায়ুতন্ত্রের কাজ। দেহের মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড এই স্নায়ুতন্ত্রের হেড-অফিস। আর হাত, পা, নাক, মুখ প্রভৃতি দেহের প্রতিটি অংগ-প্রত্যঙ্গ হলো শাখা অফিস।

স্নায়ুতন্ত্রকে টেলিগ্রাফ্ বা টেলিফোনের তারের সঙ্গে তুলনা করলে কাজটা বেশ ভালভাবে বুঝতে পারা যাবে। মনে করা যাক্, কোন দপ্তরের হেড-অফিস কলকাতায় এবং সমস্ত পশ্চিমবাংলায় তার শাখা-প্রশাখা অফিস রয়েছে। শাখা-প্রশাখা অফিস-গুলি তাদের দৈনন্দিন জরুরী প্রয়োজন যেমন টেলিগ্রাফ্ বা টেলিফোনের তারের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে পারে, তেমনি হেড-অফিসও ঐ তারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয়

আদেশ বা উপদেশ দিয়ে দিতে পারে। আমাদের দেহের স্নায়ুজাল ঐরূপ টেলিগ্রাফ্ বা টেলিফোনের তারের মত। কলকাতার হেড-অফিস যেমন সমস্ত শাখা-প্রশাখা অফিসগুলি তারের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করছে, তেমনি আমাদের দেহের মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড স্নায়ুজালের সাহায্যে দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও দেহযন্ত্রগুলি নিয়ন্ত্রণ করছে। পায়ে মশা কামড়ানোর সঙ্গে সংগে পায়ের স্নায়ু মগজ ও সুষুম্না-কাণ্ডকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, পায়ে অমুক জায়গায় মশা বসেছে এবং মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড অমনি সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুর মাধ্যমে হাতের পেশীকে তার আদেশ জানিয়ে দিচ্ছে। মুহূর্তে পেশীর সংকোচন ও প্রসারণ ঘটে যাবার ফলেই হাত গিয়ে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ছে মশার ওপর।

স্নায়ুতন্ত্রের কাজ খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়—যে তন্ত্রের সাহায্যে আমরা দেখি, শুনি, স্বাদ বা ঘ্রাণ গ্রহণ করি, ঠাণ্ডা, গরম, স্পর্শ, সুখ, বেদনা ইত্যাদি অনুভব করি, ভাল মন্দ বিচার-বিবেচনা করি, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে দেহের অঙ্গ-চালনা করি তার নাম স্নায়ুতন্ত্র।

আগেই বলা হয়েছে যে, সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্ক বা মগজ এই স্নায়ুতন্ত্রের হেড-অফিস। তাহলে মগজ, সুষুম্নাকাণ্ড এবং হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ, কান প্রভৃতি দেহের সমস্ত অংশের স্নায়ুজাল নিয়ে এই স্নায়ুজাল গঠিত। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড থেকে মোটামুটি স্নায়ু বের হয়ে সেগুলি আবার অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় ভাগ হয়ে দেহের প্রতিটি অঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে।

স্নায়ু কতকগুলি বিশেষ ধরনের কোষের (Cell) দ্বারা গঠিত। এই কোষ-গুলিকে বলা হয় স্নায়ু কোষ (Nerve Cell) বা নিউরণ (Neuron)। দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে খবর মগজ ও সুষুম্নাকাণ্ডে পেঁছে দেওয়া এবং সেখানে দেহের প্রয়োজনীয় অংশে আদেশ দেওয়ার কাজ কিন্তু একইপ্রকার স্নায়ু দ্বারা হয় না। যে সকল স্নায়ু দ্বারা খবর হেড-অফিসে জানিয়ে দেওয়া হয়, তাকে বলা হয় সংবেদীয় স্নায়ু (Sensory Nerve)। এই সংবেদীয় স্নায়ু যে কোষ দ্বারা গঠিত তাকে সংবেদীয় নিউরণ বলে। আবার যে সমস্ত স্নায়ু দ্বারা হেড-অফিস থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে হুকুম জানিয়ে দেওয়া হয় তাকে বলা হয় চেষ্টিয় স্নায়ু (Motor or Efferent Nerve), আর তার কোষকে বলা হয় চেষ্টিয় নিউরণ। নিউরণ-এর যে অংশে নিউক্লিয়াসটি থাকে সেই অংশটিকে বলা হয় সেল্ বডি (Cell Body)। এই সেল্ বডির এক অংশ থেকে একটি একটি সুতোর মতো জিনিস বের হয়ে এসে অনেক সরু অংশে ভাগ হয়ে গেছে—এগুলিকে বলা হয় অ্যাক্সন (Axon)। এই অ্যাক্সন আবার একপ্রকার কোষ দ্বারা আবৃত। এই কোষগুলিকে বলে শেথ্ কোষ (Sheath Cell)। কোষগুলি আবার মায়েলিন (Myelin) নামক একপ্রকার পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে। সেল্ বডির অন্যান্য অংশ থেকে আবার কতকগুলি সরু সুতোর মতো জিনিস বের হয়ে বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে। এগুলিকে বলা হয় ডেনড্রাইট্ (Dendrite)। তা হলে দেখা যাচ্ছে, সেল্ বডি, অ্যাক্সন, ডেনড্রাইট নিয়ে একটি চেষ্টিয় নিউরণ গঠিত। চেষ্টিয় নিউরণ-এর সেল্ বডি ও ডেনড্রাইট সুষুম্নাকাণ্ডও মগজের মধ্যে থাকে এবং শুধুমাত্র অ্যাক্সনগুলি বাইরে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এই অ্যাক্সন-এর সাহায্যে মগজ ও সুষুম্নাকাণ্ড দেহের প্রয়োজনীয় অঙ্গে আদেশ জানিয়ে দেয়।

এবার দেখা যাক সংবেদীয় নিউরণ। এই নিউরণ-এর সেল্‌বডির এক অংশ থেকে একটি সরু এবং ছোট সুতোর মতো জিনিস বের হয়ে এসেছে। একেই বলা হয় ডেনড্রাইট।

এই ডেনড্রাইট আবার বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে। এগুলি মগজ ও সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে থাকে। সেল্‌বডির অন্য অংশ থেকে আর একটি সরু অথচ লম্বা সুতোর মতো জিনিস বের হয়ে অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় ভাগ হয়ে দেহের সর্বত্র বিভিন্ন অঙ্গের কোষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। এগুলিকে বলা হয় অ্যাক্সন। সংবেদীয় নিউরণ-এর সেল্‌বডিটি কিন্তু সুষুম্নাকাণ্ড বা মগজের মধ্যে থাকে না—বাইরে কাছাকাছি এক জায়গায় দলবদ্ধভাবে থাকে। এই জায়গাটিকে বলা হয় গ্যাংলিয়ন (Ganglion)। অ্যাক্সনের সাহায্যে সংবেদীয় নিউরণ দেহের বিভিন্ন অংশের খবর মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডে পেঁাছে দেয়।

আমরা আগেই জেনেছি যে, পিঠের মেরুদণ্ডটি কতকগুলো ছিদ্রযুক্ত অস্থিখণ্ড দ্বারা গঠিত, তাই মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে নলের মত একটি পাইপ লাইন চলে গেছে। আবার মেরুদণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ডের দু'পাশে একটি করে ছিদ্র আছে। সুষুম্নাকাণ্ডের নিকটে সেই স্নায়ুগুলি একত্রে মিলিত হয়ে এক একটি মোটা স্নায়ুতে পরিণত হয়। আবার কতকগুলি মোটা স্নায়ু একসঙ্গে মিলিত হয়ে একটি মেরু স্নায়ুতে (Spinal Nerve) পরিণত হয়। এই মেরু স্নায়ুগুলি মেরুদণ্ডের অস্থির ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়ে মেরুদণ্ডের মধ্যে চলে গেছে। মেরু স্নায়ুগুলি গুচ্ছাকারে মেরুদণ্ডের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। মগজ থেকে বস্থিপ্রদেশ পর্যন্ত এই স্নায়ুগুচ্ছকে সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord) বলা হয়। এটি দেখতে অনেকটা ইলেক্‌ট্রিক কেবল্‌ (Electric Cable)-এর মত। এইভাবে স্নায়ুর এক প্রান্ত সুষুম্নাকাণ্ডের সংগে যুক্ত। আবার মস্তিষ্ক থেকে করোটির ছিদ্র দিয়ে স্নায়ুগুলি বের হয়ে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

এবার অ্যাক্সন-এর গঠন ও কার্যপ্রণালী একটু লক্ষ্য করে দেখা যাক্। সংবেদীয় এবং চেষ্টিয় উভয় নিউরণ-এর কতকগুলো অ্যাক্সন এক একটি স্নায়ু গঠন করে। এই অ্যাক্সন একসঙ্গে মায়েলিন নামক সাদা বস্তু দ্বারা আবৃত থাকে। তাই স্নায়ু সাদা দেখায়। তাহলে একটি স্নায়ুর ভিতর দিয়ে সংবেদীয় ও চেষ্টিয় উভয় অ্যাক্সন চলে গেছে এবং দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে—ফলে একটি স্নায়ুর সংবেদীয় অ্যাক্সন দেহের চোখ, কান, নাক, মুখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কোষের সঙ্গে যুক্ত থেকে খবর সংগ্রহ করে মগজ ও সুষুম্নাকাণ্ডে পাঠাতে পারে ; আবার সেখান থেকে সেই একই স্নায়ুর চেষ্টিয় নিউরণ-এর অ্যাক্সন-এর প্রান্তসমূহ পেশী, গ্রন্থি প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় আদেশ দেহের ঐ সব আজ্ঞাবহ অংশে পেঁাছে দিতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের শরীর সবল ও কর্মক্ষম রাখতে হলে দেহের স্নায়ুতন্ত্রকে সুস্থ ও সক্রিয় রাখা অবশ্য দরকার। আর এই স্নায়ুতন্ত্র সবল ও সক্রিয় রাখার একমাত্র উপায় হলো নিয়মিত যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস করা।

মস্তিষ্ক বা মগজ (Brain)ঃ মস্তিষ্ক বা মগজ মাথার করোটির মধ্যে অবস্থিত। এরই প্রভাবে কোন ব্যক্তি মানব সমাজে যশ, মান, খ্যাতির উচ্চ শিখরে উঠতে পারে। জীবনে ভাল-মন্দ এরই কাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এরই প্রভাবে কেউ বা হয় হাবা-বোবা, বিচার-বুদ্ধিহীন আবার কেউ বা হয় বিদ্বান, বুদ্ধিমান।

এই মস্তিষ্ককে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন—গুরু-মস্তিষ্ক (Cerebrum), থালামাস্ ও অধস্থালামাস্ (Thalamus and Hypothalamus), মধ্য-মস্তিষ্ক (Mid-Brain), মধ্য-যোজক (Pons), লঘু-মস্তিষ্ক (Cerebellum) এবং সুষুম্নাশীর্ষক (Medula oblangata)। এই মস্তিষ্ক থেকে যে ১২ জোড়া স্নায়ু বের হয়েছে তাকে বলা হয় করোটি স্নায়ু (Cranial Nerves)।

মস্তিষ্কের সব অংশের মধ্যে গুরু-মস্তিষ্ক সব চেয়ে বড় এবং মস্তিষ্কের কাজের প্রধান ভূমিকা নিয়ে আছে। এই গুরু-মস্তিষ্ককে আবার দু'টি অংশে ভাগ করা যায়। অংশ দু'টি কতকগুলি গভীর খাঁজের দ্বারা পিণ্ড সৃষ্টি করেছে। পিণ্ডগুলি আবার কতকগুলি অগভীর খাঁজের দ্বারা কতকগুলি ছোট ছোট পিণ্ডকে ভাগ হয়ে আছে। এই সব পিণ্ডক আমাদের চিন্তাশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ঘ্রাণশক্তি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতপক্ষে, গুরু-মস্তিষ্কই দেহের শক্তি বা কর্তা। তার অগোচরে দেহে কোন কাজ হতে পারে না। বিদ্যাবুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি প্রভৃতি গুরু-মস্তিষ্কের পিণ্ডকের উপর নির্ভর করে। যার মস্তিষ্কের যত বেশী পিণ্ডক আছে তার চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধি তত প্রখর। গুরু-মস্তিষ্কের পিছনের অংশে শ্রুতি কেন্দ্র, দর্শন কেন্দ্র প্রভৃতি অবস্থিত।

গুরু-মস্তিষ্কের ঠিক নীচে ধূসর রং-এর বড় অংশটির নাম থালামাস্, আর ঠিক তার নীচের অংশটির নাম অধস্থালামাস্। থালামাসের সাহায্যে আমরা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অনুভব করি। দুঃখ, বেদনা, লজ্জা, রাগ, অনুরাগ, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনাগুলিও এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অধস্থালামাস্ আত্মরক্ষা, অপরকে আক্রমণ করা প্রভৃতি কতকগুলি কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া নিদ্রা ও দেহের তাপ সংরক্ষণে শর্করা ও স্নেহজাতীয় পদার্থের বিপাকক্রিয়ায় সাহায্য করে। থালামাস্ ও অধস্থালমাস্-এর নীচে মধ্য-মস্তিষ্ক। মধ্য-মস্তিষ্ক চারটি পিণ্ড নিয়ে গঠিত। উপরের দুটি পিণ্ডকে নিম্নদৃষ্টি কেন্দ্র এবং নীচের দুটি কেন্দ্রকে নিম্নশ্রুতি কেন্দ্র বলে। মধ্য-মস্তিষ্কে লোহিত নিউক্লিয়াস (Red Nucleus) এবং কৃষ্ণোপাদান (Sustantia Nigra) নামক আরো দুটি অংশ আছে। নাচ, অঙ্গ-ভঙ্গি, ব্যায়াম প্রভৃতি কতকগুলি নির্দিষ্ট ও নিপুণ পেশী চালনা মধ্য-মস্তিষ্কের এই দুটি অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

মধ্য-মস্তিষ্কের নীচে মস্তিষ্ক-যোজক অবস্থিত। এর দ্বারা নাক, বাক্‌যন্ত্র, মুখ ও গলার পেশী নিয়ন্ত্রিত হয়। মধ্য-মস্তিষ্কের সঙ্গে লঘু-মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাশীর্ষক-এর যোগাযোগ এই মস্তিষ্ক-যোজকের মাধ্যমে হয়।

সুষুম্নাশীর্ষকের পাশে লঘু-মস্তিষ্ক অবস্থিত। এটি মধ্য-মস্তিষ্ক, মস্তিষ্ক-যোজক ও সুষুম্নাশীর্ষক-এর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। লঘু-মস্তিষ্ক দেহে পেশীর কাজের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য রাখে। পেশীর স্বাভাবিক সঙ্কোচনও এর সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়।

সুষুম্নাশীর্ষক মস্তিষ্ক যোজকের নীচে এবং সুষুম্নাকাণ্ডের উপরে অবস্থিত। এর দ্বারা আমাদের হৃদ্‌স্পন্দন, শ্বাসক্রিয়া, লালা নিঃসরণ, বমন, ধমনী সঙ্কোচন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। যকৃতে কার্বোহাইড্রেট গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হওয়ার কাজ সুষুম্নাশীর্ষক থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহের এই অংশটিতে আঘাত লাগলে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাতে হয়—জোরে আঘাত লাগলে মৃত্যুও হতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে যে, দেহের প্রতিটি তন্তু কোষ রক্তের মাধ্যমে তাদের পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে এবং হৃৎপিণ্ড দেহের সর্বত্র রক্ত পরিচালিত করে। যেহেতু মস্তিষ্ক বা মগজ দেহের সবচেয়ে উপরে অবস্থিত, সেইহেতু মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে বা হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতার জন্য কখনও কখনও মগজে ঠিকমত রক্ত পাঠানো সম্ভবপর হয় না। সর্বাংগাসন, শীর্ষাসন, শশঙ্গাসন প্রভৃতি আসনকালে মাথা নীচের দিকে থাকে এবং সহজেই হৃৎপিণ্ড মাথায় প্রচুর রক্ত পাঠাতে পারে—ফলে মগজও তার প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে পারে। আর কোন ব্যায়ামে মগজের এই উপকার হয় না।

গ্রন্থি (Glands)

আমাদের দেহে বহু গ্রন্থি আছে। এই সব গ্রন্থির কতকগুলি বহিঃক্ষরা বা বহিঃস্রাবী (Exocrine) নালীযুক্ত (Duct) গ্রন্থি আবার কতকগুলি অন্তঃক্ষরা বা অন্তঃস্রাবী (Endocrine) নালীহীন (Ductless) গ্রন্থি। তাছাড়া দেহে এমনও গ্রন্থি আছে, যার এক অংশ নালীযুক্ত এবং অপর অংশ নালীহীন—যেমন অগ্ন্যাশয় (Pancreas)। লালাস্রাবী গ্রন্থি, অশ্রুস্রাবী গ্রন্থি, ঘর্মগ্রন্থি প্রভৃতি গ্রন্থিগুলি বহিঃস্রাবী নালীযুক্ত গ্রন্থি। লালাস্রাবী গ্রন্থি থেকে লালা নিঃসৃত হয়ে মুখে খাদ্যের সঙ্গে মিশে খাদ্যবস্তু পাকস্থলীতে পেঁছুতে এবং হজমে সাহায্য করে। তেমনি ঘর্মগ্রন্থির সাহায্যে আমাদের দেহ থেকে ঘাম বের হয়ে যায়। পিনিয়াল, পিটুইটারী, থাইরয়েড্, প্যারাথাইরয়েড্, থাইমাস্, এড্রিন্যাল প্রভৃতি গ্রন্থিগুলি অন্তঃস্রাবী নালীহীন গ্রন্থি। এই জাতীয় গ্রন্থি-নিঃসৃত রসকে বলা হয় হরমোন। ঐ সব গ্রন্থির নিঃসৃত রস সরাসরি রক্তে ও লসিকায় মিশে যায় এবং দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। এই অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলি নিয়ন্ত্রণ করে মানবজাতির আকৃতি। এদেরই প্রভাবে কেউ হয় দীর্ঘ, স্থূলকায়, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, তেজোদীপ্ত, ক্ষীণকায়, মূর্খ, হাবা-বোবা, ভীরু, কাপুরুষ প্রভৃতি। এদেরই প্রভাবে কেউ হয় সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী আবার কেউ বা হয় কুৎসিত ও চির রুগ্ন। হরমোন রক্তের সঙ্গে মিশে দেহ ও মন গঠন এবং উৎকর্ষতার কাজে দেহে রোগ প্রতি-রোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সরাসরি অংশ নেয়। এখন পৃথিবীতে এক যোগ-ব্যায়াম ছাড়া এমন কোন ব্যায়াম আবিষ্কৃত হয় নি, যা দেহের এই অত্যাবশ্যক গ্রন্থিগুলিকে সবল ও সক্রিয় রাখতে সাহায্য করতে পারে। যেমন, ধরা যাক—পিটুইটারী গ্রন্থি। আমাদের দেহে পিটুইটারী গ্রন্থির ভূমিকাই সব চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। দেহের প্রায় সবগুলি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি এই পিটুইটারী গ্রন্থি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মস্তিষ্কের নিচের দিকে একটি ক্ষুদ্র অস্থিগহ্বরে এই গ্রন্থিটি অবস্থিত।

আগেই বলা হয়েছে যে, আমাদের দেহ-যন্ত্রগুলি রক্ত থেকে তাদের পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে। মাধ্যাকর্ষণ নিয়মানুসারে হৃৎপিণ্ডকে বেশ পরিশ্রম করে মস্তিষ্কে রক্ত পাঠাতে হয়। হৃৎপিণ্ড দুর্বল হলে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ প্রয়োজন মত নাও হতে পারে। যোগ-ব্যায়ামে এমন কতকগুলি আসন আছে (যেমন—শীর্ষাসন, শশাঙ্গাসন, সর্বাংগাসন প্রভৃতি) যেগুলি অভ্যাসকালে মস্তিষ্কে সহজে রক্ত প্লাবিত হয় এবং পিটুইটারী গ্রন্থি অতি সহজে তার পুষ্টির উপাদান রক্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারে।

সেইরূপ, থাইরয়েড্ গ্রন্থি এবং প্যারা-থাইরয়েড্ গ্রন্থি দুটি আমাদের দেহের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থি। থাইরয়েড্ গ্রন্থি থেকে যে হরমোন নিঃসৃত হয়,

তাকে থাইরোক্সিন বলে। আইওডিন থাইরোক্সিনের এই বিশেষ উপাদান। থাইরোক্সিন দেহের বিপাক-ক্রিয়ায় সাহায্য করে। এই থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত রসের অভাব হলে বা কমতি হলে দেহে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে দেখা যাক। ১। শিশুদের এর অভাব হলে বা কমতি হলে হাড়ের বৃদ্ধি হয় না—লম্বায় বাড়ে না কিন্তু মোটা হয়—শিশু ক্রমে বামন হয়ে যায়, মাথার খুলির হাড় জুড়ে যায়—আর বাড়তে পারে না, শিশুর বয়স বাড়লে প্রায়ই জড় বুদ্ধি হয়ে যায়। ২। জোয়ান বয়েসে যদি এ ঘটনা ঘটে তবে তার চালচলন, হাবভাব, কথা বলার ক্ষমতা, চিন্তাশক্তি সব ঝিমিয়ে আসে, টিসু মোটা ও শক্ত হয়ে দেহে শোথ দেখা দেয়, মিক্সিডিমা রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। দেহ ফোলাফোলা মনে হয়, চুল উঠে যায়, ঠিকভাবে হাঁট্‌তে পারে না, বুদ্ধি-শুদ্ধি কমে যায় এবং দেহের তাপ কমে যায়। আমাদের দেহে যদিও আইওডিনের প্রয়োজন অত্যন্ত অল্প, তবুও এই অত্যাবশ্যকীয় উপাদানটি না থাকলে দেহ-যন্ত্রগুলি অচল হয়ে পড়ে। এই থাইরয়েড্ ও প্যারা-থাইরয়েড্ গ্রন্থিগুলি, এমন কোন ব্যায়াম নেই যার দ্বারা সুস্থ থাকতে পারে; অথচ যোগ-ব্যায়ামের সর্বাঙ্গাসন ও মৎস্যাসন এই গ্রন্থিগুলিকে সহজেই সুস্থ রাখে।

কয়েকটি বিশেষ গ্রন্থি ও তাদের অবস্থান
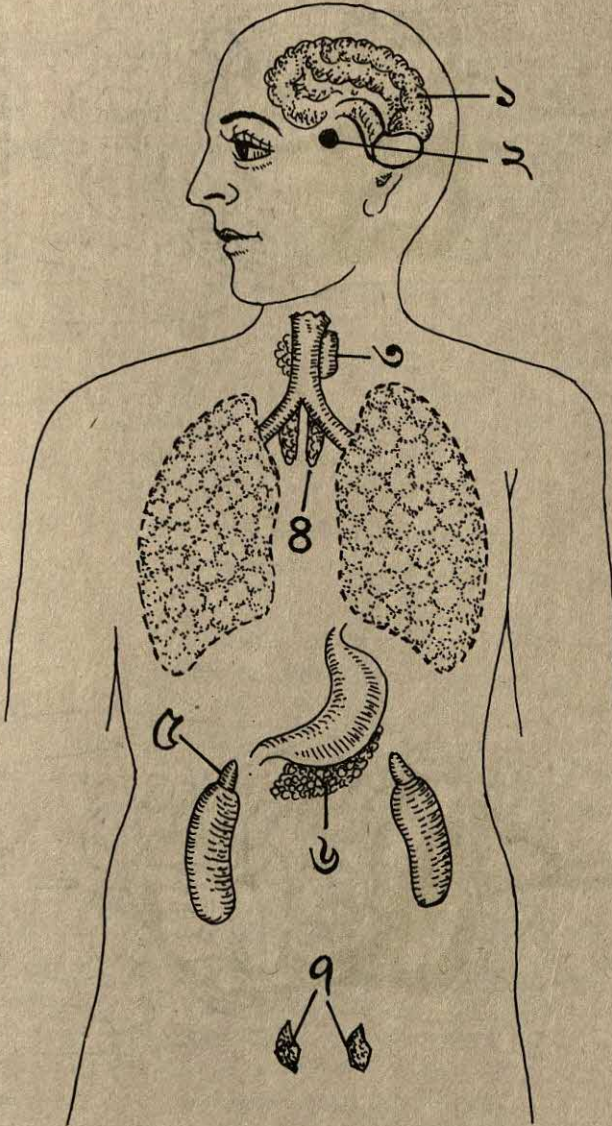
১। পিনিয়াল গ্রন্থি, ২। পিটুইটারী গ্রন্থি, ৩। থাইরয়েড গ্রন্থি, ৪। থাইমাস্ গ্রন্থি, ৫। এড্রিন্যাল গ্রন্থি, ৬। অগ্ন্যাশয়, ৭। যৌনগ্রন্থি।

দেহাভ্যন্তরস্থ বিশেষ কয়েকটি যন্ত্র ও তাদের অবস্থান

সুস্থ দেহ-যন্ত্রের লক্ষণ

অসুস্থ দেহ-যন্ত্রের লক্ষণ
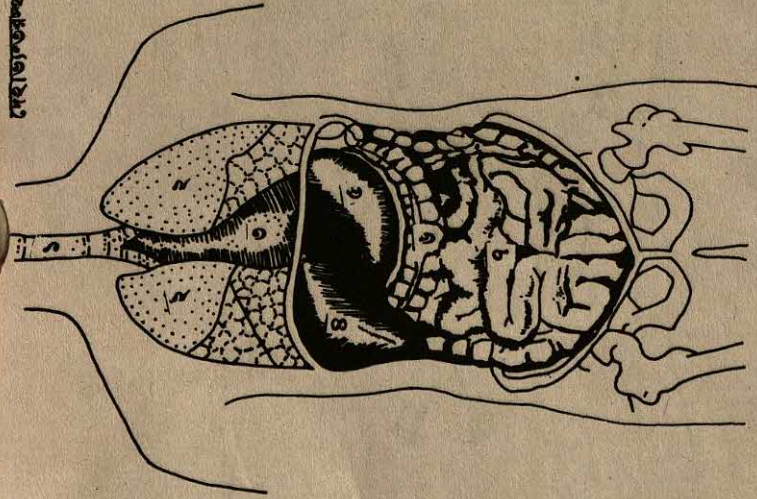
১। শ্বাসনালী, ২। ফুস্‌ফুস্‌, ৩। হৃৎপিণ্ড, ৪। যকৃৎ, ৫। পাকস্থলী, ৬। ক্ষুদ্রান্ত্র, ৭। বৃহদান্ত্র।

চতুর্থ অধ্যায়

বয়স অনুযায়ী যোগ-ব্যায়ামের তালিকা

বয়স	যোগ-ব্যায়াম
১। ৬ থেকে ১২ বছর (ছেলে ও মেয়ে)	পদ্মাসন, পদহস্তাসন, অর্ধ-চক্রাসন, অর্ধ-চন্দ্রাসন, চন্দ্রাসন, চক্রাসন, ভুজংগাসন, পূর্ণ-ভুজংগাসন, ধনুরাসন, পূর্ণ-ধনুরাসন, উষ্ট্রাসন, পূর্ণ-উষ্ট্রাসন, মৎস্যাসন, শশঙ্গাসন, অর্ধ-মৎস্যেন্দ্রাসন, অর্ধ-কূর্মাসন, পশ্চিমোত্থানাসন, ভদ্রাসন, ব্যাঘ্রাসন, সঙ্কটাসন, গরুড়াসন, বৃক্ষাসন, বকাসন ও শবাসন (আসন অভ্যাস ১—২ বারের বেশী হবে না)।
২। ১৩ থেকে ২০ বছর (ছেলে ও মেয়ে)	১ নং তালিকা এবং তার সঙ্গে পবন মুক্তাসন, উত্থিত পদাসন, শলভাসন, গোমুখাসন, কর্ণ-পিঠাসন, হলাসন, জানুশিরাসন, বজ্রাসন, সুপ্ত-বজ্রাসন, আকর্ণ-ধনুরাসন, সর্বাংগাসন, বন্ধ-সর্বাংগাসন, পূর্ণবন্ধ সর্বাংগাসন, মকরাসন, পূর্ণ-মকরাসন, ত্রিকোণাসন, চতুষ্কোণাসন, বিভক্ত জানুশিরাসন, দণ্ডায়মান একপদ শিরাসন, সিদ্ধাসন, কুক্কুটাসন, ঌকারাসন, বিপরীতকরণী মুদ্রা, যোগমুদ্রা, উড্ডীয়ান ও নৌলী (মেয়েদের ঋতু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এবং ছেলেদের ১৫।১৬ বছরের পূর্বে উড্ডীয়ান ও নৌলী করা উচিত নয়)।
৩। ২০ থেকে ৩০ বছর (স্ত্রী ও পুরুষ)	১ নং এবং ২ নং তালিকার অনুরূপ ও তার সঙ্গে শীর্ষাসন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কয়েকটি সহজ মুদ্রা, বস্তি ক্রিয়া ও প্রাণায়াম।
৪। ৩০ থেকে ৪০ বছর (স্ত্রী ও পুরুষ)	১, ২ ও ৩ নং তালিকার অনুরূপ—তবে এমন কোন আসন অভ্যাস করা বাঞ্ছনীয় নয় যাতে মেরুদণ্ডের বা দেহের কোন সংযোগস্থলে প্রচণ্ড চাপ পড়ে। যেমন—চক্রাসন, চন্দ্রাসন, পূর্ণ-উষ্ট্রাসন, পূর্ণ-ধনুরাসন, বিভক্ত-জানুশিরাসন, দণ্ডায়মান একপদ শিরাসন ইত্যাদি।
৫। ৪০ বছর এবং তদূর্ধ্ব (স্ত্রী ও পুরুষ)	৬-৮টি সহজ স্বাস্থ্যাসন যেমন—পবন মুক্তাসন, ভুজংগাসন, মৎস্যাসন, সর্বাংগাসন, ধনুরাসন (সহজে যতটুকু হয়), উষ্ট্রাসন (সহজে যতটুকু হয়), হলাসন, জানুশিরাসন ইত্যাদি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মুদ্রা ও প্রাণায়াম। ৫০ বছরের পর থেকে ভ্রমণ প্রাণায়াম বিশেষ উপকারী।

বিঃ দ্রঃ—তালিকানুযায়ী একসঙ্গে এতগুলি যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়—আর সম্ভব হলেও করা উচিত নয়। একই তালিকায় এতগুলি যোগ-ব্যায়াম দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো যোগ-ব্যায়ামে বৈচিত্র্য নিয়ে আসা। একই খাদ্য যত ভালোই হ'ক না ২।৪ দিন পর আর যেমন ভাল লাগে না—তেমনি যোগ-ব্যায়ামেরও ১৫ দিন অন্তর তালিকা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। তবে তালিকা নির্বাচনের সময় মনে রাখতে হবে যেন দেহের সব অংশে প্রচুর রক্ত চলাচল করে আর সর্বাংগাসন, মৎস্যাসন প্রভৃতি কয়েকটি অত্যাবশ্যক আসন বাদ না যায়।

দেহের বিভিন্ন অংশের পেশী, ধমনী, শিরা-উপশিরা, স্নায়ু, গ্রন্থি প্রভৃতি সুস্থ ও সক্রিয় রাখার উপযোগী কয়েকটি নির্দিষ্ট আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়াম।

১। **ললাট ও মস্তকপ্রদেশ**—শীর্ষাসন, সর্বাংগাসন, শশাঙ্গাসন, কর্ণ-পিঠাসন, হলাসন, বিপরীতকরণী মুদ্রা ও সহজ প্রাণায়াম প্রভৃতি।

২। **কণ্ঠপ্রদেশ**—মৎস্যাসন, হলাসন, সর্বাংগাসন, কর্ণ-পিঠাসন, শশাঙ্গাসন ও বিপরীতকরণী মুদ্রা প্রভৃতি।

৩। **কাঁধ**—গোমুখাসন, ধনুরাসন, উষ্ট্রাসন, অর্ধ-চন্দ্রাসন, অর্ধ-চক্রাসন, সর্বাংগাসন, ভুজংগাসন ও আকর্ণ-ধনুরাসন প্রভৃতি।

৪। **বক্ষপ্রদেশ**—ভুজংগাসন, পূর্ণ-ভুজংগাসন, ধনুরাসন, পূর্ণ-ধনুরাসন, উষ্ট্রাসন, পূর্ণ-উষ্ট্রাসন, অর্ধ-চক্রাসন, চক্রাসন, অর্ধ-চন্দ্রাসন, চন্দ্রাসন, মৎস্যাসন ও সহজ প্রাণায়াম প্রভৃতি।

৫। **উদর ও বস্তিপ্রদেশ**—পদ-হস্তাসন, জানুশিরাসন, পশ্চিমোত্থানাসন, পবন-মুক্তাসন, হলাসন, কর্ণ-পিঠাসন, অর্ধ-কূর্মাসন, চক্রাসন, চন্দ্রাসন, উড্ডীয়ান মুদ্রা, যোগমুদ্রা, শক্তিচালনা মুদ্রা, মহামুদ্রা, মহাবন্ধমুদ্রা, নৌলী, অশ্বিনীমুদ্রা, অগ্নিসার ধৌতি ও সহজ প্রাণায়াম প্রভৃতি।

৬। **মেরুদণ্ড**—ভুজংগাসন, ধনুরাসন, পূর্ণ-ধনুরাসন, উষ্ট্রাসন, পূর্ণ-উষ্ট্রাসন, অর্ধ-মৎস্যেন্দ্রাসন, শশাঙ্গাসন, হলাসন, কর্ণ-পিঠাসন, পদ-হস্তাসন, অর্ধ-চক্রাসন, চক্রাসন ও অর্ধ-চন্দ্রাসন, চন্দ্রাসন প্রভৃতি।

৭। **উরুর সংযোগস্থল**—জানুশিরাসন, বিভক্ত-জানুশিরাসন, চতুষ্কোণাসন ও আকর্ণ-ধনুরাসন, মণ্ডুকাসন মার্গাসন, বিভক্ত পশ্চিমোত্থানাসন প্রভৃতি।

৮। **নিতম্ব**—বজ্রাসন, ধনুরাসন, পূর্ণ-ধনুরাসন, উষ্ট্রাসন, পূর্ণ-উষ্ট্রাসন, অর্ধ-চন্দ্রাসন, চন্দ্রাসন, অর্ধ-চক্রাসন, চক্রাসন প্রভৃতি।

৯। **কোমর**—ত্রিকোণাসন, পদ-হস্তাসন, অর্ধ-চক্রাসন, চক্রাসন, অর্ধ-চন্দ্রাসন, চন্দ্রাসন, ধনুরাসন, পূর্ণ-ধনুরাসন, উষ্ট্রাসন, পূর্ণ-উষ্ট্রাসন প্রভৃতি।

১০। **হাত**—ব্যাঘ্রাসন, হস্ত-শীর্ষাসন, বদ্ধ-পদ্মাসন, পূর্ণ-মকরাসন, চতুষ্কোণাসন ও বকাসন প্রভৃতি।

১১। **পা**—বজ্রাসন, পদ্মাসন, বদ্ধ-পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, ভদ্রাসন, পদ-হস্তাসন, অর্ধ-চক্রাসন, চক্রাসন, অর্ধ-চন্দ্রাসন, জানুশিরাসন, চতুষ্কোণাসন, দণ্ডায়মান একপদ শিরাসন, চন্দ্রাসন, বৃক্ষাসন, সঙ্কটাসন প্রভৃতি।

১২। **হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস**—প্রাণায়াম।

পঞ্চম অধ্যায়

খালি হাতে ব্যায়াম

১। প্রণালী—সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়। হাত দু'টি দেহের দু' পাশে লম্বা অবস্থায় উপুড় করে রাখ, এবার মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত মেঝেতে রেখে, শ্বাস নিতে নিতে, পা দু'টি জোড়া অবস্থায় সোজা উপরে তোল এবং ঠিক ৯০° ডিগ্রীতে আসবে। শ্বাস বন্ধ রেখে তলপেট মেরুদণ্ডের দিকে টেনে রাখ। কয়েক সেকেন্ড ঐ অবস্থায় রেখে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পা জোড়া অবস্থায় মেঝেতে নামিয়ে রাখ। ছবি দেখ। ব্যায়ামটি ৮ থেকে ১০ বার অভ্যাস কর।
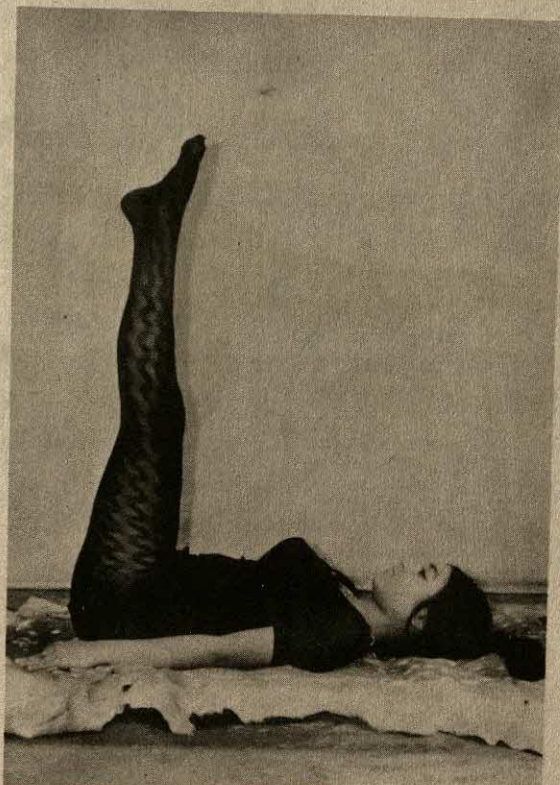
প্রণালী—১

উপকার—ব্যায়ামটিতে হৃদযন্ত্র, পেট, বস্তিপ্রদেশ, উরুর সন্ধিস্থল ও পায়ের খুব ভাল কাজ হয়।

২। প্রণালী—উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। এবার বাঁদিকে ঘুরে মাথা উচু কর এবং হাত দু'টি বাঁদিকে মেঝের উপর রাখ। হাতের তালু মেঝের সঙ্গে লেগে থাকবে। এবার ডান-পা যতটা সম্ভব হাতের দিকে নিয়ে এস। ২।৪ দিন অভ্যাসের পর ডান-পা ডান-হাতের সঙ্গে লাগবে। বাঁ-পায়ের পাতার উপর দিকটা

প্রণালী—২

মেঝের সঙ্গে লেগে থাকবে। ছবি দেখ। বেশ কয়েক সেকেন্ড থাকবে, তারপর ডানদিকে ঘুরে বাঁ-পায়ে কর। ৮ থেকে ১০ বার অভ্যাস কর।

উপকার—প্রক্রিয়াটিতে বিশেষ করে পা ও উরুর সন্ধিস্থলের খুব ভাল কাজ হয়।

৩। প্রণালী—২ নং-এর অনুরূপ—শুধু পা হাতের দিকে টেনে না এনে উপরে তুলতে হবে। ছবি দেখ।

প্রণালী—৩

উপকার—প্রক্রিয়াটিতে পা, উরুর সন্ধিস্থল, বস্তিপ্রদেশ ও কোমরের খুব ভাল ব্যায়াম হয়।

৪। প্রণালী—উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। হাতের তালু উপুড় করে লম্বাভাবে শরীরের দু' পাশে রাখ। মাথা উচু কর এবং ডানদিকে তাকাও। এবার ডান-পা উচু করে পাছার উপর নিয়ে এসে ডান হাত দিয়ে পায়ের পাতা ধর এবং নিচের দিকে টেনে নিয়ে এস। ছবি দেখ। হাঁটু পর্যন্ত ডান-পা মেঝের সঙ্গে

প্রণালী—৪

লেগে থাকবে। বেশ কয়েক সেকেন্ড ঐ অবস্থায় থাক, এবার আস্তে আস্তে ডান-পা মেঝেতে নিয়ে এসে একইভাবে বাঁ-পায়ে কর। ৮ থেকে ১০ বার ব্যায়ামটি অভ্যাস কর।

উপকার—ব্যায়ামটিতে ঘাড়, কাঁধ, বুক, হাত, পা ও নিতম্বের খুব ভাল কাজ হয়।

৫। প্রণালী—৪ নং-এর অনুরূপ—শুধু পা হাঁটু থেকে না তুলে কোমর থেকে তুলতে হবে। ছবি দেখ।

প্রণালী—৫

উপকার—প্রক্রিয়াটিতে হাত, পা, ঘাড়, কাঁধ, বুক, পিঠ, মেরুদণ্ড, মেরুদণ্ডের দু' পাশের পেশী ও স্নায়ুজাল, কোমর, বস্তিপ্রদেশ, নিতম্ব ও উরুর সন্ধি-স্থলের খুব ভাল কাজ হয়।

৬। প্রণালী—মেঝেতে পা ছড়িয়ে বস, পায়ের পাতা ও হাঁটু জোড়া থাকবে। হাতের তালু উপুড় করে পিছনে মেঝেতে রাখ। এবার পায়ের পাতার নিচের দিকটা মেঝের সঙ্গে রেখে পিছন দিকে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে এস এবং সোজা কর। এইভাবে ৫ মিঃ ব্যায়ামটি অভ্যাস কর।

প্রণালী—৬

উপকার—প্রক্রিয়াটিতে পায়ের পেশী, স্নায়ুজাল, সন্ধিস্থল ও বস্তিপ্রদেশের খুব ভাল ব্যায়াম হয়। পা সুগঠিত হয়।

৭। প্রণালী—হাঁটু ভেঙ্গে গোড়ালিতে পাছা রেখে বস। পায়ের পাতার উপর দিকটা মেঝের সঙ্গে লেগে থাকবে। এবার হাতের তালু উপুড় করে হাঁটুর দু' পাশে রাখ। এখন ডান-পা পিছন দিকে ছড়িয়ে দাও। ডান-পায়ের পাতার উপর দিকটা মেঝের সঙ্গে লেগে থাকবে। সামনের দিকে তাকাও।
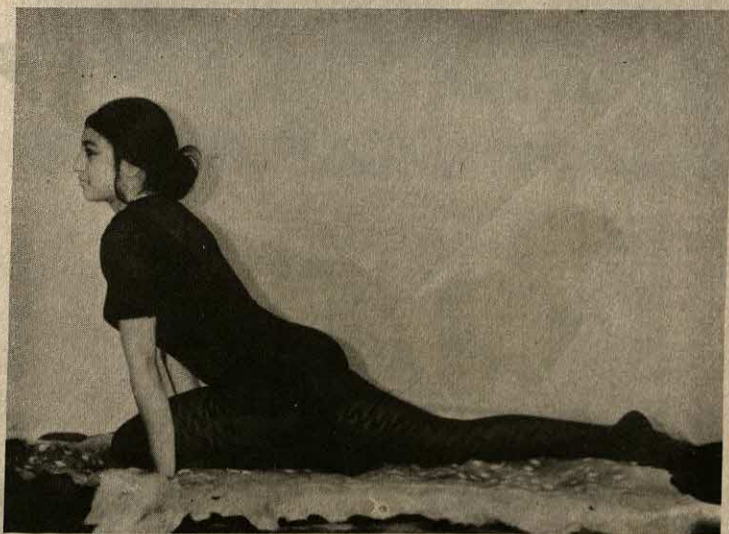
প্রণালী—৭

ছবি দেখ। এবার বাঁ-পা ছড়িয়ে ডান-পা পূর্বাবস্থায় নিয়ে এস। দু'পা মিলিয়ে ১ মিঃ প্রক্রিয়াটি অভ্যাস কর।

উপকার—প্রক্রিয়াটিতে ঘাড়, কাঁধ, বুক, পিঠ, কোমর, বস্তিপ্রদেশ ও নিতম্বের খুব ভাল কাজ হয়—বিশেষ করে হাত ও পায়ের প্রচণ্ড শক্তি বৃদ্ধি করে এবং সুগঠিত করে।

৮ প্রণালী—হাঁটু গেড়ে বস, হাতের তালু উপুড় করে হাঁটুর সামনে রাখ। পায়ের পাতার উপর দিকটা এবং হাঁটু পর্যন্ত মেঝের সঙ্গে লেগে থাকবে। এবার হাত ও ডান হাঁটুর উপর ভর করে বাঁ-পা সোজা রেখে উপরে তোল। ছবি দেখ। ঐ একইভাবে ডান-পা কর। ৮ থেকে ১০ বার অভ্যাস কর।

প্রণালী—৮

উপকার—প্রক্রিয়াটিতে ঘাড়, কাঁধ, বুক, পিঠ, মেরুদণ্ড, কোমর, বস্তিপ্রদেশ, নিতম্ব, উরুর সন্ধিস্থল, হাত ও পায়ের খুব ভাল ব্যায়াম হয়—বিশেষ করে হাত ও পায়ের প্রচণ্ড শক্তি বৃদ্ধি করে এবং সুগঠিত করে।

৯। প্রণালী—সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়। পা দু'টি জোড়া থাকবে। হাত দু'টি বুকের সমান্তরালে উচু করে রাখ। এবার গোড়ালি থেকে কোমর পর্যন্ত মেঝেতে রেখে, মেরুদণ্ডের উপর জোর দিয়ে এবং কোমরের উপর ভর দিয়ে, শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে, দেহের উপরাংশ উচু করে মাথা হাঁটুর উপর নিয়ে এস। ক ও
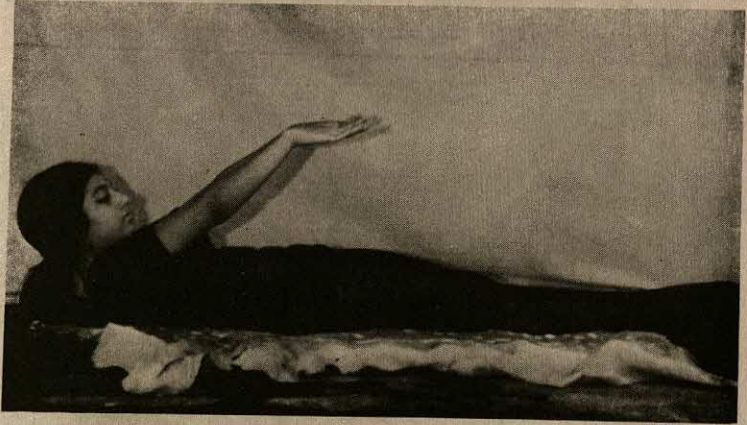
প্রণালী—৯(ক)

খ ছবি দেখ। ২।৪ দিন অভ্যাসের পর হাতের আঙ্গুল পায়ের আঙ্গুল স্পর্শ করবে—এমনিই এসে যাবে। কঠিন কাজ হলো শুধু কোমরের উপর ভর রেখে

প্রণালী—৯(খ)

মেঝে থেকে ওঠা। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করে বেশ কয়েক সেকেন্ড ঐ অবস্থায় থাক তারপর শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আস্তে আস্তে মেঝেতে শুয়ে পড়। প্রক্রিয়াটি ৮ থেকে ১০ বার অভ্যাস কর॥

উপকার—প্রক্রিয়াটিতে ঘাড়, কাঁধ, পিঠ, পেট, বস্তিপ্রদেশ ও কোমরের—বিশেষ করে কোমর ও বস্তিপ্রদেশের খুব ভাল ব্যায়াম হয়। কোমরে প্রচণ্ড শক্তি আসে।

১০। প্রণালী—আরো দু'টি কোমর ও পিঠের ব্যায়াম। যতদূর সম্ভব পা দু'টি ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়াও। এখন গোড়ালি থেকে কোমর পর্যন্ত সোজা
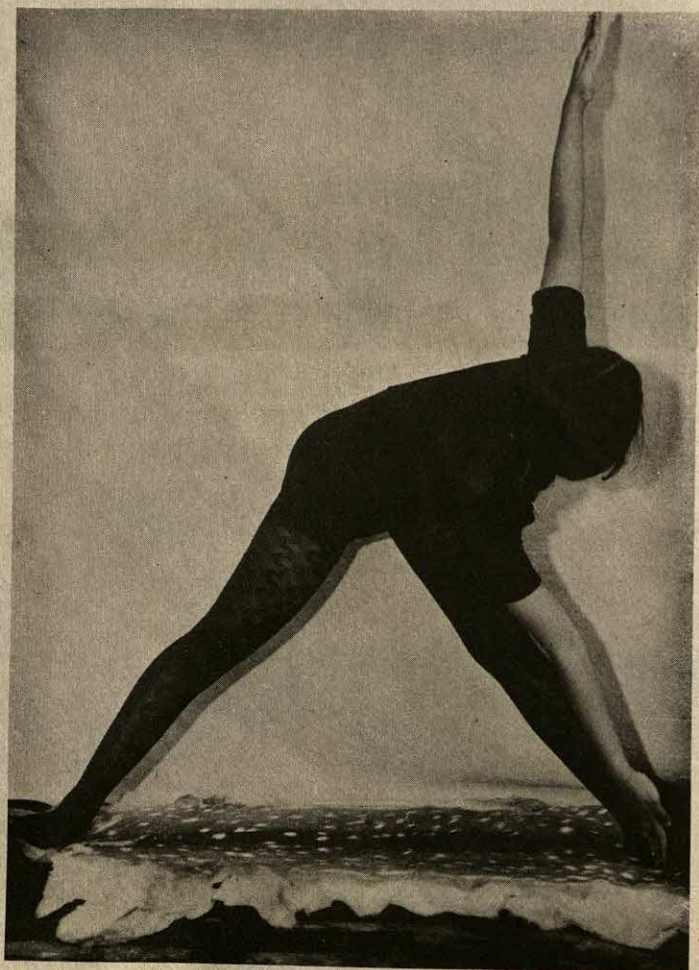
প্রণালী—১০(ক) (পিছন থেকে)

রেখে, হাত দু'টি কাঁধের সমান্তরালে এনে, ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে বাঁ-পায়ের পাতা স্পর্শ কর এবং বাঁ হাত উপরে তোল এবং সেইদিকে তাকাও।

যে হাত উপরে উঠবে সেইদিকে তাকাতে হবে এবং পিঠটা সামনে ও অপর-দিকে মোচড় দিতে হবে। ছবি দেখ (পিছন দিক থেকে)। ডানদিক বাঁদিক করে ১০ বার অভ্যাস কর। প্রক্রিয়াটি গতিতে হবে।প্রণালী(খ)-এ ডানহাত ডানপায়ের পাতা ও বাঁহাত বাঁপায়ের পাতা স্পর্শ করবে।

প্রণালী—১০(খ) (সামনে থেকে)

উপকার—প্রক্রিয়াটিতে ঘাড়, কাঁধ, বুক, পেট, পিঠ, মেরুদণ্ড ও কোমরের খুব ভাল কাজ হয়—বিশেষ করে কোমরের মেদ কমাতে প্রক্রিয়াটি অদ্বিতীয়।

১১। প্রণালী—২ই ফুট মত পা ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়াও। হাত দু'টি নমস্কারের ভঙ্গিমায় রেখে মাথার উপর তোল। হাত কাণের সঙ্গে লেগে
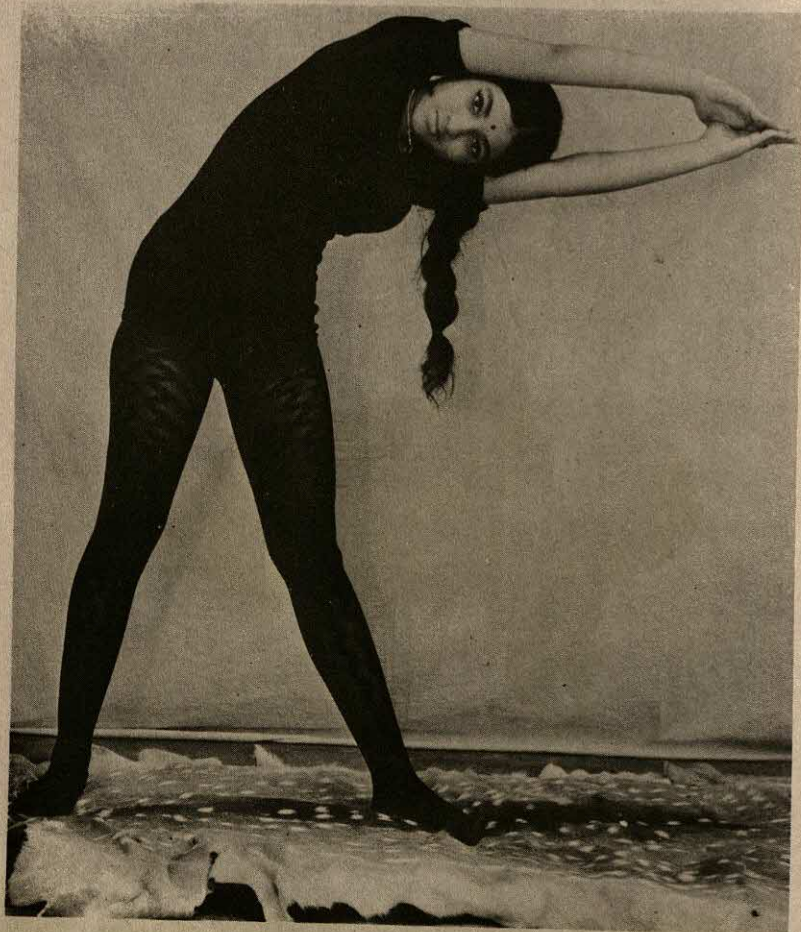
প্রণালী—১১(ক)

থাকবে। এবার গোড়ালি থেকে কোমর পর্যন্ত সোজা রেখে দেহের উপরাংশ ডানদিকে ও বাঁদিকে বাঁকাতে হবে। ক ও খ ছবি দেখ।

উপকার—ব্যায়ামটিতে তলপেট বস্তিপ্রদেশের অতিরিক্ত মেদ কমাতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

প্রণালী—১১(খ)
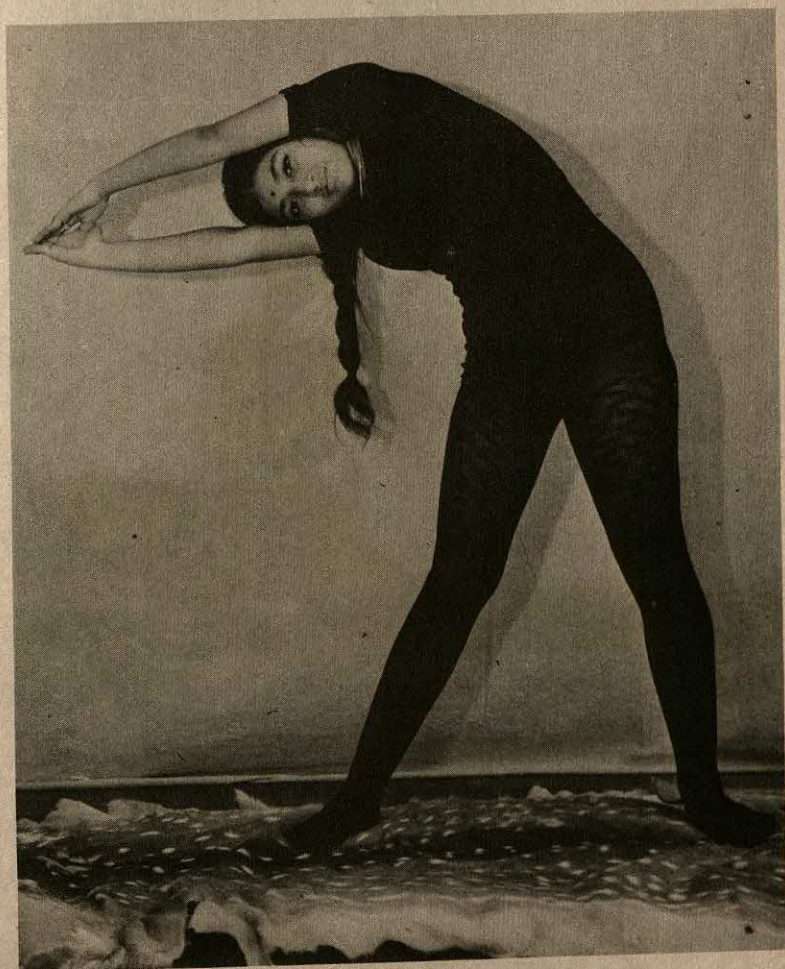
১২। প্রণালী—উবু হয়ে বস। পাছা মাটিতে লাগবে না। হাত দু'টি মাথার উপর যে কোন ভাবে রাখ। এবার বাঁ-পা বাঁদিকে ছড়িয়ে দাও। পায়ের উপর দিকটা মেঝের সঙ্গে লেগে থাকবে। এখন মেরুদন্ড মোচড় দিয়ে বাঁদিকে ঝুঁকে পড়। ছবি দেখ। বেশ কয়েক সেকেন্ড ঐ অবস্থায় থেকে বাঁ-পা পূর্বাবস্থায় এনে ডান পায়ে কর। ৮ থেকে ১০ বার প্রক্রিয়াটি অভ্যাস কর।
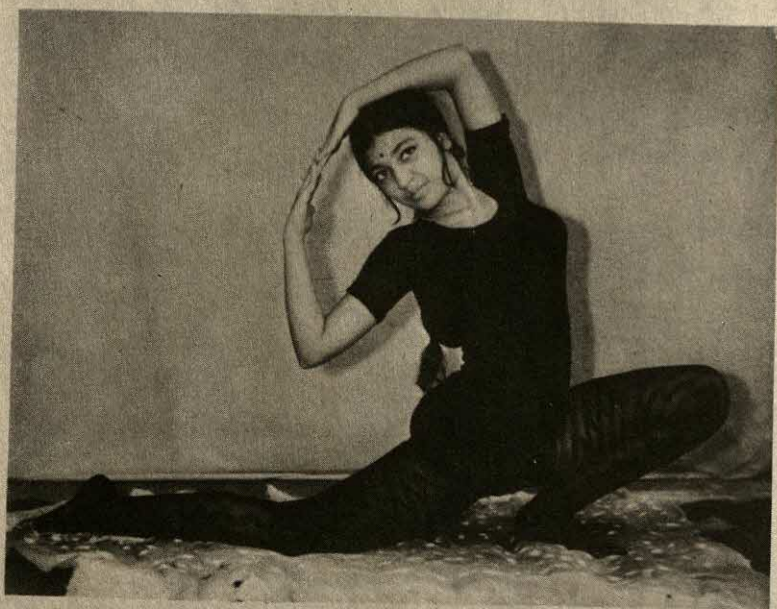
প্রণালী—১২

উপকার—প্রক্রিয়াটিতে ঘাড়, কাঁধ, বুক, পেট, পিঠ, বস্তিপ্রদেশ, নিতম্ব, কোমর, মেরুদন্ড এবং মেরুদন্ডের দু'পাশের পেশী ও স্নায়ুজালের চমৎকার ব্যায়াম হয়। তাছাড়া উরু সন্ধিস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে।

১৩। প্রণালী—কোমরে হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াও। পায়ের পাতা দু'টির মাঝে ১ ফুট মত ফাঁক থাকবে। এবার গোড়ালি থেকে কোমর পর্যন্ত সোজা রেখে দেহের উপরাংশ একবার ডানদিকে একবার বাঁদিকে মোচড় দাও। যেদিকে মোচড় দেবে সেইদিকে মুখ ঘুরাতে হবে। ছবি দেখ। ১০ থেকে ১২ বার প্রক্রিয়াটি অভ্যাস কর।

প্রণালী—১৩

উপকার—মেরুদণ্ড সহজ ও সরল রাখতে প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবে সাহায্য করে—তাছাড়া, ঘাড়, কাঁধ, বুক, পেট, কোমর ও পিঠের দু' পাশের পেশী ও স্নায়ুজালেরও খুব ভাল ব্যায়াম হয়।

১৪। প্রণালী—পায়ের পাতা একটু ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়াও। এখন বাঁ-হাত কনুয়ের কাছ থেকে ভেঙে বুড়ো আঙুল হাতের সংযোগ-স্থলে রাখ এবং ডান হাত ডানদিকে মেলে কাঁধ বরাবর থেকে একটু উপরে রাখ—কাঁধের সমান্তরালও রাখা যেতে পারে। তবে একটু উচু করে রাখলে হাতের নিচের দিকটায় বেশ টান পড়ে। এবার ঘাড়-সোজা রেখে ডান হাতের আঙুলের

প্রণালী—১৪

দিকে তাকাও। ছবি দেখ। একইভাবে বাঁ-হাত মেলে বাঁদিকে তাকাও। প্রক্রিয়াটি ১০ থেকে ১২ বার অভ্যাস কর। শ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘ ও গভীর থাকবে।

উপকার—প্রক্রিয়াটিতে ঘাড়, কাঁধ, বুক, হাত ও ফুসফুসের খুব ভাল কাজ হয় এবং হাত সুগঠিত হয়।

১৫। প্রণালী—সোজা হয়ে দাঁড়াও, হাত দু'টি মেলে দু'দিকে কাঁধ বরাবর তোল। হাতের তালু উপর দিকে থাকবে। এবার গোড়ালি থেকে কোমর পর্যন্ত সোজা রেখে, শিরদাঁড়া মোচড় দিয়ে পিছন দিকে যতদূর সম্ভব বেঁকে যাও এবং বাঁ হাতের আঙ্গুলের দিকে তাকাও। যেদিকে মোচড় দেবে সেই হাতের আঙ্গুলের দিকে তাকাতে হবে। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে

প্রণালী—১৫

বেশ কয়েক সেকেন্ড ঐভাবে থাক তারপর আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়াও। হাত নিচু কর। এবার একইভাবে ডানদিকে মোচড় দাও। ৮ থেকে ১০ বার প্রক্রিয়াটি অভ্যাস কর।

উপকার—প্রক্রিয়াটিতে ঘাড়, কাঁধ, বুক, পেট, বস্তিপ্রদেশ, কোমর, নিতম্ব, মেরুদণ্ড এবং পেট ও পিঠের দু' পাশের পেশী ও স্নায়ুজালের খুব ভাল ব্যায়াম হয়। কোমরের অপ্রয়োজনীয় মেদ কমাতে প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবে সাহায্য করে।

১৬। প্রণালী—পায়ের পাতা দু'টি জোড়া রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াও। এবার গোড়ালি থেকে কোমর পর্যন্ত যতটা সম্ভব সোজা রেখে, দেহের উপরাংশ শ্বাস ছাড়তে

প্রণালী—১৬(ক)

ছাড়তে মাথা নিচু করে থুতনি হাঁটুতে লাগাও এবং দু' হাতের তালু পায়ের গোছার পিছনে রাখ। ক ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করে কয়েক

সেকেন্ড ঐ অবস্থায় থাক তারপর শ্বাস নিতে নিতে সোজা হয়ে দাঁড়াও। ৬ থেকে ৮ বার অভ্যাস কর। প্রথম ২।৩ দিন হাঁটু একটু ভেঙ্গে যাবে তারপর ঠিক হয়ে যাবে। খ ছবি দেখ।
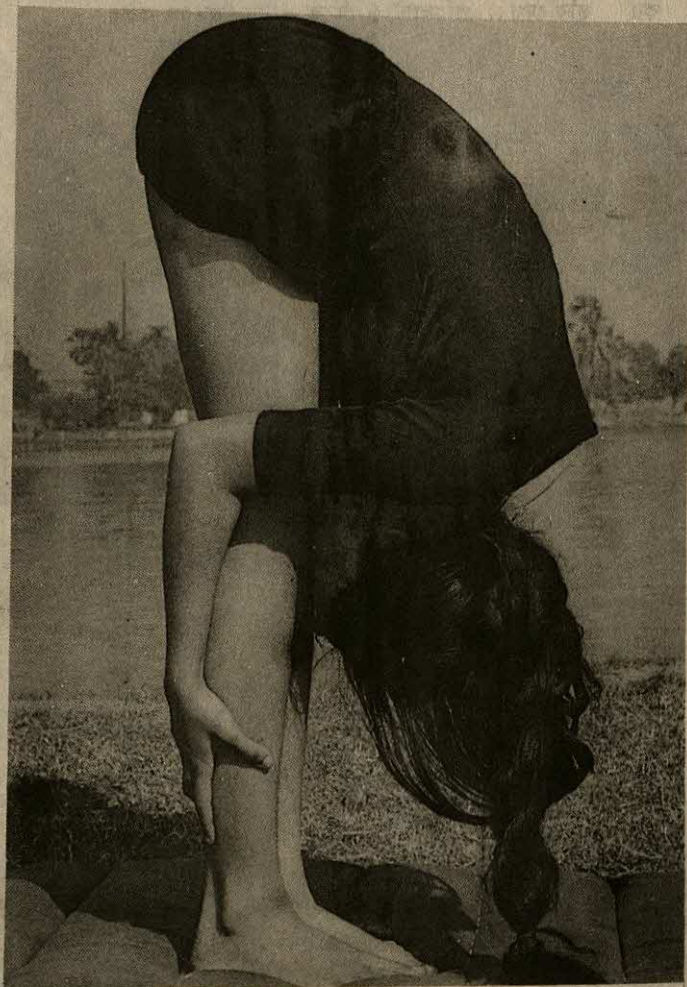
প্রণালী—১৬(খ)

উপকার—প্রক্রিয়াটিতে হাত, পা, কাঁধ, ঘাড়, বুক, পেট, পিঠ, নিতম্ব ও কোমরের খুব ভাল ব্যায়াম হয়। কোমর ও তলপেটের মেদ কমাতে প্রক্রিয়াটি বিশেষ-ভাবে সাহায্য করে।

১৭। প্রণালী—পা দু'টি জোড়া রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াও। হাত দু'টি নমস্কারের ভঙ্গিমায় রেখে মাথার উপর তোল। এবার গোড়ালি থেকে কোমর পর্যন্ত সোজা রেখে শ্বাস নিতে নিতে দেহের উপরাংশ পিছন দিকে যতটা সম্ভব বেঁকিয়ে নিয়ে যাও। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করে বেশ কয়েক সেকেন্ড ঐ অবস্থায় থাক, তারপর শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং হাত নিচু কর। ছবি দেখ। প্রক্রিয়াটি ৬ থেকে ৮ বার অভ্যাস কর।

প্রণালী—১৭

উপকার—১৬ নং-এর অনুরূপ। অধিকন্তু বুক, পিঠ, পেট, বস্তিপ্রদেশ, নিতম্ব, মেরুদন্ড ও কোমরে প্রচন্ড চাপ থাকায় ঐ অঞ্চলে খুব ভাল ব্যায়াম হয়।

১৮। প্রণালী—পা জোড়া করে, কোমরে হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াও। এবার গোড়ালি থেকে কোমর পর্যন্ত সোজা রেখে, শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে যতদূর
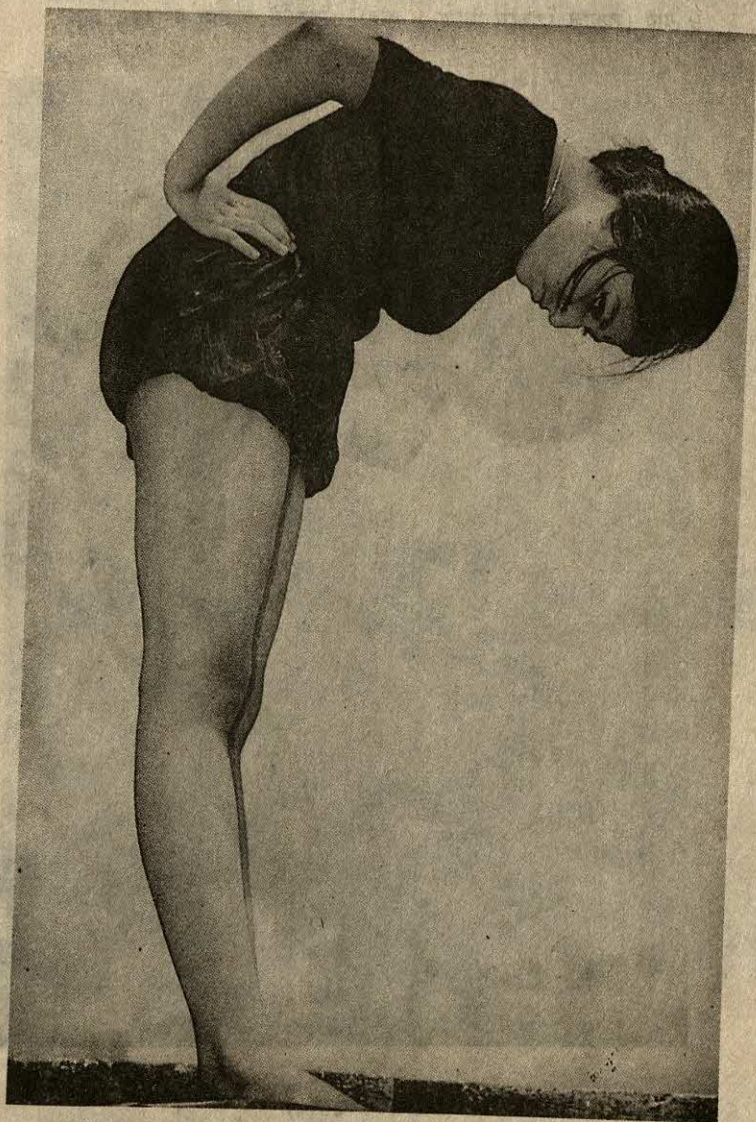
প্রণালী—১৮(ক)

সম্ভব সামনের দিকে ঝুঁকে পড়। 'ক' ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করে বেশ কয়েক সেকেন্ড ঐ অবস্থায় থাক এবং তারপর শ্বাস নিতে নিতে

সোজা হয়ে দাঁড়াও। এবার শ্বাস নিতে নিতে যতদূর সম্ভব পিছন দিকে বেঁকে যাও। 'খ' ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করে বেশ কয়েক সেকেন্ড ঐ অবস্থায় থাক, তারপর শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সোজা হয়ে দাঁড়াও। ৬ থেকে ৮ বার (সামনে পিছনে মিলে ১ বার) প্রক্রিয়াটি অভ্যাস কর।

প্রণালী—১৮(খ)

উপকার—প্রক্রিয়াটিতে দেহের সব জায়গায় কাজ হয়—বিশেষ করে ঘাড়, কাঁধ, বুক, পেট, পিঠ, বস্তিপ্রদেশ, নিতম্ব, কোমর, মেরুদণ্ড এবং মেরুদণ্ডের দু' পাশের পেশী ও স্নায়ুজালের খুব ভাল কাজ হয়।

১৯। প্রণালী– উবু হয়ে গোড়ালির উপর বস, হাত দু'টি নমস্কারের ভঙ্গিমায় মাথার উপর তোল—হাত কানের সঙ্গে লেগে থাকবে। এবার বাঁ-পা জায়গায় রেখে ডান- পা পিছন দিকে ছড়িয়ে দাও —পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত পায়ের উপর দিকটা মেঝের সঙ্গে লেগে থাকবে। এখন শ্বাস নিতে নিতে মাথা পিছন দিকে বাঁকিয়ে নিয়ে যাও। 'ক' ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করে বেশ কয়েক সেকেন্ড ঐ অবস্থায় থাক, তারপর শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সোজা হয়ে ডান- পা পূর্বাবস্থায় নিয়ে এস। একইভাবে বাঁ-পায়ে অভ্যাস কর। ৪ বার কর। 'খ' ছবি দেখ। উরু পর্যন্ত মেঝেতে লেগে থাকবে এবং পিছন দিকে মাথা আরো নিচু হবে।
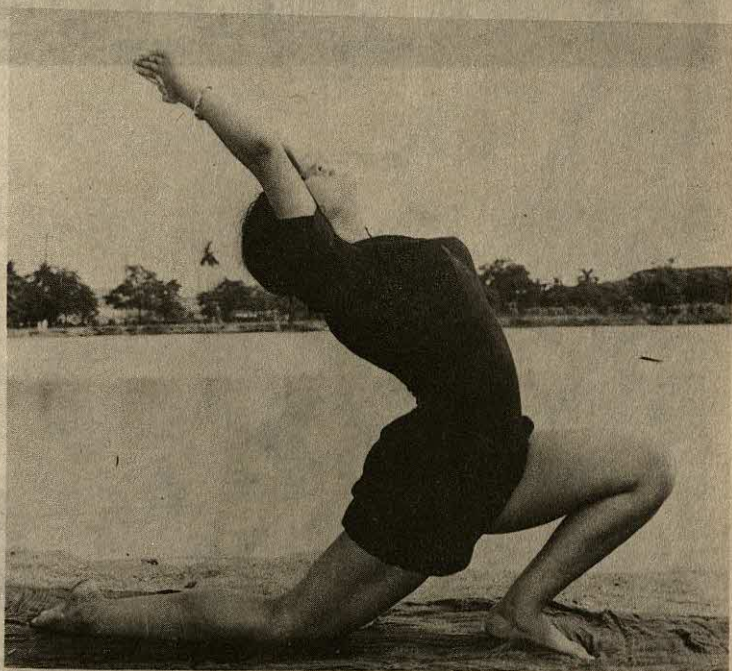
প্রণালী—১৯(ক)

হাত দু'টি নমস্কারের ভঙ্গিমায় রাখতে হবে না—ডান পা হাঁটু থেকে ভেঙ্গে, পিঠের দিকে এনে, দু' হাত দিয়ে দু' পায়ের আঙ্গুল ধরে টেনে এনে পায়ের পাতার দিকটা মাথার ব্রহ্মতালুর উপর রাখ। 'গ' ছবি দেখ।
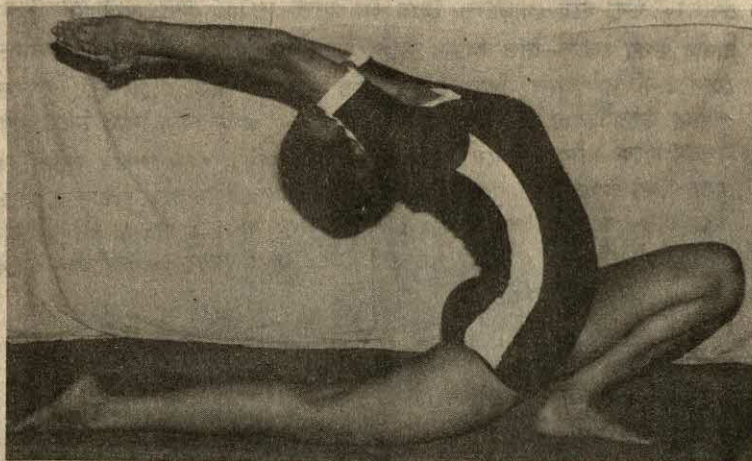
প্রণালী—১৯(খ)

প্রণালী—১৯(গ)

উপকার—ব্যায়ামটিতে দেহের সব অংশের খুব ভাল কাজ হয়—ঊরুর সন্ধি-স্থলের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে।

২০। প্রণালী-সোজা হয়ে দাঁড়াও। এবার ডান-পা জায়গায় রেখে বাঁ-পা সোজা অবস্থায় উঁচু করে বাঁ-হাত দিয়ে গোড়ালি ধর। ছবি দেখ। হাত-পা বদল করে ব্যায়ামটি ৪ বার কর।
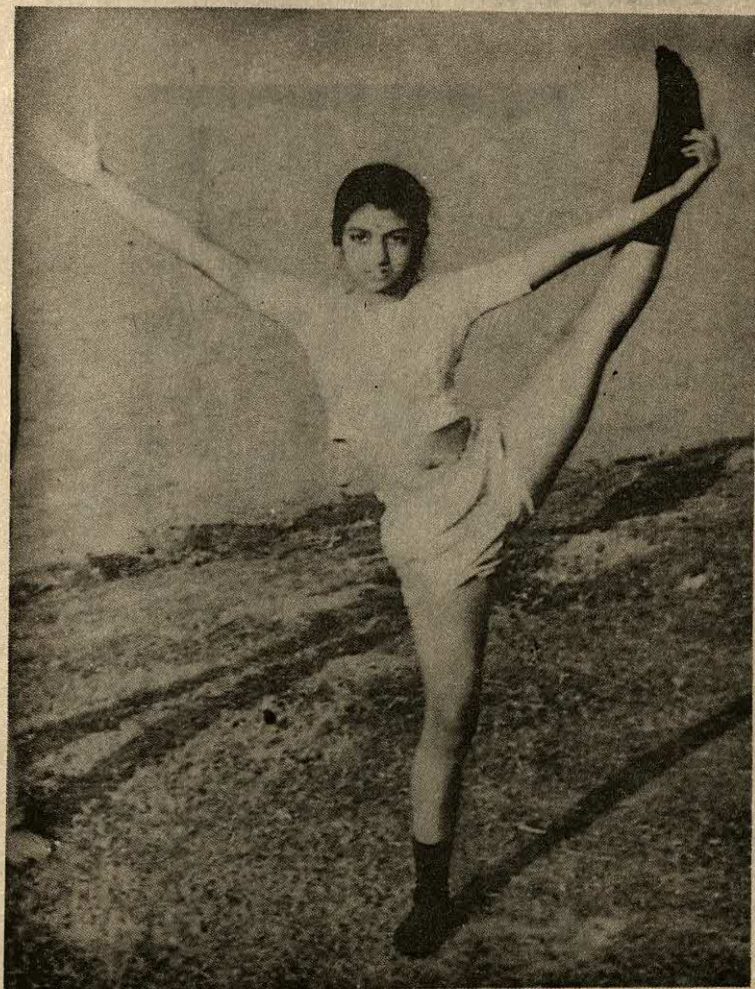
প্রণালী—২০

উপকার—ব্যায়ামটি ঊরুর সন্ধিস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে ও পায়ের গঠন সুন্দর এবং সুদৃঢ় করে।

২১। প্রণালী—সোজা হয়ে দাঁড়াও। এবার শ্বাস নিতে নিতে পিছনে বেঁকে অর্ধ-চক্রাসনের ভঙ্গিমায় এস অথবা চিৎ হয়ে শুয়ে, হাতের তালু উপুড় করে মেঝেতে রেখে, দেহের মধ্যাংশ উচু করে অর্ধ-চক্রাসনের ভঙ্গিমায় এস। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক কর। এবার এক পা সোজা উপরে তুলে দাও। বেশ কয়েক সেকেন্ড ঐ অবস্থায় থাক, তারপর পা নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও। পা বদল করে ব্যায়ামটি ৪ বার কর।

প্রণালী—২১

উপকার—ব্যায়ামটিতে দেহের সব অংশে কাজ হয়। হাত ও পায়ে প্রচন্ড শক্তি আসে।

দেহের সহনশীলতা, কোমনীয়তা ও সন্ধিস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করতে কয়েকটি বিশেষ ব্যায়াম

১। প্রণালী—সোজা হয়ে দাঁড়াও। হাত দু'টি কাঁধ বরাবর তুলে, তালু নিচের দিকে রেখে দু' দিকে মেলে দাও। এবার গোড়ালি থেকে কোমর পর্যন্ত সোজা রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে পড় এবং এক পা সোজা রেখে উপরে তুলে
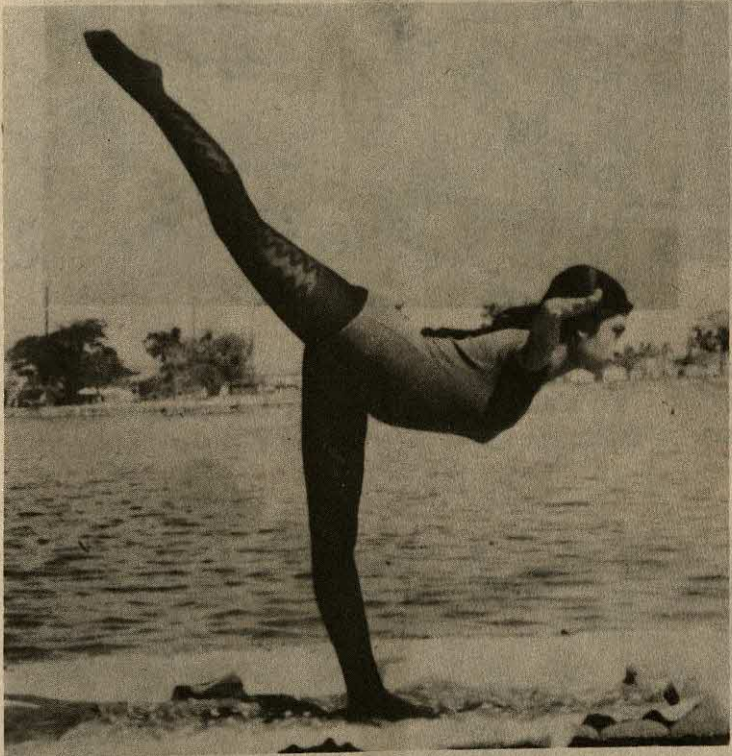
প্রণালী—১(ক)

দাও, সামনের দিকে তাকাও। ক ও খ ছবি দেখ। 'গ' ক-এর অনুরূপ তবে এক হাত সামনে মেলে ধরে সেইদিকে তাকাতে হবে। হাত-পা বদল করে ভঙ্গিমা তিনটি ২ বার করে অভ্যাস কর।

প্রণালী—১(খ)

প্রণালী—১(গ)

২ প্রণালী—মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়, মাথা উচু কর। এবার মেঝেতে এক পা সোজা রেখে অপর পা হাঁটু থেকে ভেঙ্গে, পিঠের উপর নিয়ে এসে, দু' হাত দিয়ে পায়ের পাতা শক্ত করে ধরে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে এসে পায়ের

প্রণালী—২(ক)

পাতার ঠিক উপর দিকটা গলায় আটকিয়ে দাও—ঝাঁকুনি না লাগে। এখন হাতের তালু উপুড় অবস্থায় দু'দিকে মেলে দাও। ক ও খ ছবি দেখ। সামনের দিকে তাকাও এবং বেশ কয়েক সেকেন্ড ঐ অবস্থায় থাক তারপর দু' হাত

প্রণালী—২(খ)

দিয়ে পায়ের গোছা শক্ত করে ধরে, গলা থেকে খুলে পিছনে নিয়ে আস্তে আস্তে ছেড়ে দাও এবং পা পূর্বাবস্থায় নিয়ে এস। একইভাবে অন্য পায়ে অভ্যাস কর। ৪ থেকে ৬ বার কর।

৩। কোমরে হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াও। ক ছবি দেখ। এবার দু' পায়ের পাতা মেঝেতে ঘষতে ঘষতে দুদিকে নিয়ে যাও এবং মেঝেতে বসে পড়—হাত দু'টি কাঁধের সমান্তরালভাবে বা যে কোন ভাবে রাখতে পার। খ ও গ ছবি দেখ।

প্রণালী—৩(ক)

ঐ অবস্থায় বেশ কয়েক সেকেন্ড থাক তারপর দু' হাতের তালু উপুড় করে মেঝেতে রেখে তার উপর ভর দিয়ে, দু'পা সামনে এনে সোজা হয়ে দাঁড়াও। দু'দিকে ঘুরে ব্যায়ামটি ৪ বার অভ্যাস কর।

প্রণালী—৩(খ)

প্রণালী—৩(গ)
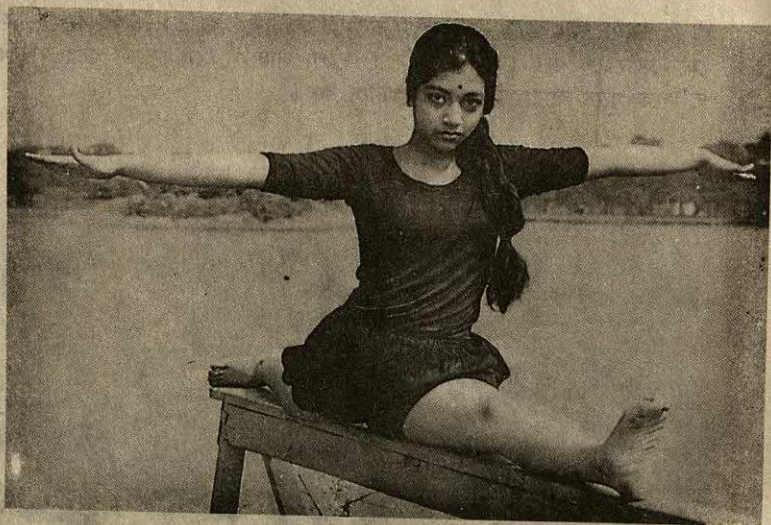
প্রণালী—৩(ঘ)

ঘ ছবি দেখ। প্রণালী গ-এর অনুরূপ—সরু বেঞ্চের উপর অভ্যাস করলে মনের জোর আরো বাড়বে।

৪। প্রণালী—৩ নং গ-এর অনুরূপ। তারপর হাত দু'টি নমস্কারের ভঙ্গিমায় মাথার উপর তোল। ক ছবি দেখ। এবার দেহের উপরাংশ পিছন দিকে

প্রণালী—৪(ক)

বাঁকিয়ে দু' হাত দিয়ে পায়ের গোড়ালির ঠিক উপরে ধর—মাথার পিছন দিকটা পায়ের সঙ্গে লেগে থাকবে। খ ছবি দেখ। কয়েক সেকেণ্ড ঐ অবস্থায় থাক তারপর পা ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বস। দু'দিকে ৪ বার ব্যায়ামটি অভ্যাস কর।

প্রণালী—৪(খ)
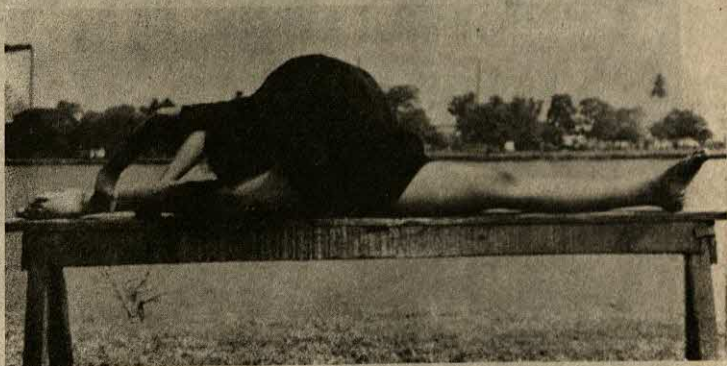
প্রণালী—৪(গ)

গ ছবি দেখ। প্রণালী খ ছবির অনুরূপ তবে সরু বেঞ্চের উপরে অভ্যাস করলে মনোবল আরো বৃদ্ধি পাবে।

৫। প্রণালী সোজা হয়ে দাঁড়াও। এবার এক পা পিছনের দিকে উপরে তোল এবং দু' হাত পিছনে নিয়ে পায়ের গোছা ধরে, টেনে এনে, পায়ের পাতার উপর দিকটা গলায় আটকিয়ে দাও। ক ছবি দেখ। ঝাঁকুনি বা জোর না লাগে প্রথমে হয়তো অসুবিধা হবে—দু'চার দিনে ঠিক হয়ে যাবে। হাত দু'টি
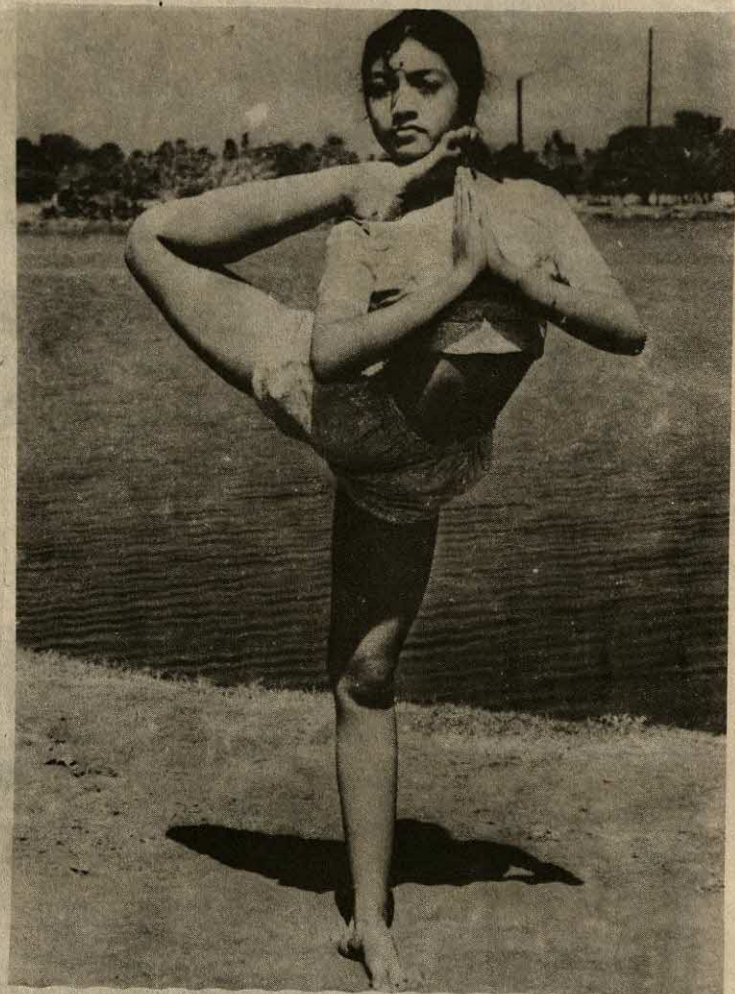
প্রণালী—৫(ক)

নমস্কারের ভঙ্গিমায় বুকের উপর অথবা দু'দিকে কাঁধের সমান্তরালভাবে রাখা যেতে পারে। বেশ কয়েক সেকেন্ড ঐ অবস্থায় থাক তারপর দু' হাত দিয়ে পায়ের গোছা ধরে গলা থেকে খুলে দাও এবং সোজা হয়ে দাঁড়াও। দু' পায়ে ৪ বার ব্যায়ামটি অভ্যাস কর।

ঐ একই ব্যায়াম খ ছবিতে সরু বেঞ্চের উপর দেখ।

প্রণালী—৫(খ)

৬। প্রণালী—সোজা হয়ে দাঁড়াও। এবার শ্বাস নিতে নিতে শরীরের উপরাংশ পিছন দিকে বেঁকিয়ে, নীচু হয়ে দু' হাত দিয়ে ডান পায়ের গোড়ালির ঠিক উপরে ধর। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক কর। কনুই দু'টি মেঝেতে রাখ। এবার বাঁ-পা সোজা উপরে তুলে দাও—হাঁটু ভাঙ্গবে না। মাথা উঁচু করে সামনের দিকে তাকাও। ছবি দেখ। বেশ কয়েক সেকেন্ড ঐ অবস্থায় থাক তারপর বাঁ-পা মেঝেতে নামিয়ে, পায়ের উপর ভর দিয়ে হাতের সাহায্যে

প্রণালী—৬

মেঝেতে একটু ঠেলা দিয়ে, শ্বাস নিতে নিতে সোজা হয়ে দাঁড়াও। পা বদল করে প্রক্রিয়াটি ৪ বার অভ্যাস কর।

৭। প্রণালী—সোজা হয়ে দাঁড়াও। এবার গোড়ালি থেকে কোমর পর্যন্ত সোজা রেখে, শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দেহের উপরাংশ নিচু করে, দু' হাত দিয়ে এক পায়ের গোড়ালি ধর অথবা হাতের তালু মেঝেতে রাখ এবং অপর পা সোজা
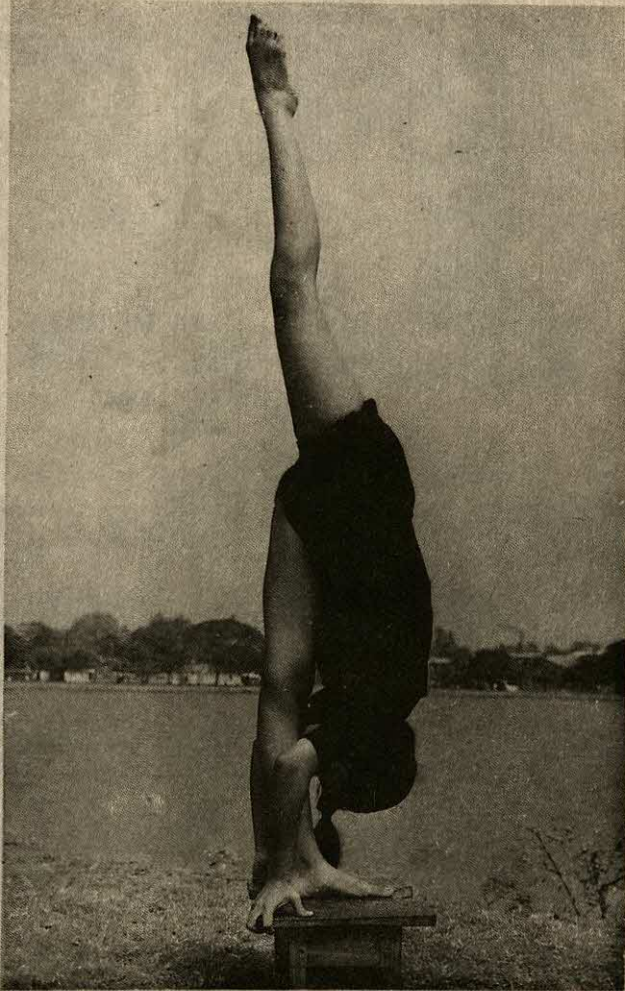
প্রণালী—৭

রেখে উপরে তোল। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক কর—অভ্যাস হয়ে গেলে ছোট টুলের উপর করবে। ছবি দেখ। বেশ কয়েক সেকেন্ড ঐ অবস্থায় থাক তারপর শ্বাস নিতে নিতে বাঁ-পা নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও। পা বদল করে প্রক্রিয়াটি ৪ বার অভ্যাস কর।

৮। প্রণালী—সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং হাত দু'টি বুকের উপর ভাঁজকরে দু' হাত দিয়ে দু' কনুই ধর। ক ছবি দেখ। এবার শ্বাস নিতে নিতে দেহের উপরাংশ পিছন দিকে বেঁকিয়ে, মাথা নিচু করে ব্রহ্মতালু গোড়ালির কাছে মেঝেতে রাখ

প্রণালী—৮(ক)

(সুবিধা মত ফাঁক করে মেঝেতে রাখবে)। খ ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করে বেশ কয়েক সেকেণ্ড ঐ অবস্থায় থাক তারপর পায়ের উপর জোর দিয়ে শ্বাস নিতে নিতে সোজা হয়ে দাঁড়াও। প্রক্রিয়াটি ৩ বার অভ্যাস কর।

প্রণালী—৮(খ)

৯। প্রণালী—উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। হাতের তালু উপুড় করে, দু' পাশে মেলে মেঝেতে রাখ। থুতনি মেঝেতে লেগে থাকবে। এবার হাত, বুক ও কোমরের উপর জোর রেখে, পা দু'টি জোড়া অবস্থায় উঁচু করে, পিছনে নিয়ে এসে,
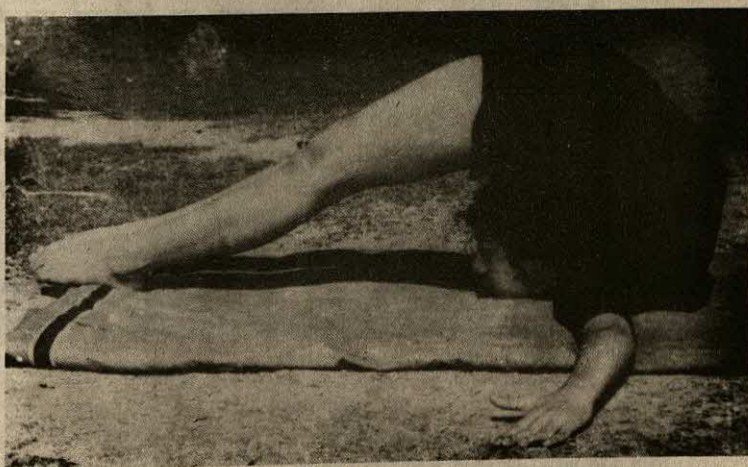
প্রণালী—৯

পায়ের পাতা মেঝেতে রাখ। ছবি দেখ। বেশ কয়েক সেকেণ্ড ঐ অবস্থায় থাক, তারপর ঐ একই অবস্থায় হাত, বুক ও কোমরের উপর জোর রেখে পূর্বাবস্থায় ফিরে এস। ৪ বার অভ্যাস কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সূর্য-নমস্কার

সূর্য-নমস্কার একটি উত্তম খালিহাতে ব্যায়াম। যে কোন ব্যায়াম বা খেলাধুলার পূর্বে কয়েকবার সূর্য-নমস্কার করে নিলে দেহ যথেষ্ট ব্যায়ামোপযোগী হয়ে ওঠে। রক্তের গতি ও দেহের তাপ যে কোন ব্যায়ামের পক্ষে উপযোগী করে তোলার জন্য পদ্ধতিটি বিশেষ কার্যকরী। তাই, দু'এক ক্ষেপ সূর্য-নমস্কার করে তারপর যোগাসন আরম্ভ করলে খুব দ্রুত এবং ভাল ফল পাওয়া যায়।

ভারতের যোগ-দর্শনের রচয়িতারা সূর্যকে দেবতা জ্ঞানে এবং সেই দেবতাকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে প্রণাম জানিয়ে যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস করতে বলে গেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন প্রথমে সূর্যকে প্রণাম করে তারপর যোগ-ব্যায়াম আরম্ভ করলে তিনি খুশি হয়ে তাঁর দেহের প্রাণশক্তি অভ্যাসকারীর দেহে পাঠিয়ে দেন—অর্থাৎ, যোগ-ব্যায়ামকারী প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়ে ওঠে।

ব্যায়ামটির ভঙ্গিমাগুলি দেখতে যোগাসনের মত হলেও সূর্য-নমস্কার যোগ-ব্যায়াম নয়, মূলেই তফাৎ। কারণ, যোগাসন অভ্যাস করতে হয় স্থিতিতে আর সূর্য নমস্কারের ভঙ্গিমাগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হবে গতিতে—তার মধ্যে কোথাও স্থিতি নেই, ঠিক ড্রিলের মত। ১ঃ ২ঃ ৩ঃ ৪ঃ ৫ঃ ৬ঃ ৭ঃ ৮ঃ বলার বা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ১ঃ ২ঃ ৩ঃ ৪ঃ ৫ঃ ৬ঃ ৭ঃ ৮ঃ নম্বর ভঙ্গিমাগুলি পর পর করে যেতে হবে। আবার ৮ নং ভঙ্গিমা থেকে ১ নং অর্থাৎ নমস্কারের ভঙ্গিমায় ফিরে আসতে হবে। ১ থেকে ৮ এবং ৮ থেকে ১-এ ফিরে এলে তবেই একবার সূর্য-নমস্কার হবে। ছবি দেখ।

সূর্য-নমস্কার

প্রণালী—১

১। হাত দু'টি নমস্কারের ভঙ্গিমায় রেখে, পা জোড়া ও শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াও।

প্রণালী—২

২। ঐ অবস্থায় হাত মাথার উপর তোল। হাত দুটি কানের সঙ্গে লেগে থাকবে।
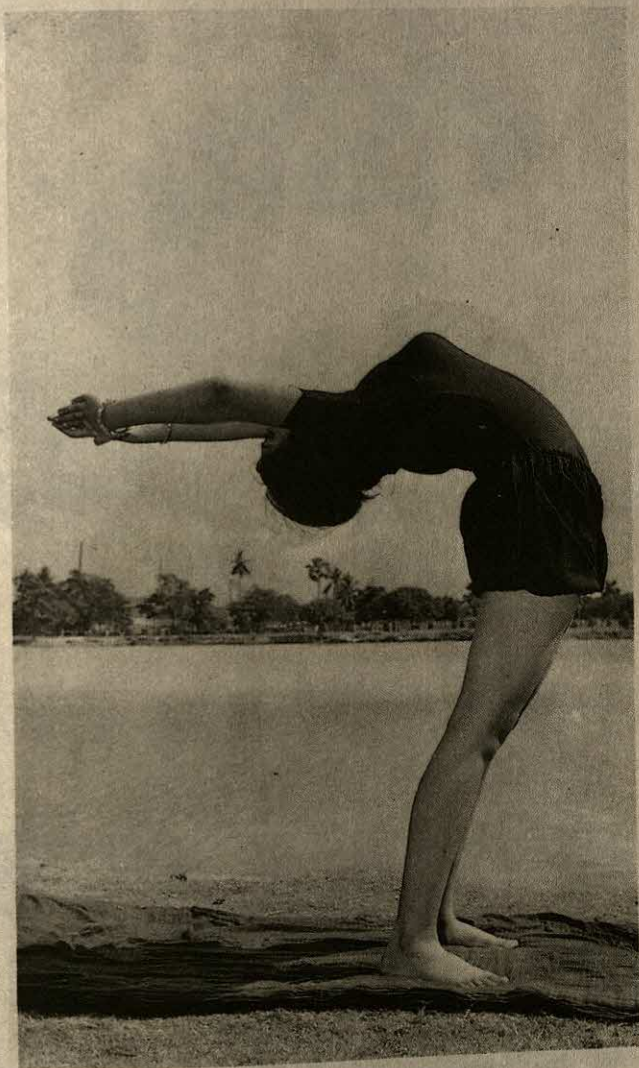
প্রণালী—৩

৩। এবার গোড়ালি থেকে কোমর পর্যন্ত সোজা রেখে দেহের উপরাংশ যতটা সম্ভব পিছনদিকে বাঁকিয়ে নিয়ে যাও। হাত কানের সঙ্গে লেগে থাকবে।

প্রণালী—৪

৪। গোড়ালি থেকে কোমর পর্যন্ত সোজা রেখে, দেহের উপরাংশ নীচু করে, হাত দু'টি সামনে পায়ের কাছে রাখ।

প্রণালী—৫

৫। হাতের তালু মাটিতে রেখে পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে উবু হয়ে বস।

প্রণালী—৬

৬। এক পা পিছনে ছড়িয়ে দিয়ে মাথা উঁচু কর।
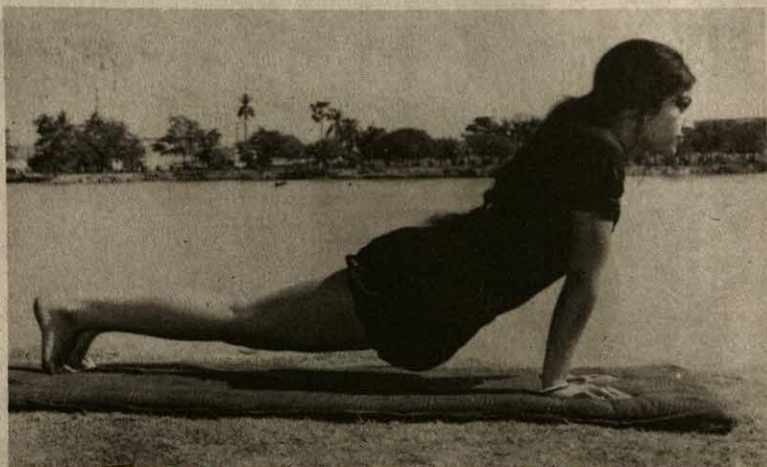
প্রণালী—৭

৭। অপর পা পিছনে ছড়িয়ে দাও। হাতের তাল; ও পায়ের আঙ্‌লের ওপর দেহের সমস্ত ভার থাকবে।

প্রণালী—৮

৮। এবার নীচু হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর। তারপর উল্টোদিক থেকে পর পর ভঙ্গিমা করে অর্থাৎ ৮ থেকে ১-এ ফিরে এস, আর তাহলেই একবার সূর্য-নমস্কার হবে।

সপ্তম অধ্যায়

আসন

শবাসন

অনেক যোগ-কুশলীর মতে আসন অভ্যাসের প্রতি পর্যায়ে একবার করে ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। অর্থাৎ, একটি আসন যদি ৩ বার করা হয়, তবে মোট এক মিনিট অথবা দেড় মিনিট শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। প্রক্রিয়াটিতে
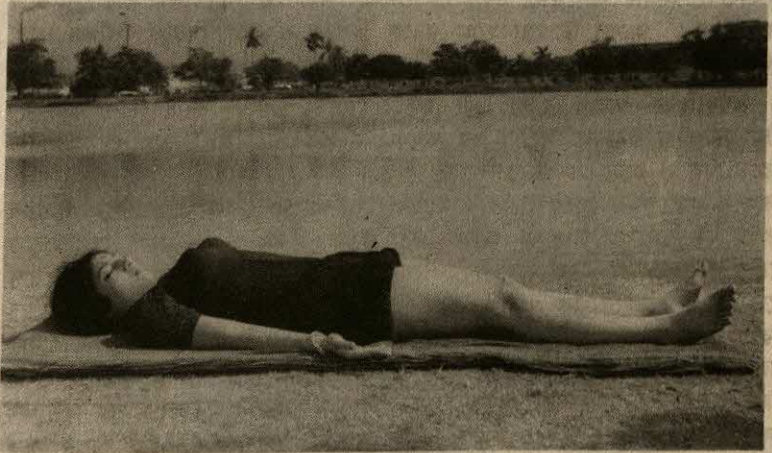
শবাসন

যেমন সময়ের অপচয় হয়, তেমনি বিরক্তিও লাগে। আমার মতে, কোন একটি আসন ৩ বার অভ্যাস করা হোক বা ৫ বার অভ্যাস করা হোক, আসনটি সম্পূর্ণ অভ্যাসের পর প্রয়োজনমত একবার ৩০ সেঃ থেকে ৪৫ সেঃ শবাসনে বিশ্রাম নিলে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। এমন আসনও আছে যেগুলো অভ্যাসের পর সাধারণতঃ আর শবাসনে বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। তবে যারা বয়স্ক বা রুগ্ন তাদের কথা স্বতন্ত্র।

শব শব্দের অর্থ মৃতদেহ। মৃত ব্যক্তির যেমন তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর কোন কর্তৃত্ব বা জোর থাকে না, তেমনি শবাসন অবস্থায় অভ্যাসকারীর দেহের কোন অংশে তার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। মৃত ব্যক্তির মত আসনকারীকেও কিছুক্ষণের জন্য বাস্তব জগৎ থেকে দূরে যেতে হবে। তুমি আর তখন তোমাতে থাকবে না। চিন্তা-ভাবনা থেকে মনকে কিছুক্ষণের জন্য দূরে রাখতে হবে।

প্রণালী—দু'হাত শরীরের দু'পাশে মেলে রেখে সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়। হাতের তালু ওপর দিকে এবং পায়ের পাতা দু'পাশে একটু হেলে থাকবে অথবা যে ভাবে ভাল লাগে সেই ভাবে রাখবে। এবার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল করে দাও। দেহের প্রতিটি জোড় ও মাংসপেশী আল্‌গা করে দাও। শরীরের কোন অংশে কোন রকম জোর থাকবে না। মন শান্ত, ধীর, চিন্তাশূন্য করে মৃতের মত কিছুক্ষণ পড়ে থাক। শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ সরল ও মন্থর থাকবে। মনে রাখবে, বাস্তব জগৎ থেকে তুমি তখন দূরে আছ। আসন অবস্থায় যদি ঘুম আসতে থাকে তবে বুঝতে হবে আসনটি ঠিকমত অভ্যাস হচ্ছে।

অনেকের মতে পা থেকে আরম্ভ করে এক এক করে শরীরের এক একটি অংশ শিথিল করে এনে তারপর মাথা শিথিল করতে হবে। প্রক্রিয়াটি যেমন কঠিন তেমনি দুর্বোধ্য। আমার মনে হয়, যার কাছে যেভাবে সহজ ও স্বাভাবিক তার সেইভাবে করা উচিত। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে চিন্তাশূন্য করে, দেহকে শিথিল করে, দেহ ও মনকে কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া, তা সে যেভাবেই হোক।

উপকারিতা—রক্তচাপ বৃদ্ধি এবং হৃদ্‌রোগীদের পক্ষে আসনটি অবশ্য করণীয়। দীর্ঘ সময় বা শ্রমসাধ্য কাজের পর অথবা অনিদ্রার পর কিছু সময় এই আসনটি করলে দেহ ও মনের সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হয়ে যায়। নতুন জীবনীশক্তি, উদ্যম ও কর্মপ্রেরণা ফিরে আসে। যাদের অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হয়, তাদের আসনটি অবশ্য করা উচিত। মন ও স্নায়ুতন্ত্র প্রয়োজনমত বিশ্রাম না পেলে স্নায়বিক দুর্বলতা, বধিরতা, দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি নানা কঠিন রোগ হতে পারে। এমন কি পাগল হয়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার সময় আসনটি 'মৃত সঞ্জীবনী'র মত কাজ করে। অত্যধিক পড়াশুনার পর এই আসনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে অবসাদ, ক্লান্তি দূর হয়ে শুধু নতুন উদ্যম ফিরে আসে না, স্মৃতিশক্তিও বৃদ্ধি পায়। প্রায় সব আসন অভ্যাসের পর কিছুক্ষণ শবাসনে বিশ্রাম নিতে হয়। কারণ, আসন অবস্থায় শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে প্রচুর রক্ত-চলাচল করে, তারপর শবাসনে বিশ্রাম নিলে রক্ত চলাচল আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। সন্তান প্রসবের দু'মাস আগে থেকে এবং প্রসবের পর অন্ততঃ দু'মাস দিনে কিছু সময় শবাসনে বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

পবন-মুক্তাসন

পেটের আবদ্ধ বায়ুকে মুক্ত করে দেয় বলেই এই আসনটির নাম পবন-মুক্তাসন।

প্রণালী—সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়। এবার ডান পা উঁচু করে হাঁটু ভেঙে দু'হাত দিয়ে ঐ হাঁটু ধরে ডান বুকে চেপে ধর। ছবি দেখ। ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় রাখ। তারপর হাত আল্‌গা করে ডান পা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাও। এবার বাঁ পা ঐ একইভাবে নিয়ে এসে বাঁ বুকের ওপর চেপে ধর এবং ফিরিয়ে

নিয়ে যাও। তারপর দু' হাঁটু একসঙ্গে নিয়ে এসে বুকের ওপর চেপে ধর। প্রতিটি ভঙ্গিমা ৪ বার করে অভ্যাস কর। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। প্রথম অভ্যাসের সময় উরু ও হাঁটু যদি পেট ও বুকের সঙ্গে না লাগে তবে পেট ও উরুর মাঝে একটি পাতলা নরম বালিশ দিতে হবে। আসল উদ্দেশ্য হলো, উরু দিয়ে পেটের ওপর চাপ দেওয়া। আসনটির পর শবাসনে বিশ্রাম নাও।

পবন-মুক্তাসন—১(ক)

পবন-মুক্তাসন—১(খ)

উপকারিতা—যাদের পেটে বায়ু জমে তাদের আসনটি অবশ্যই করা উচিত। আসনটি অভ্যাস রাখলে কোনদিন পেট ফাঁপা রোগ হয় না। তাছাড়া, আসনটি অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্ল প্রভৃতি পেটের যাবতীয় রোগ দূর করে, জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত

করে, পেট, তলপেট ও নিতম্বের স্নায়ুজাল ও পেশী সবল ও সক্রিয় রাখে। পেট ও বস্তিপ্রদেশের অপ্রয়োজনীয় মেদ কমিয়ে দেহকে সুঠাম ও সুন্দর করতে সাহায্য করে।

আসনটি প্যাংক্রিয়াস গ্রন্থিকে সবল ও সক্রিয় রাখে ; ফলে কোনদিন ডায়াবেটিক রোগ হতে পারে না।

নিষেধ—যাদের পেটে অত্যধিক বায়ু জমে, যাদের প্লীহা, যকৃৎ অস্বাভাবিক বড় বা যাদের কোন রকম হৃদ্‌রোগ আছে, তাদের রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত সাবধানে আসনটি যতটুকু সহজভাবে হয় ততটুকু করা বাঞ্ছনীয়। জোর করে পেটের ওপর অত্যধিক চাপ দেওয়া ঐ অবস্থায় কখনই উচিত নয়।

পশ্চিমোত্থানাসন (ক)

এই আসনটিতে শরীরের পিছনদিকে বেশী ব্যায়াম হয়, তাই আসনটির নাম পশ্চিমোত্থানাসন।

প্রণালী—সামনে পা ছড়িয়ে সোজা হয়ে বস। এবার কোমর থেকে শরীরের উপরাংশ নীচু করে ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের এবং বাঁ হাত দিয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ধর। এখন আরো নীচু হয়ে পেট উরুর সঙ্গে ও কপাল হাঁটুর সঙ্গে লাগাও।

পশ্চিমোত্থানাসন—১(ক)

দু'কনুই পায়ের দু'পাশে মেঝেতে রাখ এবং ঐ অবস্থায় ২০ থেকে ৩০ সেঃ থাক। ছবি দেখ। তারপর হাত আল্‌গা করে আস্তে আস্তে সোজা হয়ে বস। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। আসনটি ৪ বার কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

প্রথম দু'একদিন হয়তো কপাল, পেট, কনুই ঠিক জায়গায় যাবে না। যতটুকু সহজভাবে হয় ততটুকু করবে। জোর করে বা ঝাঁকুনি দিয়ে ঠিক জায়গায় নিতে চেষ্টা করা উচিত নয়। মেরুদণ্ডে বা কোমরে লেগে যেতে পারে। দু'চারদিন

অভ্যাসের পর সহজ হয়ে যাবে। তবে হাঁটু যেন ভেঙে না যায়। পা দু'টি মেঝের সঙ্গে লেগে থাকবে। কিছুদিন অভ্যাসের পর প্রতিবার অভ্যাসের সময় একটু একটু করে বাড়ানো যেতে পারে, তবে এক মিনিটের বেশী যেন না হয়। আসনটি অভ্যাসের পর এমন একটি আসন করা উচিত যাতে মেরুদণ্ড পিছন দিকে বাঁকানো যায়।

উপকারিতা—আসনটি মেরুদণ্ড ও পেটের পক্ষে বিশেষ উপকারী। আসনটি অভ্যাস রাখলে মেরুদণ্ডের হাড়ের সংযোগস্থল নমনীয় থাকে এবং মেরুদণ্ডসংলগ্ন স্নায়ুমণ্ডলী ও দু'পাশের পেশী সবল ও সক্রিয় থাকে। মেরুদণ্ড সুস্থ ও নমনীয় থাকলে গ্রন্থি ও স্নায়ুতন্ত্রের কাজ স্বাভাবিক থাকে। বিশেষ করে অগ্ন্যাশয়, মূত্রাশয়, প্রজনন প্রভৃতি গ্রন্থিগুলি সতেজ এবং কর্মক্ষম থাকে। বহুমূত্র রোগীর আসনটি করা অবশ্য দরকার। আসনটি হাত, পা, পেট ও বস্তিপ্রদেশের পেশী ও স্নায়ুজাল সতেজ ও সক্রিয় রাখে, জঠরাগ্নি বৃদ্ধি করে, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, অর্শ প্রভৃতি রোগ কোন দিন হতে দেয় না। পেট ও কোমরের অপ্রয়োজনীয় মেদ কমিয়ে দেহের গড়ন সুন্দর করে। কিশোর-কিশোরীদের লম্বা হতে সাহায্য করে। তাছাড়া, আসনটি অভ্যাস রাখলে কোনদিন কোন বাত বা সায়টিকা হয় না, আর থাকলেও অল্পদিনে ভালো হয়ে যায়।

নিষেধ—যাহাদের হার্ণিয়া বা এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ রোগ আছে রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত তাদের আসনটি করা উচিত নয়। আর যাদের প্লীহা, যকৃৎ রুগ্ন বা অত্যধিক বড় তাদের অতি সতর্কতার সঙ্গে আসনটি করা উচিত। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ না নিয়ে ঝুঁকি নেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

পশ্চিমোত্থানাসন (খ)

প্রণালী—পশ্চিমোত্থানাসন ক-এর অনুরূপ। ব্যতিক্রম শুধু কোমর থেকে দেহের উপরাংশ নিচু হওয়ার সময় মোচড় দিতে হবে, মাথার নিচের দিকটা যেদিকে মোচড়

পশ্চিমোত্থানাসন—১(খ)

দেবে সেই হাঁটুর উপর রাখতে হবে এবং সেই হাত দিয়ে দু'পায়ের গোড়ালি ধরতে হবে এবং অপর হাত দিয়ে দু'পায়ের বুড়ো আঙুল ধরতে হবে। ছবি দেখ। ডাইনে-বাঁয়ে মোচড় দিয়ে আসনটি ৪ থেকে ৬ বার কর।

উপকারিতা—'ক'-এর অনুরূপ। তাছাড়া, দেহের উপরাংশে মোচড় পড়ে বলে ঘাড়, গলা, কাঁধ, বুক, কোমর, পিঠ, মেরুদণ্ড ও মেরুদণ্ডের দু'পাশের পেশী ও স্নায়ুজালের খুব ভাল ব্যায়াম হয়।

নিষেধ—পশ্চিমোত্থানাসন ক-এর অনুরূপ।

বিভক্ত-পশ্চিমোত্থানাসন

প্রণালী—সোজা হয়ে দাঁড়াও। হাত দুটি কোমরে রাখ, এবার পায়ের পাতা ঘষতে ঘষতে দু'দিকে ছড়িয়ে দাও। এখন সামনের দিকে ঝুঁকে দু'হাত দিয়ে দু'পায়ের বুড়ো আঙুল ধর ও চিবুক মেঝেতে রেখে সামনের দিকে তাকাও। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক। ২৫ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক, তারপর

বিভক্ত-পশ্চিমোত্থানাসন

হাত-পা আলগা করে সোজা হয়ে দাঁড়াও। ৩ থেকে ৪ বার আসনটি অভ্যাস কর। প্রয়োজনমত শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—আসনটিতে দেহের সব অংশে কমবেশী উপকার হয়—বিশেষ করে উরুর সন্ধি-স্থলের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে।

জানুশিরাসন (ক)

আসন অবস্থায় মাথা হাঁটুর উপর রাখতে হয়, তাই আসনটির নাম জানুশিরাসন।

প্রণালী—সামনের দিকে পা ছড়িয়ে সোজা হয়ে বস। ডান পায়ের হাঁটু ভেঙে গোড়ালি দু'পায়ের সংযোগস্থলে রাখ।

ডান পায়ের পাতার নীচের দিকটা বাঁ উরুর সঙ্গে লেগে থাকবে। বাঁ পা পূর্বাবস্থায় সামনের দিকে ছড়িয়ে থাকবে এবং হাঁটুর নীচের দিকটা মেঝের সঙ্গে লেগে থাকবে। এবার দু'হাত দিয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ধর। এখন কোমর থেকে

শরীরের উপরাংশ নীচু করে কপাল বাঁ পায়ের হাঁটুতে এবং দু'কনুই বাঁ পায়ের দু'পাশে মেঝেতে রাখ। বাঁ হাঁটু যেন না ভাঙে। ছবি দেখ। ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। হাত আল্‌গা করে আস্তে আস্তে সোজা হয়ে বসো। ডান পা সামনের দিকে ছড়িয়ে দাও। এবার একইভাবে ডান পায়ে কর। পা বদল করে ৬ বার কর। প্রয়োজনমত শবাসনে বিশ্রাম নাও।

ভালোমত অভ্যাস হয়ে গেলে প্রতিবার অভ্যাসের সময় বাড়ানো যেতে পারে, তবে কোন মতেই যেন এক মিনিটের বেশী না হয়। প্রথম দু'একদিন হয়তো কপাল ও কনুই ঠিক জায়গায় যাবে না, সহজভাবে যতটুকু হয় ততটুকু করবে। দু'চার দিন অভ্যাসের পর ঠিক হয়ে যাবে। এই আসনটি অভ্যাসের পর এমন একটি আসন করা উচিত যাতে মেরুদণ্ড পিছন দিকে বাঁকানো যায়।

জানুশিরাসন—১(ক)

উপকারিতা—পশ্চিমোত্থানাসনের অনুরূপ, উপরন্তু উরুর সংযোগস্থলের স্থিতি-স্থাপকতা বজায় রাখে।

নিষেধ—পশ্চিমোত্থানাসন ক-এর অনুরূপ।

জানুশিরাসন (খ)

প্রণালী—সামনের দিকে পা ছড়িয়ে সোজা হয়ে বস। ডান পা হাঁটু থেকে জানুশিরাসন ক-এর মত রাখ, বাঁ পা বাঁদিকে ছড়িয়ে দাও। পায়ের নিচের দিকটা মেঝের সাথে লেগে থাকবে। এবার কোমর থেকে দেহের উপরাংশ বাঁদিকে মোচড় দিয়ে, নিচু হয়ে মাথার পিছন দিকটা হাঁটুর উপর রাখ এবং দু'হাত দিয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ধর। বাঁ হাতের কনুই হাঁটুর ডানপাশে থাকবে। ছবি দেখ। ২৫

থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর মোচড় ভেঙ্গে সোজা হয়ে বস। ঐ একই ভাবে ডান পা ছড়িয়ে আসনটি কর। ৪ থেকে ৬ বার আসনটি করবে তারপর প্রয়োজনমত শবাসনে বিশ্রাম।
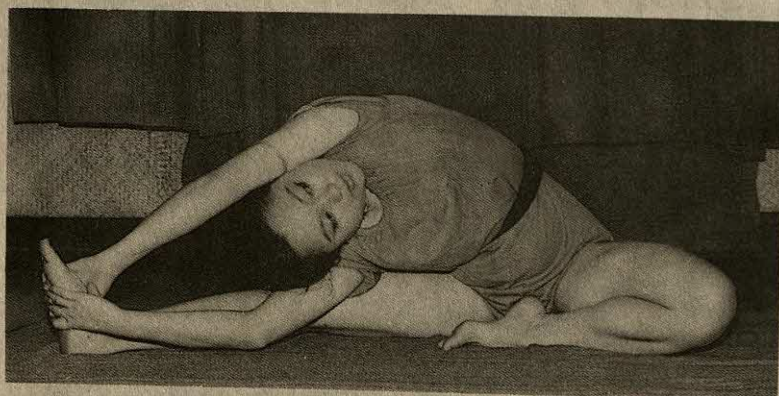
জানুশিরাসন—১(খ)

উপকার—জানুশিরাসন ক-এর অনুরূপ। তবে দেহের উপরাংশে মোচড় পড়ার ফলে ঘাড়, কাঁধ, গলা, বুক, পিঠ, মেরুদণ্ড ও মেরুদণ্ডের দু'পাশের পেশী ও স্নায়ুজালের অল্প সময়ে খুব ভাল কাজ হয়।

নিষেধ—পশ্চিমোত্থানাসন ক-এর অনুরূপ।

দণ্ডায়মান জানুশিরাসন

প্রণালী—সোজা হয়ে দাঁড়াও। এখন ডান পা ভেঙে কিছুটা উপরে তুলে, দু'হাত দিয়ে পায়ের পাতা ধর। এ অবস্থায় কপাল হাঁটুতে রেখে আস্তে আস্তে ডান পা সোজা কর। তারপর হাতের কনুই ভেঙে হাঁটুর দু'পাশে লাগাও। এ অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে ৩০ সেকেন্ড থাকবে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পা বদল করে ৪ বার কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।
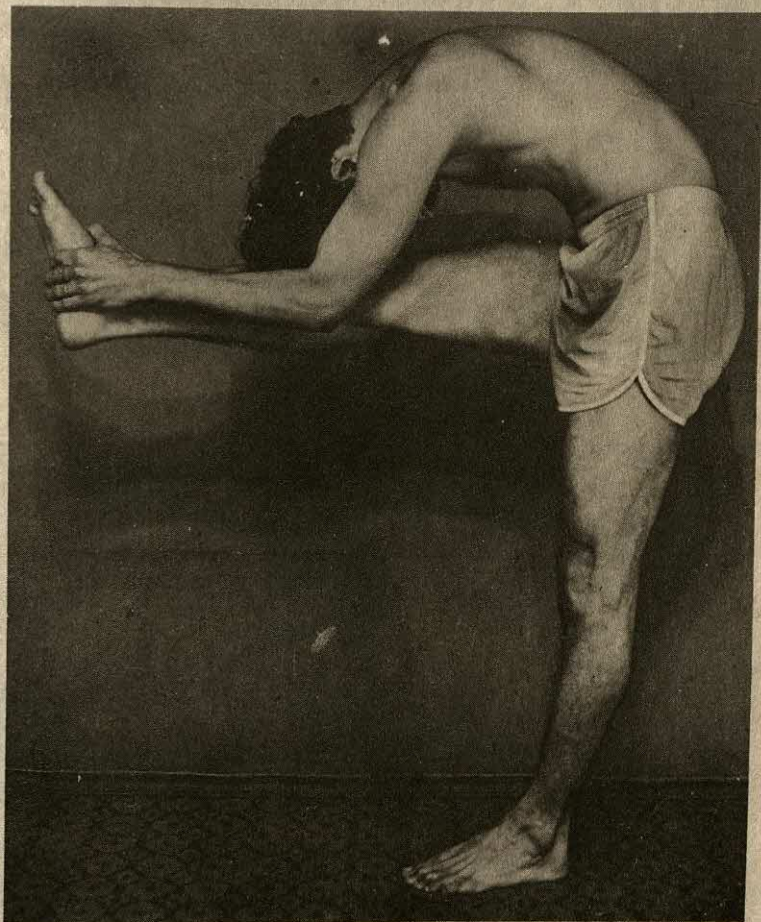
দণ্ডায়মান জানুশিরাসন

উপকারিতা—জানুশিরাসনের অনুরূপ। উপরন্তু দেহের ভারসাম্য বাড়ায়।

বিভক্ত-জানুশিরাসন

প্রণালী—সোজা হয়ে দাঁড়াও। হাত দু'টি কোমরের দু'পাশে রাখ। এবার দু'পায়ের পাতা ঘষতে ঘষতে দু'দিকে নিয়ে যাও। পাছা এসে মেঝেতে লাগবে। এখন কোমর থেকে হাত তুলে নিয়ে শরীরের উপরাংশ ডানদিকে নীচু করে মাথা
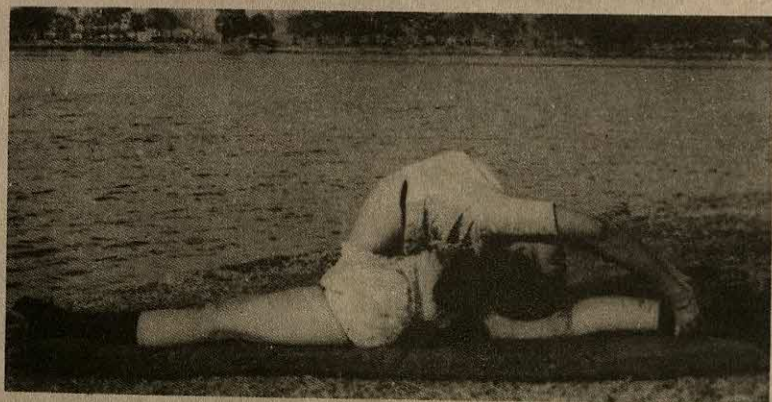
বিভক্ত-জানুশিরাসন

ডান হাঁটুতে ঠেকাও এবং দু' হাত দিয়ে ডান পায়ের গোড়ালি বা তার একটু উপরে ধর। পা দু'টি একই সরলরেখায় আসবে। ছবি দেখ। পাছা মেঝেতে নামাবার
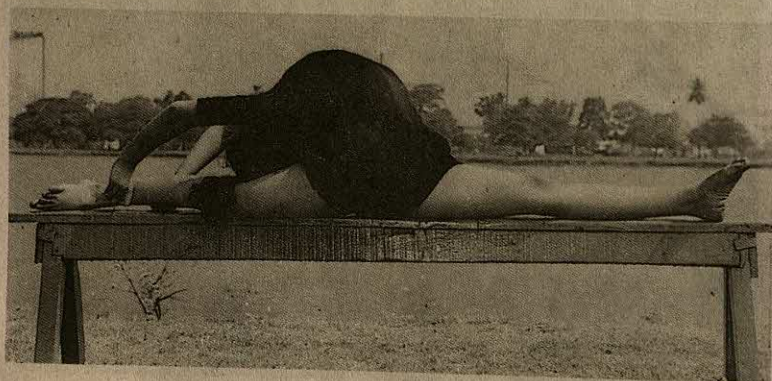
বিভক্ত-জানুশিরাসন (সরু বেঞ্চির উপরে)

সময় বা পা দু'টি একই রেখায় আনার সময় কোনরকম জোর বা ঝাঁকুনি দেবে না—ঊরুর সংযোগস্থলে চোট্ লাগতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ১৫ সেঃ থেকে ২০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর হাত আল্‌গা করে সোজা হয়ে বস।

শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। একটু বিশ্রাম নিয়ে এবার বাঁদিকে একইভাবে অভ্যাস কর। দু'দিকে ২ বার করে ৪ বার কর। শবাসনে বিশ্রাম নাও। পা দু'দিকে বেশীক্ষণ ছড়িয়ে রাখতে অসুবিধা বোধ করলে উঠে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিয়ে আবার করবে।

উপকারিতা—আসনটিতে জানুশিরাসন ও উষ্ট্রাসনের প্রায় সব গুণ একসঙ্গে পাওয়া যায়, অধিকন্তু ঊরুর সন্ধিস্থলের মাংসপেশী ও হাড়ের জোড় নমনীয় থাকে। ফলে দেহের ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি করে। তাছাড়া, আসনটি অভ্যাস রাখলে হার্ণিয়া, একশিরা, অর্শরোগ এবং কোন স্ত্রী-ব্যাধি হয় না।

নিষেধ—যাদের অর্শ বা হার্ণিয়া রোগ আছে, রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত তাদের আসনটি করা উচিত নয়।

অর্ধ-কূর্মাসন

প্রণালী—হাঁটু ভেঙে, পায়ের পাতা মুড়ে, ঠিক গোড়ালির ওপর পাছা রেখে সোজা হয়ে বস। হাঁটু দু'টি একসঙ্গে লেগে থাকবে। এবার নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত দু'টি জোড় করে মাথার উপর তোল, দু'হাত দু'কানের সঙ্গে লেগে থাকবে। এখন ঐ অবস্থায় হাঁটুর সামনে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম কর। কপাল ও

অর্ধ-কূর্মাসন

দু'হাতের কড়ে আঙুল মাটিতে এবং পেট ঊরুর সঙ্গে লেগে থাকবে। কনুই যেন মাটিতে না লাগে। ছবি দেখ। ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। তারপর আস্তে আস্তে সোজা হয়ে বসো। হাত নামিয়ে বিশ্রাম নিয়ে আসনটি ৩ বার কর। শেষবারের পর প্রয়োজনমত শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—এই আসনটি পশ্চিমোত্থানাসন ও জানুশিরাসনের প্রায় অনুরূপ।

উত্থিত পদাসন

প্রণালী—হাত দু'টি দেহের দু'পাশে রেখে পা দু'টি জোড়া করে সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়। হাতের চেটো মাটির দিকে থাকবে। এবার হাতের তালু ও কনুইয়ে ভর দিয়ে পা জোড়া অবস্থায় মাটি থেকে দেড় হাত উপরে তোল, হাঁটু যেন না ভাঙে। ছবি দেখ। ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। তারপর আস্তে আস্তে পা মাটিতে নামিয়ে রাখ। ব্যায়ামটি ৩ বার কর। প্রয়োজনমত শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উত্থিত পদাসন

উপকারিতা—আসনটিতে পেট ও বস্তিপ্রদেশের খুব ভাল ব্যায়াম হয়। পেটের পেশী ও স্নায়ুজাল, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি সতেজ ও সক্রিয় থাকে। হজমশক্তি বৃদ্ধি করে, পেটের যাবতীয় রোগ দূর করে। পেটের অপ্রয়োজনীয় মেদ কমিয়ে দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আসনটি অভ্যাস রাখলে কোনদিন হার্ণিয়া রোগ হয় না। মেয়েদের ডিম্বাশয়ে প্রচুর রক্ত চলাচল করে বলে কোনদিন স্ত্রী-ব্যাধি হতে পারে না—আর হলেও আসনটি অভ্যাসের ফলে অল্পদিনে তা ভালো হয়ে যায়।

শলভাসন

'শলভ' শব্দের অর্থ পতঙ্গ। আসন অবস্থায় দেহটি অনেকটা পতঙ্গের মত দেখায়, তাই আসনটির নাম শলভাসন।

প্রণালী—হাত দু'টি দেহের দু'পাশে লম্বাভাবে রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। হাতের চেটো মেঝের দিকে এবং আঙুলগুলি মুষ্টিবদ্ধ হয়ে থাকবে। চিবুক মেঝেতে অথবা একপাশে বাঁকিয়ে রাখতে পারো। গোড়ালি ওপর দিকে সোজা হয়ে থাকবে। এবার পা দু'টি জোড়া ও সোজা রেখে, মেঝে থেকে দেড় হাত থেকে দু'হাত উপরে তোল। ছবি দেখ। ঐ অবস্থায় ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ থাক। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। আসনটি ৪ বার কর এবং প্রয়োজনমত শবাসনে বিশ্রাম নাও।

প্রথম অভ্যাসের সময় যদি দু'পা একসঙ্গে তোলা সম্ভব না হয়, তবে এক পা তুলে অভ্যাস করবে। দু'চার দিন অভ্যাসের পর দু'পা একসঙ্গে তুলতে অসুবিধা হবে না।
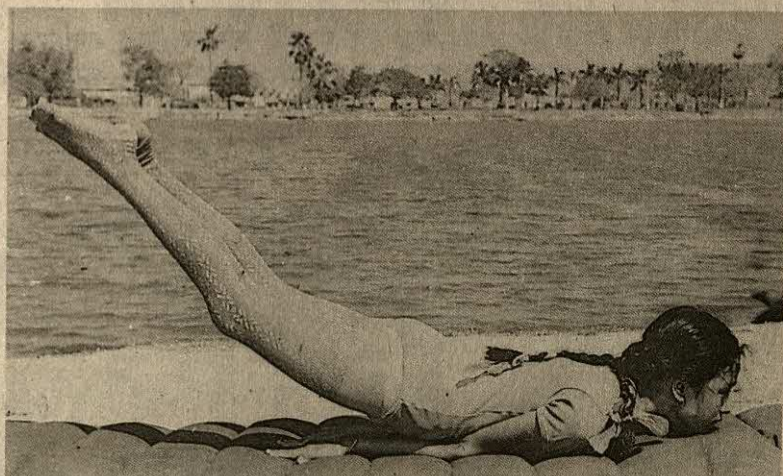
শলভাসন

উপকারিতা—আসনটিতে কোমর থেকে শরীরের নিম্নাংশের খুব ভাল ব্যায়াম হয়। ফলে কটিবাত, মাজা ব্যথা, মেয়েদের ঋতুকালীন তলপেটে ব্যথা কোনদিন হয় না। আসনটি বাত বা সায়টিকার এক আশ্চর্য প্রতিষেধক। তলপেটে খাদ্যগ্রহণী নাড়ী, মূলনাড়ী প্রভৃতি কতকগুলো যন্ত্র যদি প্রয়োজনমত আভ্যন্তরীণ চাপ সৃষ্টি করতে না পারে তবে অন্ত্রে অর্ধজীর্ণ খাবার এবং মল-নাড়ীতে মল জমতে আরম্ভ করে। ঐ অর্ধজীর্ণ খাবার ও মল পচে দেহে বিষ সৃষ্টি করে এবং পরে ঐ বিষ রক্তের সঙ্গে মিশে দেহের সমস্ত দেহযন্ত্র বিকল করে দেয়। অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্ল প্রভৃতি রোগ একের পর এক দেহে আশ্রয় নিতে থাকে। অতি সহজে এইসব রোগ দেহে বাসা বাঁধে। শলভাসনে তলপেটে প্রচণ্ড চাপ পড়ে এবং ঐ অঞ্চলের দেহযন্ত্রগুলির খুব ভালো ব্যায়াম হয়। ফলে তাদের কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। আসনটি দেহের প্রসারক পেশীগুলিকে সঙ্কুচিত ও রক্তে প্লাবিত করে এবং সঙ্কোচক পেশীগুলিকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দেয়—যার জন্য উভয় পেশীর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কোমর থেকে দেহের নিম্নাংশের সমস্ত পেশী ও স্নায়ুজাল সতেজ ও সক্রিয় থাকে। আসনটি তলপেট ও কোমরের অপ্রয়োজনীয় মেদ কমিয়ে দেহকে সুগঠিত করে। ফুসফুস-সংলগ্ন স্নায়ুজাল ও ফুসফুসের বায়ুকোষ পুষ্ট ও সবল হয়। ফলে তাদেরও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। হৃৎপিণ্ডের পেশীও সতেজ এবং সক্রিয় থাকে। আসনটির সঙ্গে পদহস্তাসন, শশাঙ্গাসন বা ঐ জাতীয় কোন আসন অভ্যাস রাখলে সেক্রা-লাইজেন্‌ লাম্বাগো, লাম্বার স্পণ্ডিলোসিস্‌, স্লীপড্‌ ডীস্ক জাতীয় রোগ কোনদিন হতে পারে না।

নিষেধ—আসন অবস্থায় হৃৎপিণ্ডে ও ফুস্‌ফুসে প্রচণ্ড চাপ পড়ে। যাদের কোন রকম হৃদ্‌রোগ আছে, রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই আসনটি করা উচিত নয়।

নৌকাসন

প্রণালী—সটান উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। হাত দু'টি সামনের দিকে নমস্কারের ভঙ্গিমায় মেঝেতে রাখ—হাত কানের সঙ্গে লেগে থাকবে। ছবি দেখ। এবার পেট ও তলপেটের উপর ভর রেখে, মেরুদণ্ডে চাপ দিয়ে হাত ও পা জোড়া অবস্থায় সাধ্য-মত উপরে তোল এবং সামনে তাকাও। শুধু পেট ও তলপেট মেঝেতে রাখতে হবে। ঐ অবস্থায় সাধ্যমত বেশ কয়েক সেকেণ্ড থাক তারপর হাত পা মেঝেতে নামিয়ে বিশ্রাম নাও। আসনটি ৪ বার অভ্যাস কর।
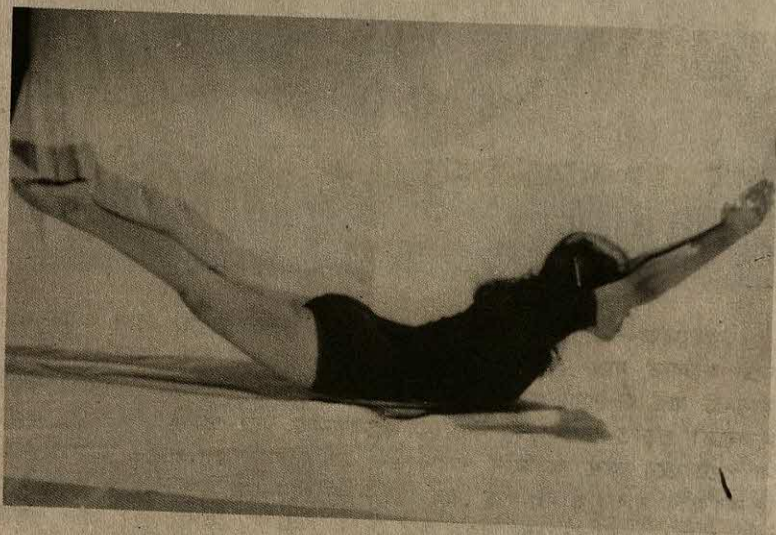
নৌকাসন

উপকার—আসনটিতে দেহের প্রায় সব অংশের কমবেশী উপকার হয়। বিশেষ করে হাত, পা, কাঁধ, ঘাড়, বুক, পেট, বস্তি-প্রদেশ, নিতম্ব, কোমর। মেরুদণ্ড ও মেরু-দণ্ডের দু'পাশের পেশী ও স্নায়ুজালের খুব ভাল কাজ হয়।

(আসন করার পর পদ-হস্তাসন, হলাসন, শশাঙ্গাসন প্রভৃতি যে কোন একটি আসন করা উচিত।)

ভুজংগাসন বা সর্পাসন

আসন অবস্থায় দেহটি অনেকটা সাপের মত দেখায়, তাই আসনটির নাম ভুজংগাসন বা সর্পাসন।

প্রণালী—পা দু'টি সোজা ক'রে সটান উপুড় হয়ে শুয়ে পড়, পায়ের পাতার উপর দিকটা যতদূর সম্ভব মুড়ে মেঝেতে রাখতে হবে। দু'হাতের তালু উপুড় করে পাঁজরের কাছে দু'পাশে মেঝেতে রাখ। এবার পা থেকে কোমর পর্যন্ত মেঝেতে রেখে হাতের তালুর ওপর ভর দিয়ে মাথা যতদূর সম্ভব ওপরে তোল। এখন মাথা সাধ্যমত পিছনদিকে বাঁকিয়ে ওপরের দিকে তাকাও। ছবি দেখ। ২৫ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। তারপর আস্তে আস্তে মাথা ও বুক নামিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়।

ভুজংগাসন—১(ক)

কিছুদিন অভ্যাসের পর হাতের তালুর উপর ভর না দিয়ে বুক ও মাথা উপরে তুলতে হবে। শুধু বুক ও পিঠের ওপর জোর দিয়ে মাথা ও বুক ওপরে রাখতে হবে এবং হাত দু'টি কাঁধ বরাবর তুলে উঁচু করে রাখতে হবে। ছবি দেখ। আসনটি ২ বার কর এবং প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।
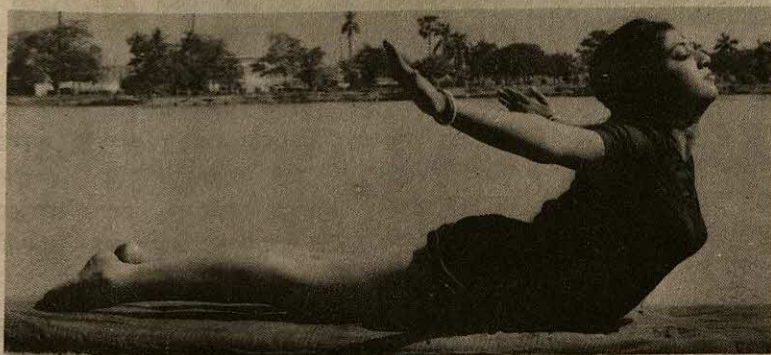
ভুজংগাসন—১(খ)

উপকারিতা—আসনটিতে ঘাড়, গলা, মুখ, বুক, পেট, পিঠ, কোমর ও মেরুদণ্ডের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে ; ফলে শরীরের ঐসব অঞ্চলের স্নায়ুতন্ত্র ও পেশী সতেজ ও সক্রিয় থাকে, মেরুদণ্ডের হাড়ের জোড় নমনীয় হয়। বাঁকা মেরুদণ্ড সোজা ও সরল হয়। আসনটির সঙ্গে শশঙ্গাসন, পদ-হস্তাসন বা ঐ জাতীয় কোন আসন অভ্যাস রাখলে স্পণ্ডিলোসিস্, স্লীপ্ড ডীস্ক জাতীয় রোগ কোন দিন হতে পারে না। বুকের পেশী ও পাঁজরের হাড় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ও বুক সুগঠিত হয়। হৃৎপিণ্ডের পেশী এবং ফুস্ফুসের বায়ুকোষ ও স্নায়ুজালের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আসনটি মেয়েদের অবশ্য করা উচিত। আসন অবস্থায় ডিম্বাশয়ে প্রচুর রক্ত সঞ্চালিত হয়। ফলে কোন স্ত্রী-ব্যাধি সহজে হতে পারে না, আর থাকলেও অল্পদিন অভ্যাসে ভাল হয়ে যায়। যে সব ছেলে-মেয়েদের বয়স অনুযায়ী বুকের গড়ন সরু বা অপরিণত, আসনটি কিছুদিন নিয়মিত অভ্যাস করলে তাদের বুক সুগঠিত হয়ে ওঠে।

পূর্ণ-ভুজংগাসন

প্রণালী—ভুজংগাসনের প্রথম অবস্থার ভঙ্গিমায় বস অর্থাৎ হাত দু'টি পাঁজরের দু'পাশে রেখে ভুজংগাসন কর। এবার হাতের তালুর উপর জোর দিয়ে মাথা ও বুক যতদূর পারো পিছনদিকে বাঁকিয়ে নিয়ে যাও এবং উপরদিকে তাকাও। হাত
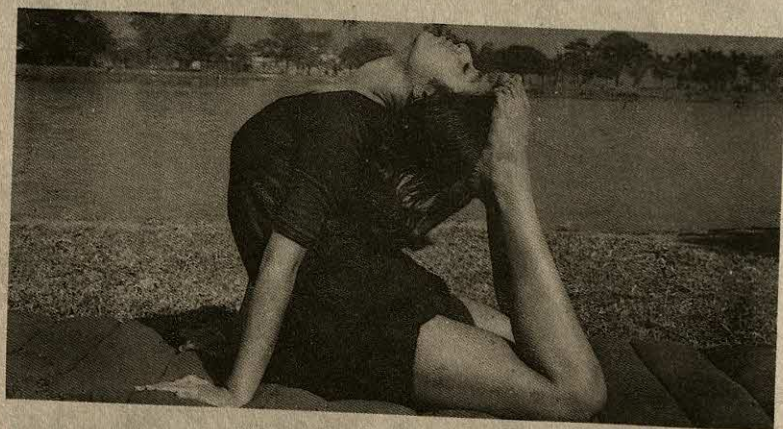
পূর্ণ-ভুজংগাসন

দুটি সোজা হয়ে যাবে এবং গম্বুজের কাজ করবে। অথচ কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে রেখে, হাঁটু ভেঙে পায়ের পাতা দু'টি মাথার ব্রহ্মতালুতে রাখ। উপরের ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ২৫ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর হাত-পা আল্গা করে আস্তে আস্তে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। আসনটি ৩ বার কর এবং প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—ভুজংগাসনের সব গুণ আসনটিতে বর্তমান। আরও তাড়াতাড়ি এবং ভাল ফল পাওয়া যায়। তাছাড়া আসনটিতে পা, বস্তিপ্রদেশ ও নিতম্বের খুব ভাল ব্যায়াম হয়। দেহে বাত ও সায়টিকা আক্রমণ করতে পারে না।

পদ্মাসন

পদ্মাসন তিন প্রকার—মুক্ত-পদ্মাসন, বদ্ধ-পদ্মাসন ও উত্থিত পদ্মাসন।

মুক্ত-পদ্মাসন ঃ

প্রণালী—সামনের দিকে পা ছড়িয়ে শিরদাঁড়া সোজা করে বস। এবার বাঁ পা হাঁটু থেকে ভেঙে ডান উরুর উপর এবং ডান পা একইভাবে বাঁ উরুর উপর রাখ। হাত দু'টির চেটো উপুড় করে বা চিৎ করে অথবা ধ্যান করার ভঙ্গিতে দু'হাঁটুর
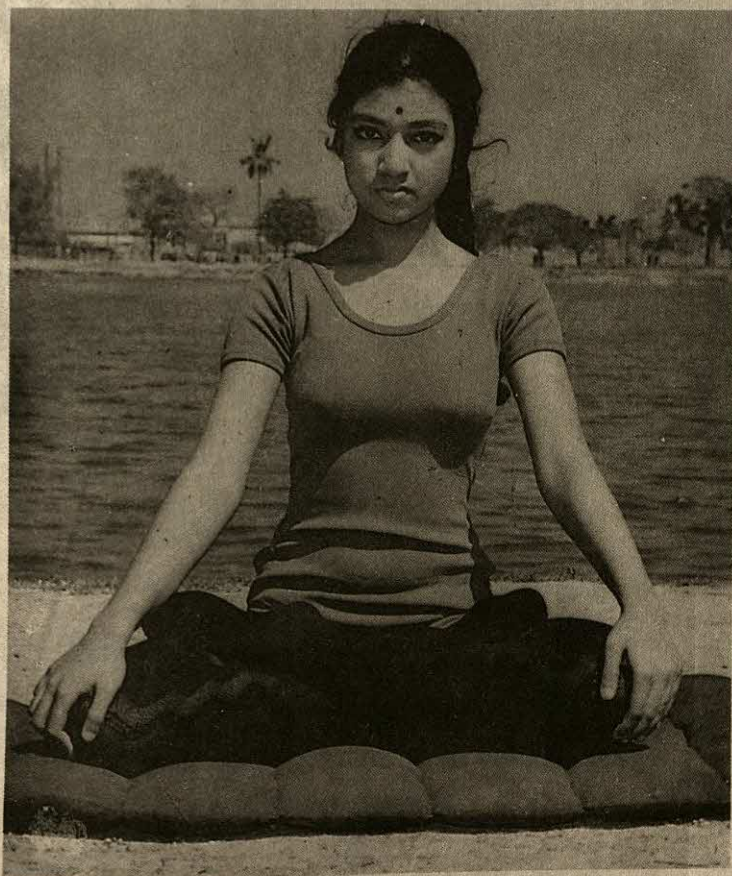
পদ্মাসন—১(ক)

উপর রাখ। অথবা নমস্কারের ভঙ্গিমায় বুকের উপর রাখ। এখন দৃষ্টি নাসাগ্রে এবং জিহবাগ্র মাড়ির শেষদিকে স্পর্শ করে রাখ। ছবি দেখ। যতক্ষণ সহজভাবে

পারো ঐ অবস্থায় থাক। পদ্মাসনে বেশী সময় থাকলে কোন ক্ষতি হয় না। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। বেশীক্ষণ পদ্মাসনে থাকলে পা বদল করে নেবে। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।
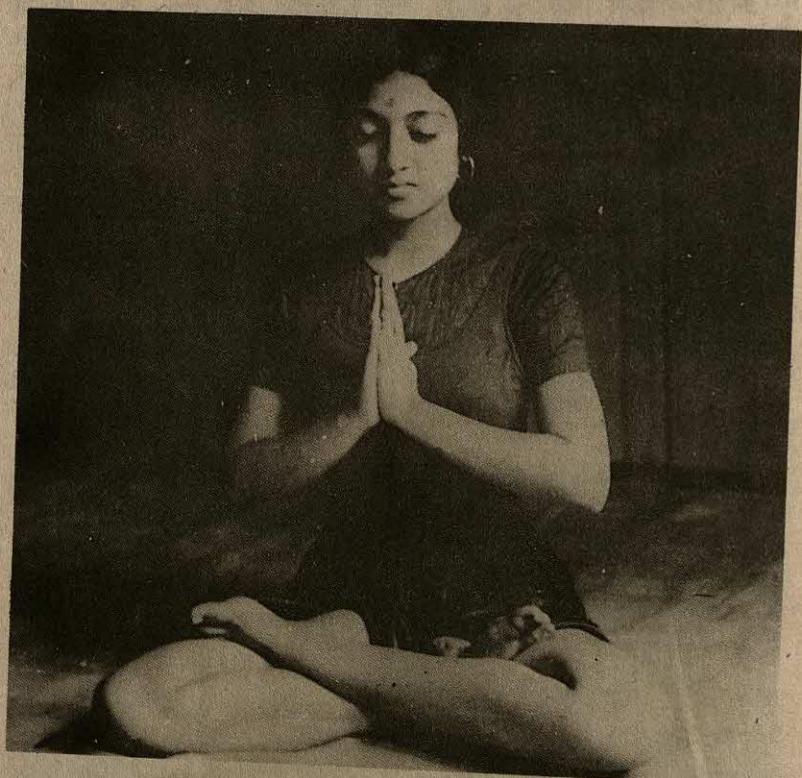
পদ্মাসন—১(খ)

উপকারিতা—যোগশাস্ত্র মতে আসনটিতে সর্বরোগ দূর হয়। হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফলে হাঁপানী রোগ হতে পারে না; আর থাকলেও অল্পদিনে সেরে যায়। মেরুদণ্ড সোজা ও সরল রাখে। চিন্তাশক্তি, স্মৃতিশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করে ও মনের একাগ্রতা আনে। পায়ের পেশী ও স্নায়ুজাল সতেজ ও সক্রিয় রাখে। দেহে বাত বা সায়াটিকা আক্রমণ করতে পারে না।

বদ্ধ-পদ্মাসন

প্রণালী—প্রথমে মুক্ত-পদ্মাসনে বস। এবার ডান হাত পিছনদিক দিয়ে ঘুরিয়ে এনে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল এবং একইভাবে বাঁ হাত দিয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ধর। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। বেশীক্ষণ আসনে থাকলে হাত-পা বদল করে নেবে। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।
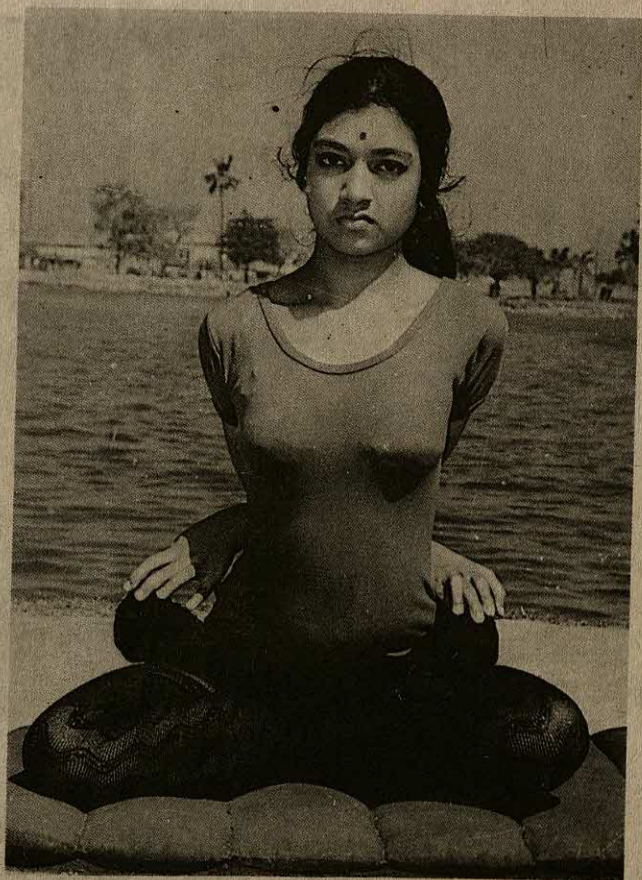
বদ্ধ-পদ্মাসন

উপকারিতা—পদ্মাসনের সব গুণ আসনটিতে বর্তমান। এতে দ্রুত ফল পাওয়া যায়। তাছাড়া, আসনটি কাঁধ ও বুকের খাঁচার গঠনগত দোষত্রুটী দূর করে। ছবি দেখ।

উত্থিত পদ্মাসন

প্রণালী—মুক্ত পদ্মাসনে বস। এবার দু'হাত পাছার দু'পাশে রাখ। এখন হাতের জোরে দু'হাতের চেটোর উপর ভর রেখে শরীরকে কিছুটা উপরে তোল। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় ২০-২৫ সেকেণ্ড থাক। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উত্থিত পদ্মাসন
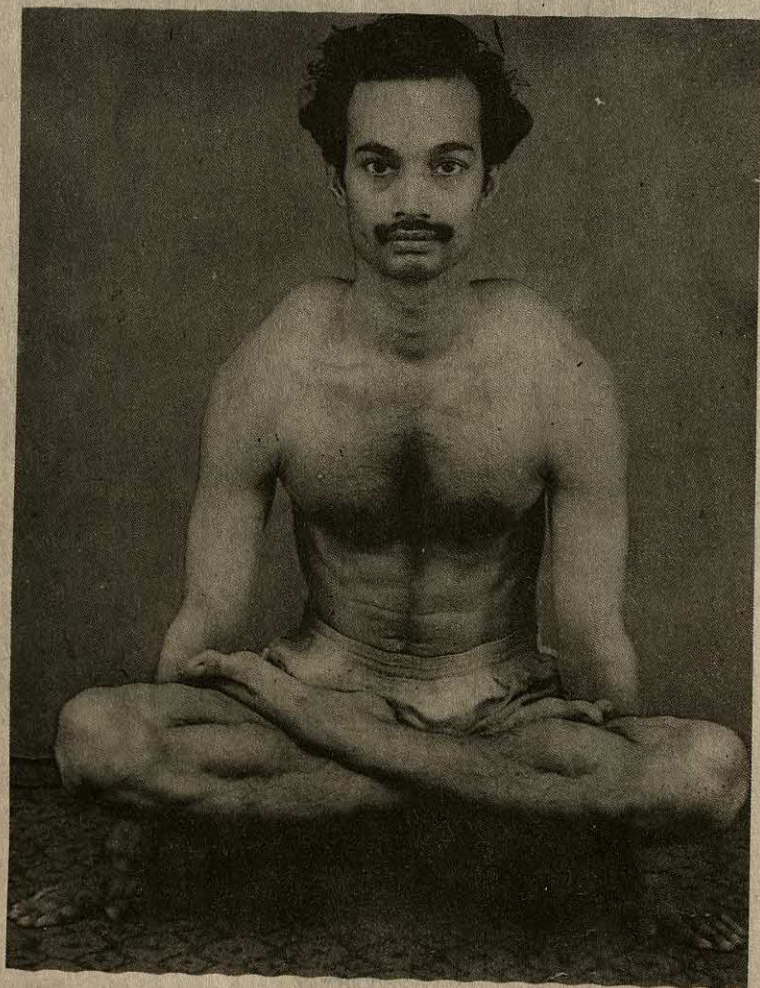
উপকারিতা—মুক্ত-পদ্মাসনের প্রায় সব গুণ এতে বর্তমান। উপরন্তু পেটের বাড়তি চর্বি কমিয়ে ক্ষিদে বাড়ায় এবং হাতের ও কাঁধের পেশী পুষ্ট করে এবং হাতে প্রচণ্ড শক্তি আনে।

পর্বতাসন

প্রণালী—প্রথমে পদ্মাসনে ব'সে ধীরে ধীরে হাঁটুর ওপর বস। প্রথম অভ্যাসার্থীরা হাতের উপর ভর রেখে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করবে। এবার হাতের তালু দু'টি নমস্কারের ভঙ্গিমায় রেখে মাথার উপর তোল। দৃষ্টি সামনে থাকবে। ছবি দেখ।
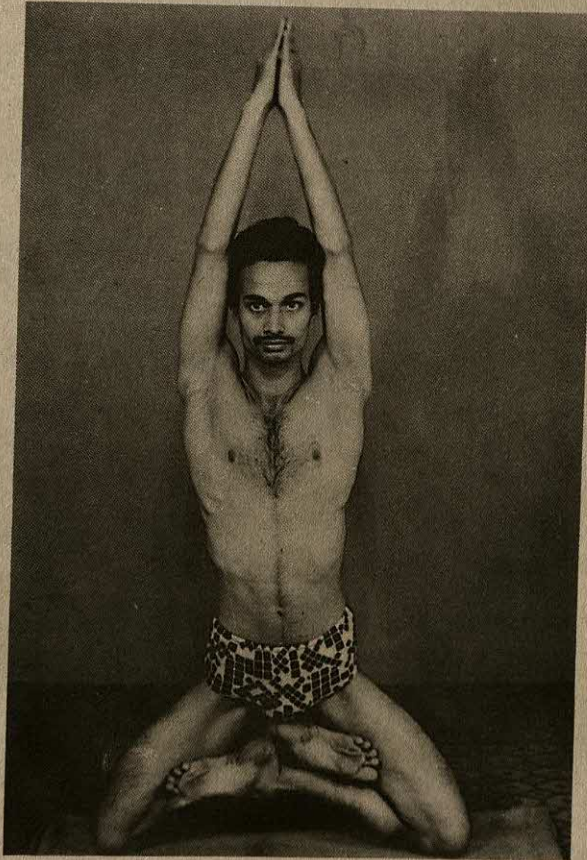
পর্বতাসন

২০-৩০ সেকেন্ড ঐ অবস্থায় থাক। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নিয়ে এবং পা বদল ক'রে আসনটি ৪ বার অভ্যাস কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—আসনটিতে পায়ের খুব ভালো ব্যায়াম হয়, বিশেষ ক'রে উরুর সামনের পেশী ও সায়েটিক নার্ভের খুব ভালো কাজ হয়। পায়ে কোনদিন বাত বা সায়টিকা হ'তে পারে না—আর থাকলেও তা খুব তাড়াতাড়ি সেরে যায়। তদুপরি আসনটি অভ্যাসের ফলে মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়।

তোলাঙ্গাসন

প্রণালী—পদ্মাসনে বসে হাত দু'টি দেহের দু'পাশে রেখে শুয়ে পড়—হাতের তালুদ্বয় পাছার নীচে থাকবে। এবার কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে
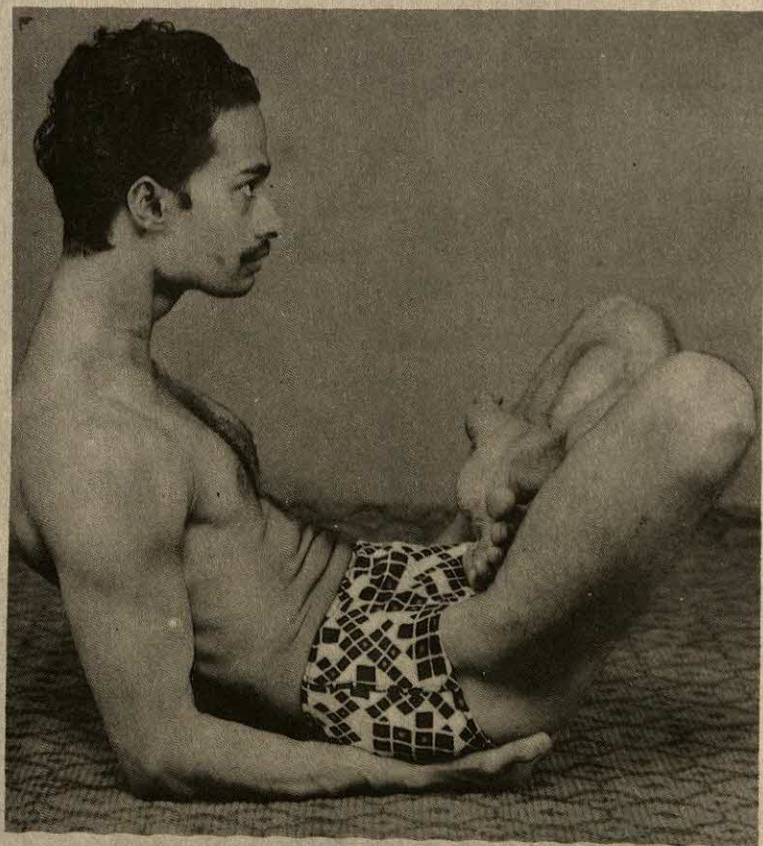
তোলাঙ্গাসন—১(ক)

বুক ও পা সমভাবে মাটি থেকে উপরে তোল। হাতের কনুই মেঝের সঙ্গে প্রায় ৯০° ডিগ্রীতে লেগে থাকবে। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। আসনটি ৩ বার কর এবং প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—আসনটিতে দেহের সকল অংশের কম-বেশী উপকার হয়—বিশেষ

করে পেটের মাংসপেশী সবল হয়। আসনটিতে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। পেটে প্রচণ্ড চাপ পড়ে ফলে পেটের যাবতীয় গ্রন্থি ও পেশী সবল ও সক্রিয় থাকে। আমাদের দেহের বেশীর ভাগ রোগ পেট থেকে আসে, যেমন—পেটের ভিতরে দু'পাশে দু'টি বৃক্ক বা কিড্‌নি আছে এবং তাদের কাজ রক্ত থেকে
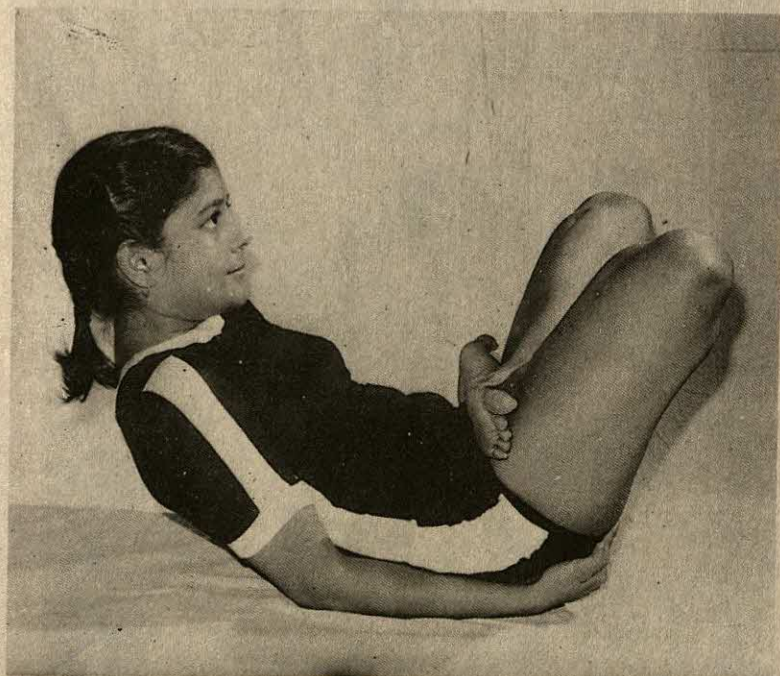
তোলাঙ্গাসন—১(খ)

অপ্রয়োজনীয় জলীয় অংশ এবং যা কিছু শরীরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় তা মূত্ররূপে দেহ থেকে বের করে দেওয়া। এখন দেখা যাচ্ছে যে, কিড্‌নি যদি সুস্থ ও সক্রিয় থাকে তবে দেহে কোন অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকারক কোন কিছু থাকতে পারে না। এড্রিনাল গ্রন্থি সক্রিয় রাখতে আসনটি বিশেষ কার্যকরী। মেয়েদের সন্তান প্রসব-হেতু বা অন্য কোন কারণে পেট ও তলপেটের শিথিলতা দূর করে পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনতে আসনটি বিশেষভাবে সাহায্য করে। আসনটি অভ্যাস রাখলে ছেলেদের হার্নিয়া জাতীয় রোগ কোনদিন হয় না। তাছাড়া, আসনটির সঙ্গে পদহস্তাসন বা শশঙ্গাসন অভ্যাস রাখলে বাত, সায়টিকা, লাম্বার স্পণ্ডিলোসিস্, স্লীপ্‌ড ডীস্ক্ জাতীয় রোগ কোনদিন হতে পারে না। তাছাড়া, এই আসন অভ্যাসের ফলে দেহে কোথাও অপ্রয়োজনীয় চর্বি জমতে পারে না এবং সেইসঙ্গে হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুস্‌ফুসের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

সিদ্ধাসন

প্রণালী—সামনের দিকে পা ছড়িয়ে শিরদাঁড়া সোজা করে বস। এবার ডান পা হাঁটু থেকে ভেঙে গোড়ালি দুই পায়ের সংযোগস্থলে স্পর্শ করে রাখ। তারপর

সিদ্ধাসন—১(ক)

বাঁ পা হাটু থেকে ভেঙ্গে ডান পায়ের উপর রাখ। দুই পায়ের গোড়ালি তলপেটের নীচে লেগে থাকবে। এখন ধ্যান করার ভঙ্গিতে দু' হাতের তালু দু' হাঁটুর উপর

রাখ এবং দৃষ্টি নাভিদেশে রাখ। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। পা বদল করে আসনটি ৫ মিনিট কর। প্রয়োজনে শবাসনে বিশ্রাম নাও।
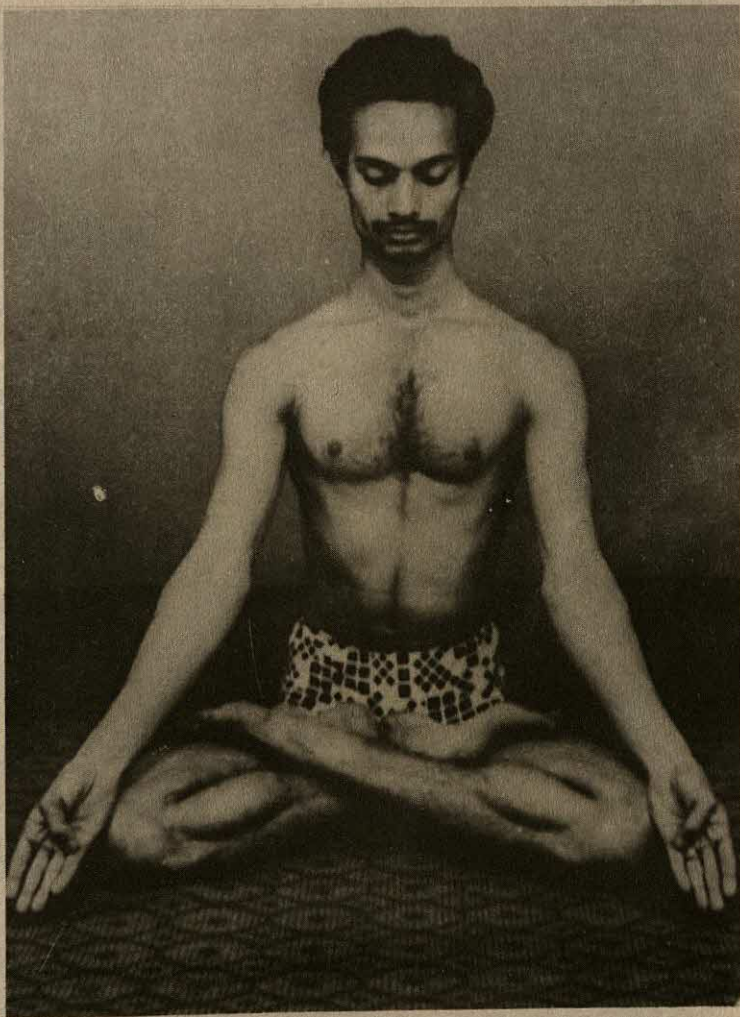
সিদ্ধাসন—১(খ)

উপকারিতা—এই আসনে বসে প্রাণায়াম, ধ্যান, জপ করলে অল্পদিনে সুফল পাওয়া যায়। আসনটিতে মনোবল ও ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করে এবং ব্রহ্মচর্য্য পালনে সাহায্য করে।

বজ্রাসন

যোগশাস্ত্র মতে আসনটি অভ্যাসে দেহের নিম্নাংশ বজ্রের মত দৃঢ় হয়, তাই এই আসনটির নাম বজ্রাসন।

প্রণালী—হাঁটু ভেঙে, পা দু'টি পিছনদিকে মুড়ে শিরদাঁড়া সোজা করে বস। হাতের চেটো উপুড় করে দু' জানুর উপর রাখ। ছবি দেখ। পাছা গোড়ালির

বজ্রাসন (পাশ থেকে)

উপর থাকবে। প্রথম দু'একদিন একটু অসুবিধা হলেও পরে ঠিক হয়ে যাবে। যতক্ষণ সহজভাবে পার ঐ অবস্থায় বস। একবারে বেশীক্ষণ না পারলে আসনটি ৩ বার কর। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। প্রয়োজন মনে করলে শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—পরিপূর্ণ আহারের পর এই আসনটি কিছুক্ষণ অভ্যাস করলে খাদ্য-বস্তু সহজে হজম হয় এবং হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। বজ্রাসনে বসে চুল আঁচড়ালে

বজ্রাসন (সামনে থেকে)

সহজে চুল পাকে না বা পড়ে না। পায়ের পেশী ও স্নায়ুজাল সতেজ ও সক্রিয় থাকে। তাছাড়া, যাদের উপরাংশের তুলনায় নিম্নাংশ সরু বা অপরিণত আসনটি তাদের অবশ্য করা উচিত। দেহের নিম্নাংশ সুগঠিত করতে আসনটি অতুলনীয়।

সুপ্ত-বজ্রাসন

প্রণালী—প্রথমে বজ্রাসনের ভঙ্গিমায় বস। এবার পা, হাঁটু ও পাছা ঐ অবস্থায় রেখে আস্তে আস্তে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়। অসুবিধা বোধ করলে পায়ের গোড়ালি দু'পাশে একটু হেলিয়ে নিতে পার। এবার হাত দু'টি মাথার পিছনে বা মাথার
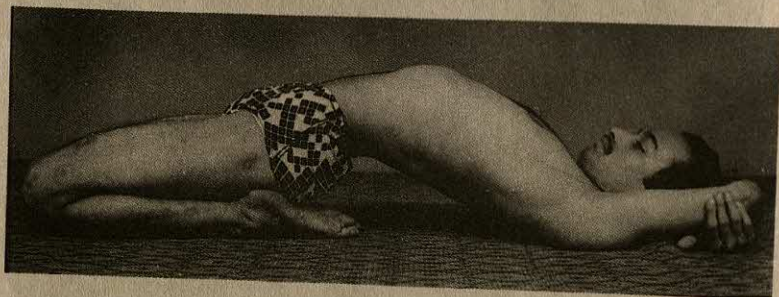
সুপ্ত-বজ্রাসন—১(ক)

নীচে মেঝেতে রেখে ডান হাত দিয়ে বাঁ কনুই এবং বাঁ হাত দিয়ে ডান কনুই ধর। এখন পিঠ মাটি থেকে একটু উপরে তোল। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ঐ অবস্থায় ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ থাক। তারপর আস্তে আস্তে পাছার নীচ থেকে মোড়ানো পা খুলে সোজা করে দাও এবং হাত দু'টি শরীরের দু'পাশে রেখে বিশ্রাম নাও। আসনটি ৩ বার কর।
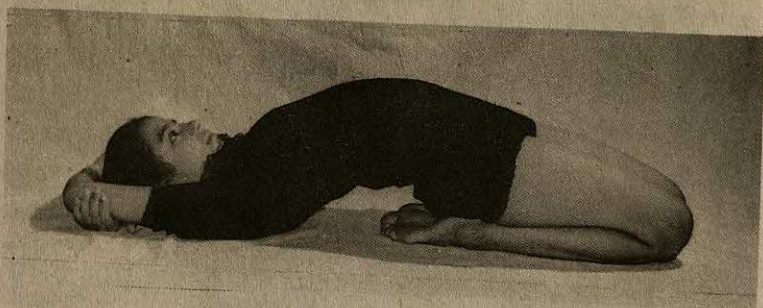
সুপ্ত-বজ্রাসন—১(খ)

উপকারিতা—এই আসনে মেরুদণ্ডের হাড়ের জোড় নমনীয় হয়। হাত, পা, পেট, পিঠ, বুক, কোমর ও নিতম্বের পেশী ও স্নায়ুজাল সতেজ ও সক্রিয় হয় এবং বুক সুগঠিত হয়। সহজে কোন পেটের রোগও হতে পারে না। আসনটি অভ্যাস রাখলে বাত বা সায়াটিকা হতে পারে না, আর থাকলেও অল্পদিনে ভালো হয়ে যায়। আসনটিতে মৎস্যাসনের অনেকটা কাজ হয়।

অর্ধ-মৎস্যেন্দ্রাসন

প্রণালী—সামনের দিকে পা ছড়িয়ে শিরদাঁড়া সোজা করে বস। এবার ডান পা তুলে, হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙে বাঁ পায়ের উপর দিয়ে নিয়ে বাঁ উরুর বাঁ পাশে মাটিতে রাখ। ডান পায়ের পাতা মাটির সঙ্গে লেগে থাকবে। এখন বাঁ পা হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙে গোড়ালি দু'পায়ের সংযোগস্থলে অথবা ডান পাছার সঙ্গে লাগিয়ে

অর্ধ-মৎস্যেন্দ্রাসন (সামনে থেকে)

মাটিতে রাখ। এবার বাঁ হাত ডান হাঁটুর পাশ দিয়ে নিয়ে ডান পায়ের আঙুল অথবা বাঁ পায়ের হাঁটু শক্ত করে ধর এবং ডান হাত পিছনদিক দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বাঁ উরু ও তলপেটের সংযোগস্থলে রাখ। এখন ডান দিকে শরীরটা মোচড় দিয়ে ঘাড় ও মাথা ডান দিকে বাঁকিয়ে ডান পিঠ দেখতে চেষ্টা কর। ছবি দেখ। ঐ অবস্থায় ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ থাক। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। তারপর

হাত-পা আলগা করে বসে বিশ্রাম নাও। হাত-পা বদল করে আসনটি ৪ বার কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।
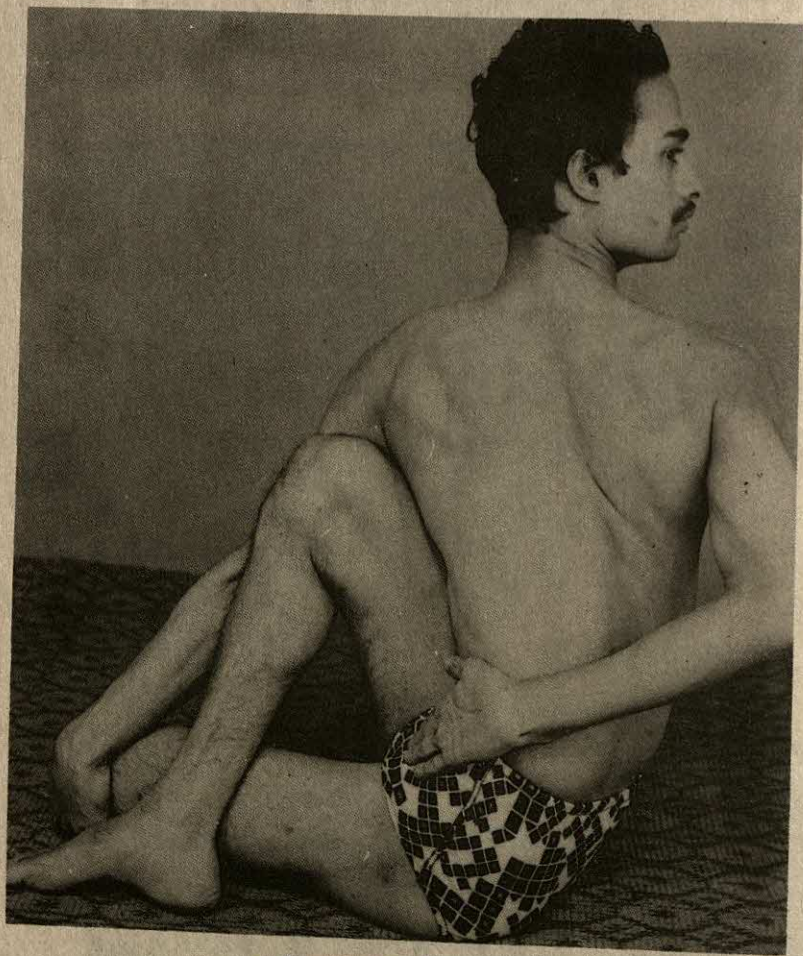
অর্ধ-মৎস্যেন্দ্রাসন (পিছন থেকে)

উপকারিতা—আসনটি মেরুদণ্ডকে যৌবনোচিত নমনীয় ও সরল রাখতে অদ্বিতীয়। পিঠের ও মেরুদণ্ডের দু'পাশের পেশী ও স্নায়ুকেন্দ্রগুলি সতেজ ও সক্রিয় রাখে। আসনটিতে দেহের সব অংশের কম-বেশী ব্যায়াম হয়। ফলে, দেহের কোন অংশে বাত বা সায়টিকা হতে পারে না। তাছাড়া, আসনটি অজীর্ণ, কোষ্ঠ-বদ্ধতা, প্লীহা, যকৃতের রোগ দূর করতে সাহায্য করে। যাদের কাঁধ একদিকে উঁচু বা নীচু তাদের আসনটি অবশ্য করা উচিত। এই আসনটির সঙ্গে পদহস্তাসন, শশঙ্গাসন বা ঐ জাতীয় কোন আসন অভ্যাস করলে লাম্বার স্পণ্ডিলোসিস, স্লীপ্ড ডীস্ক্ জাতীয় কোন রোগ হতে পারে না।

গোমুখাসন

প্রণালী—পা দু'টি সামনের দিকে ছড়িয়ে শিরদাঁড়া সোজা করে বস। এখন বাঁ পা হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙে গোড়ালি ডান উরুর নীচে অথবা ডান পাছার কাছে মেঝেতে রাখ। এবার ডান পা হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙে বাঁ উরুর উপর দিয়ে নিয়ে বাঁ পাছার কাছে মেঝেতে রাখ। ডান পায়ের গোড়ালি ডান পাছা স্পর্শ করে রাখার
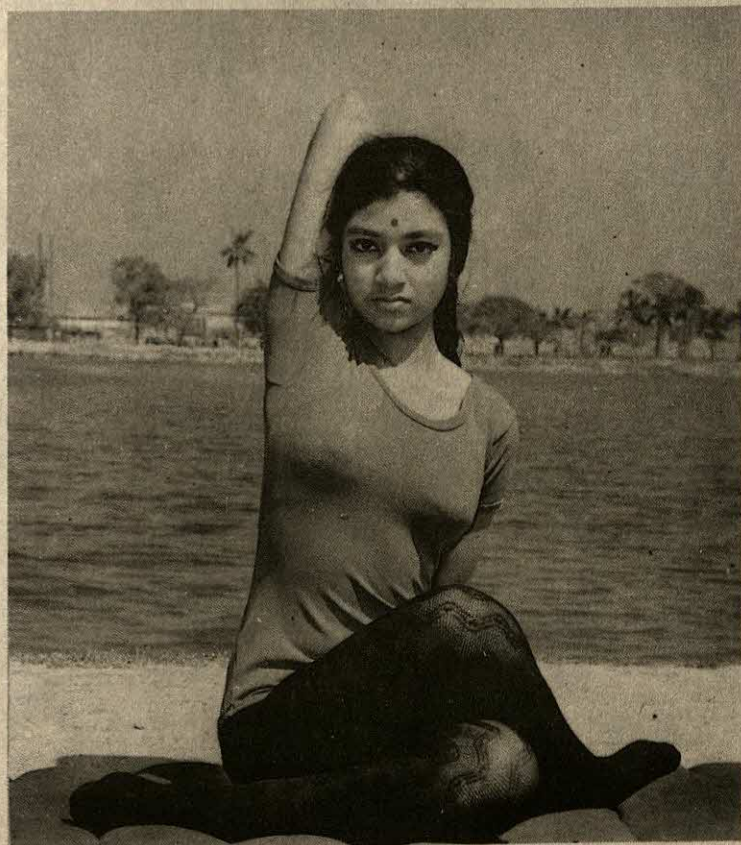
গোমুখাসন (সামনে থেকে)

চেষ্টা করবে। এখন ডান হাত মাথার উপর তোল এবং কনুইয়ের কাছ থেকে ভেঙে হাতের তালু পিঠে মেরুদণ্ডের ঠিক উপরে চিৎ করে রাখ। এবার বাঁ হাত কনুইয়ের কাছ থেকে ভেঙে পিছনদিকে নিয়ে ডান হাতের আঙুল ধর। ছবি দেখ। ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। তারপর আস্তে

আস্তে হাত-পা আল্‌গা করে বিশ্রাম নাও। হাত-পা বদল করে আসনটি ৬ বার কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

গোমুখাসন (পিছন থেকে)

উপকারিতা—গোমুখাসনে বাঁকা মেরুদণ্ড সোজা ও সরল হয়। আসনটি কুচিন্তা ও উত্তেজনা দূর করে; হাত ও পায়ের পেশী এবং স্নায়ুজাল সবল ও সক্রিয় রাখে। তাছাড়া, আসনটি অভ্যাস রাখলে কোন দিন অর্শ, মূত্রপ্রদাহ, বাত বা সায়টিকা হতে পারে না। হাত ও কাঁধের সন্ধিস্থলের ব্যায়ামের জন্য আসনটি বিশেষ কার্যকরী। আসনটি অভ্যাস রাখলে মেয়েদের সহজে কোন স্ত্রী-ব্যাধি হতে পারে না। যারা সারাজীবন অবিবাহিত থাকতে চায়, তাদের আসনটি অভ্যাস রাখা উচিত।

মণ্ডূকাসন

প্রণালী—প্রথমে বজ্রাসনে বস। এবার হাঁটু দু'টি দু'পাশে যতোটা সম্ভব ফাঁক করে বস—পাছা দু'পায়ের পাতার মাঝখানে থাকবে এবং বুড়ো আঙুল দু'টি পরস্পর
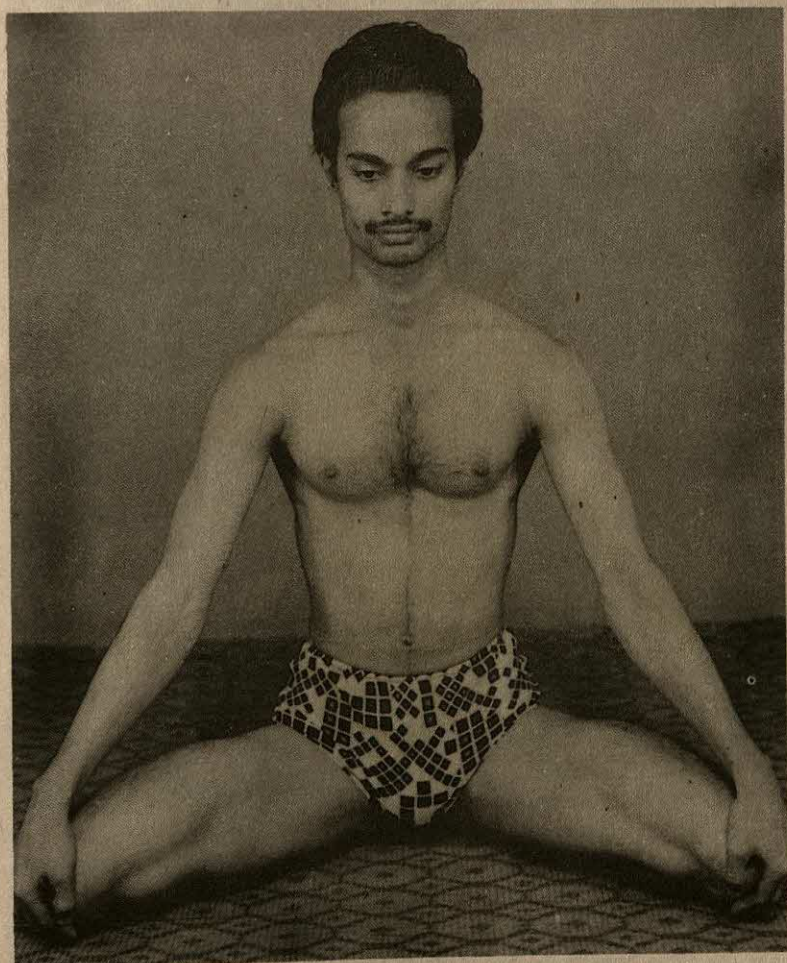
মণ্ডূকাসন—১(ক)

স্পর্শ করবে। এবার দু' হাতের তালু দু' হাঁটুর ওপর রেখে মেরুদণ্ড সোজা করে ৩০-৪০ সেকেণ্ড ঐ অবস্থায় বস। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। এইভাবে আসনটি ৩ বার কর এবং প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—এই আসনটি পায়ের শক্তি বৃদ্ধি করে পায়ের পেশী ও স্নায়ুকে সবল এবং সুস্থ রাখে। আসনটি মেয়েদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। মেয়েদের বস্তিপ্রদেশের এবং উরুর সন্ধিস্থলের পেশী ও স্নায়ু সতেজ ও সক্রিয় রাখে। ফলে

মণ্ডুকাসন—১(খ)

কোন স্ত্রী-রোগ হতে পারে না ও সন্তান প্রসবে দৈহিক কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। এতে মনের একাগ্রতা যেমন বাড়ে তেমনি হজমশক্তিও বৃদ্ধি পায়। ফলে পায়ে সায়টিকা বা বাত হ'তে পারে না—আর থাকলেও আসনটি অভ্যাসের ফলে অল্পদিনে ভালো হয়ে যায়।

হলাসন

আসন অবস্থায় দেহটি অনেকটা হল বা লাঙ্গলের মত দেখায়, তাই আসনটির নাম হলাসন।

প্রণালী—পা জোড়া করে হাত দু'টি শরীরের দু'পাশে লম্বাভাবে মেলে রেখে সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়। হাতের চেটো মাটির দিকে থাকবে। এবার হাতের উপর ভর দিয়ে পা দু'টি জোড়া ও সোজা অবস্থায় উপরে তোল এবং মাথার পিছনে যতদূর সম্ভব দূরে মেঝেতে নামাও, শুধু পায়ের পাতার উপর দিকটা ও আঙুল মেঝেতে লাগবে। থুত্নি বুক ও কণ্ঠনালীর ঠিক সংযোগস্থলে থাকবে। ছবি দেখ।

হলাসন

শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর হাতের উপর ভর রেখে আস্তে আস্তে শায়িত অবস্থায় ফিরে যাও। আসনটি ৩ বার কর এবং প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—হলাসনে কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, পেটফাঁপা প্রভৃতি পেটের যাবতীয় রোগ দূর হয়। আসনটি প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং মেরুদণ্ডের হাড়ের জোড় নমনীয় ও মজবুত করে। মেরুদণ্ড-সংলগ্ন স্নায়ু-কেন্দ্র ও মেরুদণ্ডের দু'পাশের পেশী সতেজ ও সক্রিয় হয়। থাইরয়েড্, প্যারা-থাইরয়েড্, টনসিল প্রভৃতি গ্রন্থিগুলি সবল ও সক্রিয় হয়। সন্তান প্রসবের পর বা অন্য কোন কারণে তলপেটের পেশী শিথিল হয়ে গেলে এই আসনটি অভ্যাসের ফলে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। তাছাড়া, পেট, কোমর ও নিতম্বের অপ্রয়োজনীয় মেদ কমিয়ে দেহকে সুঠাম ও সুন্দর করে গড়ে তোলে। আসনটি অভ্যাস রাখলে বহুমূত্র, বাত বা সায়াটিকা, স্ত্রী-ব্যাধি কোনদিন হতে পারে না, আর থাকলেও অল্পদিন অভ্যাসে ভালো হয়ে যায়।

নিষেধ—যাদের আমাশয় বা কোন রকম হৃদ্‌রোগ আছে, বা যাদের প্লীহা, যকৃৎ অস্বাভাবিক বড়, রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত তাদের আসনটি করা উচিত নয়। ১২ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের আসনটি করা উচিত নয়।

এই আসনটি করার পর চক্রাসন, ধনুরাসন, উষ্ট্রাসন অথবা যে কোন একটি আসন করা উচিত।

উষ্ট্রাসন

আসন অবস্থায় দেহের মধ্যভাগ উঁচু হয়ে অনেকটা উটের মত দেখায়, তাই আসনটির নাম উষ্ট্রাসন।

প্রণালী—হাঁটু ভেঙে পায়ের পাতা মুড়ে হাঁটুর উপর ভর রেখে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াও। পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত পায়ের নিম্নাংশ মাটির সঙ্গে লেগে
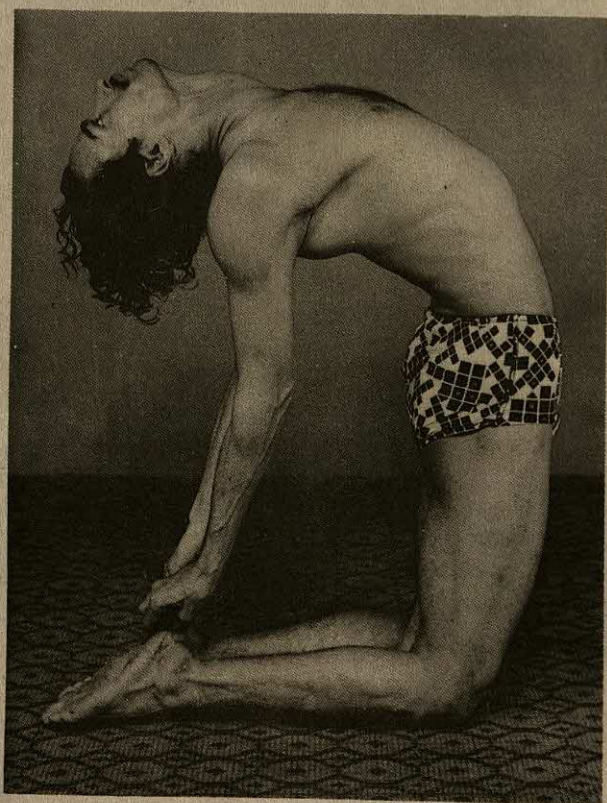
উষ্ট্রাসন—১(ক)

থাকবে। এবার দু' হাত দিয়ে দু' পায়ের গোড়ালি অথবা গোড়ালির ঠিক উপরে ধর। এখন বুক ও পেট যতটা সম্ভব উপরদিকে এবং মাথা পিছনদিকে বাঁকিয়ে ধনুকের মতো হতে হবে। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ২০ সেঃ

থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর হাত ও শরীর আলগা করে আস্তে আস্তে পূর্বাবস্থায় হাঁটুর উপর দাঁড়াও। আসনটি ৩ বার কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উষ্ট্রাসন—১(খ)

উপকারিতা—যাদের মেরুদণ্ড সামনের দিকে বাঁকা, যাদের বয়স অনুযায়ী বুকের গড়ন সরু বা অপরিণত, তাদের পক্ষে আসনটি অবশ্য করণীয়। আসনটি বিশেষভাবে মেরুদণ্ডের হাড়ের জোড় নরম ও মজবুত করে। বুকের পেশী ও পাঁজরের হাড় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। মেরুদণ্ড-সংলগ্ন স্নায়ুমণ্ডলী ও মেরুদণ্ডের দু'পাশের পেশী সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড্ ও টন্‌সিল গ্রন্থিও সুস্থ এবং সক্রিয় থাকে। পেট, কোমর এবং নিতম্বেরও খুব ভাল ব্যায়াম হয়। আসনটি অভ্যাস রাখলে সহজে কোন পেটের রোগ বা স্ত্রী-ব্যাধি হতে পারে না, দেহে শীততাপ সহ্যশক্তি বৃদ্ধি করে ও দেহের মধ্যভাগের অপ্রয়োজনীয় মেদ কমিয়ে দেহকে সুগঠিত করে।

নিষেধ—আসনটিতে বুকে প্রচণ্ড চাপ পড়ে। যাদের হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুস্ দুর্বল, রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত তাদের পক্ষে আসনটি করা উচিত নয়।

পূর্ণ-উষ্ট্রাসন

প্রণালী—প্রথমে উষ্ট্রাসনের ভঙ্গিমায় বস। এবার হাত দু'টি গোড়ালি থেকে সরিয়ে পায়ের পাতা ধর। কনুই দু'টি ভেঙে মাটিতে রাখ এবং মাথা নীচু করে দু'হাতের মাঝে মাটিতে রাখ। মাথার ব্রহ্মতালু পায়ের তলার উপর থাকবে। ২৫ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। তারপর হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে হাঁটুর উপর সোজা হয়ে বসে বিশ্রাম নাও। আসনটি ৩ বার কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

পূর্ণ-উষ্ট্রাসন
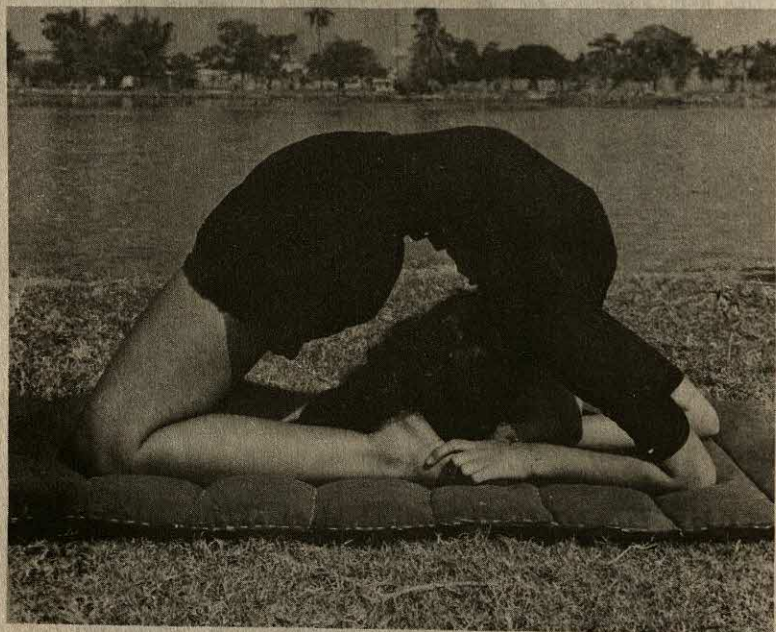
উপকারিতা—উষ্ট্রাসনের সব গুণ আসনটিতে বর্তমান। এতে আরো ভালো ও দ্রুত ফল পাওয়া যায়। আসনটি অভ্যাসের সময় দেহের মধ্যভাগে প্রচণ্ড চাপ পড়ে, ঐ অংশে অল্প সময়ে খুব ভাল ব্যায়াম হয়। বিশেষ করে বুকের খাঁচার দোষ-ত্রুটি ও কোলকুঁজো থাকতেই পারে না। এই আসনটির সঙ্গে পদহস্তাসন বা শশাঙ্গাসন অভ্যাস রাখলে বাত, সায়টিকা, স্লীপড্ ডীস্ক, লাম্বার স্পণ্ডিলোসিস্ জাতীয় রোগ কোনদিন হতে পারে না।

আকর্ণ-ধনুরাসন

প্রণালী—সামনে পা ছড়িয়ে সোজা হয়ে বস। বাঁ পা হাঁটু থেকে ভেঙে ডান উরুর উপর রাখ। ডান হাত দিয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ধর এবং বাঁ পায়ের পাতাটি ডান কানের কাছে টেনে নিয়ে এস। এবার বাঁ হাত দিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল স্পর্শ কর। ছবি দেখ। এখন কোমর থেকে শরীরের উপরাংশ একটু বাঁদিকে মোচড় দিয়ে ২৫ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ থাক। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে, তারপর হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে বিশ্রাম নাও। হাত-পা বদল করে আসনটি চার বার কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।
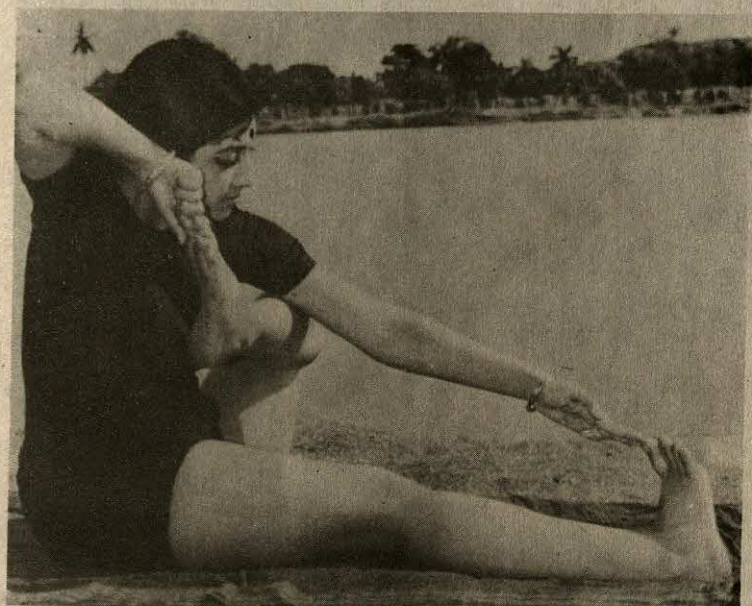
আকর্ণ-ধনুরাসন

উপকারিতা—আসনটি বিশেষ করে হাত, পা ও পিঠের দু'পাশের পেশী এবং স্নায়ুজাল সতেজ ও সক্রিয় রাখে। উরু ও কোমরের সন্ধিস্থলের নমনীয়তা অক্ষুণ্ন রাখে, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আসনটি অভ্যাস রাখলে বাত বা সায়টিকা কোনদিন হয় না, আর থাকলেও অল্পদিন অভ্যাসে ভাল হয়ে যায়।

আসনটি মেয়েদের বিশেষ উপকারী। আসনটি বস্তিপ্রদেশের ও উরুর সন্ধি-স্থলের পেশী ও স্নায়ুজাল সুস্থ ও সক্রিয় রাখে। ফলে কোন স্ত্রী-রোগ হতে পারে না এবং সন্তান প্রসবের সময় দৈহিক কোন বাধার সৃষ্টি হয় না।

ধনুরাসন

আসন অবস্থায় দেহটা অনেকটা ধনুকের মত দেখায়, তাই আসনটির নাম ধনুরাসন।

প্রণালী—সটান উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। পা দু'টি হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙে পায়ের পাতা যতদূর সম্ভব পিঠের উপর নিয়ে এস। এবার হাত দু'টি পিছনদিকে

ধনুরাসন—১(ক)

ঘুরিয়ে নিয়ে দু'হাত দিয়ে দু'পায়ের ঠিক গোড়ালির উপরে শক্ত করে ধর এবং পা দু'টি যতদূর সম্ভব মাথার দিকে টেনে আন। বুক, হাঁটু ও উরু মেঝে থেকে উঠে আসবে—শুধু পেট ও তলপেট মেঝেতে থাকবে। এবার উপরদিকে তাকাও। ছবি

দেখ। ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে, তারপর হাত-পা আলগা করে আস্তে আস্তে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। বিশ্রাম নিয়ে আসনটি তিন বার কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।
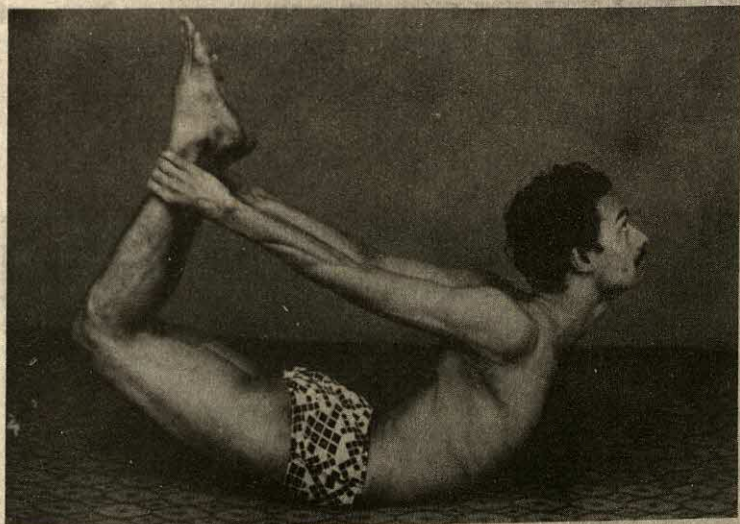
ধনুরাসন—১(খ)

উপকারিতা—আসনটি মেরুদণ্ডের হাড়ের জোড় নমনীয় রাখে। মেরুদণ্ড-সংলগ্ন স্নায়ুমণ্ডলী ও তার পাশের পেশী সতেজ ও সক্রিয় রাখে। বুকের পেশী ও পাঁজরের হাড় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং বুক সুগঠিত করে। হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তলপেটের উপর দেহের সমস্ত ভার পড়ে বলে ঐ অঞ্চলের পেশী, স্নায়ুজাল সবল ও সক্রিয় থাকে এবং পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, প্লীহা, যকৃৎ খুব ভাল কাজ করে। যাদের বুক বয়স অনুযায়ী সরু ও অপরিণত, তাদের এ আসনটি অবশ্য করা উচিত। আসনটি অভ্যাসে দেহের মধ্যভাগের অপ্রয়োজনীয় মেদ দূর হয়, মনের চঞ্চলতা দূর করে, স্বভাবে ধৈর্য বৃদ্ধি করে। কোন স্ত্রী-ব্যাধি বা পেটের রোগ সহজে আক্রমণ করতে পারে না।

ধনুরাসনের সঙ্গে পদহস্তাসন ও শশাঙ্গাসন অভ্যাস রাখলে কোনদিন লাম্বার স্পণ্ডিলোসিস্‌ বা স্লীপড্‌ ডীস্ক জাতীয় কোন রোগ হতে পারে না।

নিষেধ—যাদের হৃদ্‌যন্ত্রে বা গলদেশের ভিতরে কোন রোগ আছে, তাদের রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত আসনটি করা উচিত নয়।

পূর্ণ-ধনুরাসন

প্রণালী—প্রথমে ধনুরাসন ভঙ্গিমায় বস। এবার হাত দু'টি আস্তে আস্তে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দু'হাত দিয়ে দু'পায়ের বুড়ো আঙুল ধর। এখন পায়ের পাতা দু'টি টেনে এনে মাথার ব্রহ্মতালুর উপর রাখ। কনুই ভেঙে সামনের দিকে আসবে। ছবি দেখ। কুড়ি থেকে তিরিশ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। তারপর আস্তে আস্তে হাত-পা আলগা করে, শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে আসনটি তিন বার কর। শেষে প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।
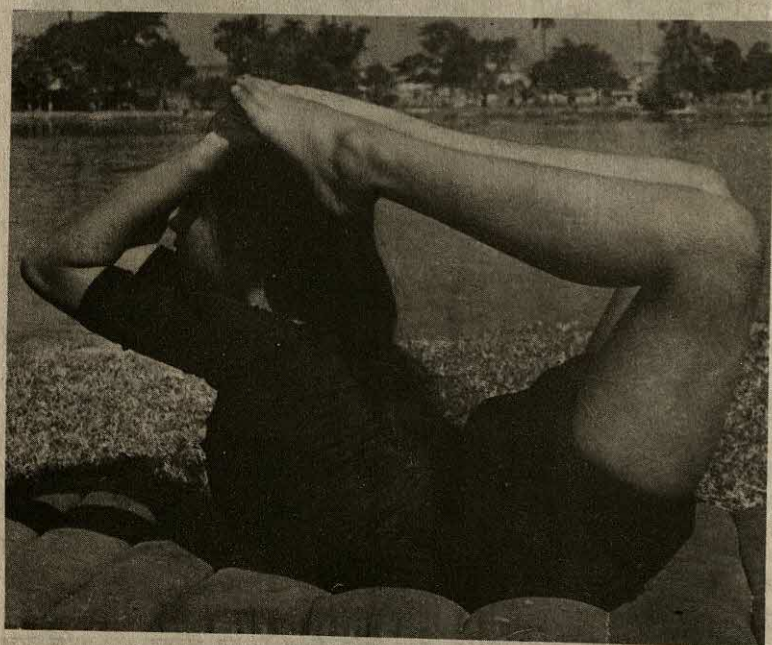
পূর্ণ-ধনুরাসন

উপকারিতা—আসনটিতে ধনুরাসনের সব উপকার আরো ভালো ও কম সময়ে পাওয়া যায়।

নিষেধ—ধনুরাসনের নিষেধ এ আসনটিতেও মেনে চলতে হবে।

শশাঙ্গাসন

এ-আসন অবস্থায় দেহটি অনেকটা শশকের মত দেখায়, তাই আসনটির নাম শশাঙ্গাসন।

প্রণালী—হাঁটু ভেঙে, পায়ের পাতা মুড়ে, গোড়ালির উপর পাছা রেখে বস। এবার পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে রেখে শরীরের উপরাংশ নীচু করে মাথা হাঁটুর সামনে মাটিতে রাখ। হাঁটু দু'টি জোড়া থাকবে এবং কপাল হাঁটুর সঙ্গে লেগে থাকবে। এখন দু'হাত দিয়ে দু'পায়ের গোড়ালি ধর। হাত দুটি সোজা

শশাঙ্গাসন

থাকবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ছবি দেখ। পঁচিশ সেঃ থেকে তিরিশ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর হাত আলগা করে আস্তে আস্তে পূর্বাবস্থায় সোজা হয়ে বস। আসনটি তিন বার কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—আসনটি মেরুদণ্ডের হাড়ের জোড় নরম ও মজবুত করে। মেরুদণ্ড-সংলগ্ন স্নায়ুমণ্ডলী ও মেরুদণ্ডের দু'পাশের পেশী সুস্থ ও সক্রিয় রাখে, কিশোর-কিশোরীদের লম্বা হতে সাহায্য করে। থাইরয়েড্, প্যারাথাইরয়েড্, টন্সিল, পিটুইটারী, পিনিয়াল প্রভৃতি গ্রন্থিগুলি সুস্থ ও সক্রিয় রাখে। মগজের শক্তি বৃদ্ধি হয়। পেট ও তলপেটে প্রচণ্ড চাপ পড়ে বলে পাকস্থলী, প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতি দেহ-যন্ত্রগুলি খুব ভাল কাজ করে। আসনটি অভ্যাস রাখলে দাঁত, কান

ও নাকে সহজে কোন রোগ হতে পারে না। তাছাড়া, হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। কোষ্ঠবদ্ধতা, পেটফাঁপা প্রভৃতি পেটের রোগ হতে পারে না। হাত এবং পায়েরও খুব ভাল ব্যায়াম হয়। কোমর ও পেটের অপ্রয়োজনীয় মেদ কমে গিয়ে দেহ সুঠাম ও সুন্দর হয়ে ওঠে। শীর্ষাসনের অনেক সুফল এই আসনটিতে পাওয়া যায়। যারা বয়স অনুযায়ী লম্বায় কম, তাদের পক্ষে আসনটি অবশ্য করণীয়। শশাঙ্গাসনের সঙ্গে ধনুরাসন অভ্যাস রাখলে বাত, সায়টিকা, লাম্বার স্পণ্ডিলোসিস্ ও স্লীপ্‌ড্ ডীস্ক জাতীয় কোন রোগ হতে পারে না।

নিষেধ—যাদের প্লীহা, যকৃৎ অত্যধিক বড় বা যাদের কোন হৃদ্‌রোগ বা হাই-ব্লাডপ্রেসার আছে, রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত তাদের পক্ষে আসনটি করা বাঞ্ছনীয় নয়।

মৎস্যাসন (ক)

আসন অবস্থায় দেহটি অনেকটা মাছের মত দেখায় তাই আসন দু'টির নাম মৎস্যাসন।
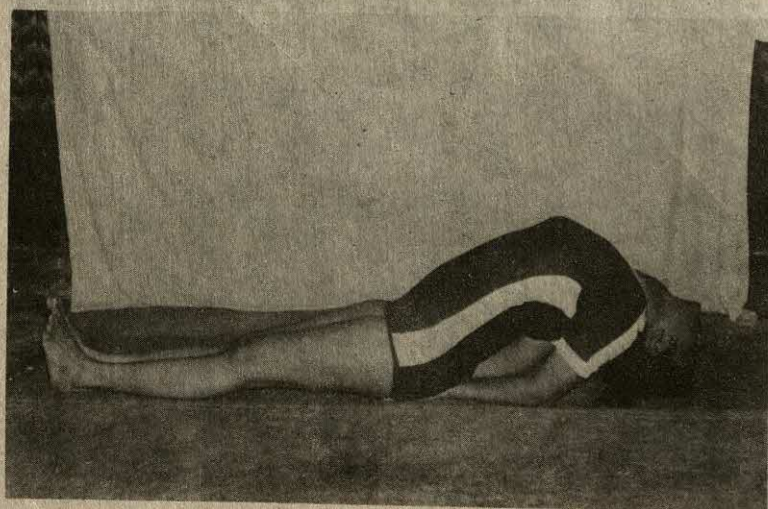
মৎস্যাসন—১(ক)

প্রণালী—সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়—পায়ের পাতা জোড়া থাকবে। হাতের তালু দু'টি চিৎ অবস্থায় পাছার নিচে রাখ। এবার হাতের উপর ভর রেখে, কোমরে চাপ দিয়ে সাধ্যমত বুক উঁচু কর এবং মাথা পিছন দিকে নিয়ে এস—সামনের দিকে তাকাও। 'ক'-ছবি দেখ। ২৫ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক তারপর আস্তে আস্তে হাতের উপর ভর রেখে পূর্বাবস্থায় এস। আসনটি ৩ বার অভ্যাস কর এবং প্রয়োজনমত শবাসনে বিশ্রাম নাও।

মৎস্যাসন (খ)

প্রণালী—প্রথমে পদ্মাসনে বস। এখন পা দু'টি পদ্মাসনে রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়। এবার হাত দু'টি মাথার দু'পাশে রেখে চাপ দিয়ে কাঁধ, পিঠ, কোমর মেঝে থেকে তুলে ঠিক ধনুকের মতো কর। মাথার শুধু ব্রহ্মতালু মেঝেতে থাকবে।

মৎস্যাসন—১(খ)

এবার ডান হাত দিয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ও বাঁ হাত দিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল ধর। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। পঁচিশ সেঃ থেকে তিরিশ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। আসন ছাড়ার সময় একটু সাবধান হতে হবে। তাড়াতাড়ি করতে গেলে ঘাড়ে চোট্ লাগতে পারে। প্রথমে হাত আল্‌গা কর। হাতের তালু বা কনুই মেঝেতে রাখ। এখন হাতের উপর জোর রেখে মাথা সোজা কর এবং মাথা, কাঁধ, পিঠ ও কোমর মেঝেতে রাখ। এবার পা আল্‌গা করে ছড়িয়ে দাও। বিশ্রাম নিয়ে হাত-পা বদল করে আসনটি চার বার কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—আসন দু'টি অভ্যাসে থাইরয়েড্, প্যারাথাইরয়েড্, টনসিল, থাইমাস প্রভৃতি গ্রন্থির খুব ভাল কাজ হয়। যাদের হাঁপানি, সর্দিকাশির ধাত, ব্রঙ্কাইটিস, টনসিলের দোষ আছে, তাদের এ-আসন অবশ্য করা উচিত। এ-আসন মাথাধরা, অনিদ্রা, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা রোগ দূর করে। আসনটির সঙ্গে শশাঙ্গাসন বা পদ-হস্তাসন অভ্যাস রাখলে স্লীপ্‌ড্ ডীস্ক, লাম্বার স্পণ্ডিলোসিস্ জাতীয় রোগ কোন-

দিন হতে পারে না। তাছাড়া, যাদের বুকের খাঁচার কোন দোষ-ত্রুটী থাকে, আসনটি তাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তর্মুখী রস ক্ষরণে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই রস ক্ষরণ যদি প্রয়োজনমতো না হয়, তবে দেহের ক্যালসিয়াম জীর্ণ হয়ে দেহের কাজে আসে না ; ফলে, শরীরে ক্যালসিয়াম ঘাট্‌তি দেখা দেয়। তাছাড়া প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তঃক্ষরণ কম হলে খাদ্যবস্তু হজম হয় না, ফলে অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, পেটফাঁপা প্রভৃতি নানারকম পেটের রোগ দেখা দেয়। ক্যালসিয়ামের অভাবে দাঁতও দুর্বল হয়ে যায়। এ্যাপেণ্ডিসাইটিস, পিত্তশূল প্রভৃতি কঠিন রোগও দেখা দিতে পারে। নানা রকম চর্মরোগ হয়। আবার এই গ্রন্থির অতিরিক্ত অন্তঃক্ষরণে রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগ হয়। তাই এই আসনটি অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সর্বাংগাসন করা উচিত। দু'টি আসন পরস্পরের পরিপূরক। আসনটিতে দেহের সব জায়গায় কম-বেশী ব্যায়াম হয়। তাছাড়া আসন দু'টির ভঙ্গিমায় ঘাড়, কাঁধ, গলা, হাত-পা, বুক, পেট, বস্তি-প্রদেশ, নিতম্ব, কোমর, মেরুদণ্ড ও মেরুদণ্ডের দু'-পাশের পেশী ও স্নায়ুজালের খুব ভাল ব্যায়াম হয়, বুকের গড়ন সুঠাম ও সুন্দর হয়—বুকের খাঁচার দোষ-ত্রুটি থাকলে ভঙ্গিমা দুটি অভ্যাসে অল্প দিনে ঠিক হয়ে যায়।

ভেকাসন

প্রণালী—পা ছড়িয়ে সোজা হ'য়ে বস এবং উরুর মধ্য দিয়ে দু'হাতের তালু মেঝেতে রাখ—হাতের আঙুল সামনের দিকে থাকবে। এবার হাঁটু ভেঙে দু'পায়ের
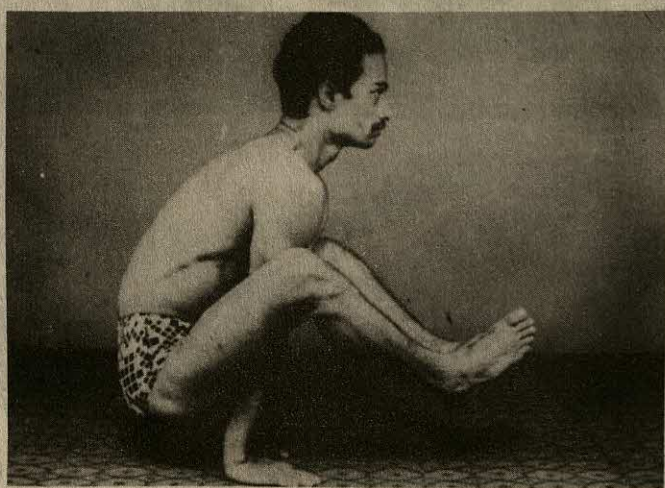
ভেকাসন

তালু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত রেখে হাতের তালুর উপর ভর রেখে ধীরে ধীরে পাছা সমেত পা দু'টি যতোটা সম্ভব উপরে তোল। ছবি দেখ। এইভাবে কুড়ি থেকে তিরিশ সেকেণ্ড থাকবার চেষ্টা কর। এ সময় শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। এরপর বিশ্রাম নিয়ে আসনটি তিন বার কর। অভ্যাসের পর প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—আসনটিতে দেহের কম-বেশী সকল অংশের উপকার হয়। বিশেষ ক'রে এতে হাতের শক্তি বাড়ে এবং দেহের কোন অংশে বাত বা সায়টিকা রোগ হ'তে পারে না। যদি এ ধরনের রোগ থাকে, তাহলে আসনটি অভ্যাসের ফলে, তা নিরাময় হয়ে যায়।

সুপ্ত-ভেকাসন

ভেক বা ব্যাঙ সুপ্ত-অবস্থায় এইভাবে থাকে তাই আসনটির নাম সুপ্ত-ভেকাসন।

প্রণালী—বজ্রাসনে বসে সামনের দিকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। মাথা সামান্য উঁচু কর। হাত দু'টি দেহের দু'পাশে থাকবে। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক। ৩০ থেকে ৪০ সেঃ ঐ অবস্থায় থেকে পা সোজা করে উপুড় হয়ে শবাসনে বিশ্রাম নিয়ে আসনটি ৩ বার অভ্যাস কর।
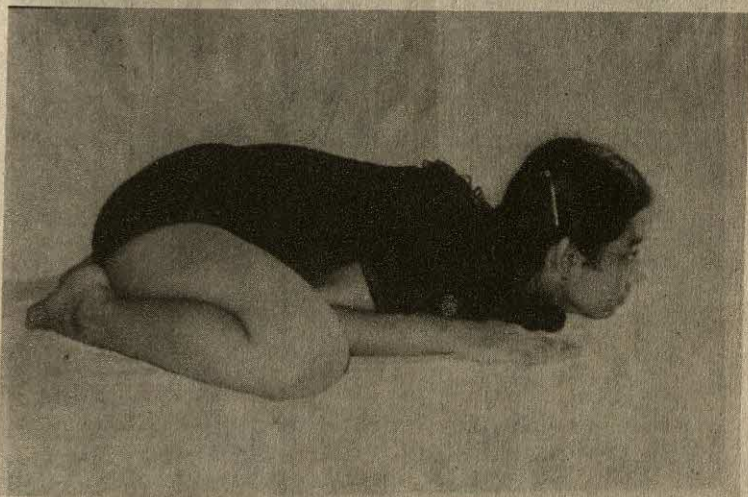
সুপ্ত-ভেকাসন

উপকারিতা—আসনটিতে বাত, সায়াটিকা দূর করে, উরুর সন্ধিস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে, আসন অভ্যাস রাখলে সন্তান প্রসবকালে কোন অসুবিধা হয় না—তাছাড়া পেট বা তলপেটে মেদ জমতে পারে না। শ্বাস ধীর গতিতে চলে—ফলে ফুসফুস কিছুটা বিশ্রাম পায়।

অর্ধ-চন্দ্রাসন

আসন অবস্থায় দেহটি অনেকটা আধখানা চাঁদের মত দেখায়, তাই আসনটির নাম অর্ধ-চন্দ্রাসন।

প্রণালী—পা দু'টি জোড়া করে, সোজা হয়ে দাঁড়াও। হাত দু'টি নমস্কারের ভঙ্গিতে জোড় করে মাথার উপর তোল। হাত কানের সঙ্গে লেগে থাকবে, এবার শরীরের উপরাংশ যতদূর পারো পিছনদিকে বাঁকিয়ে নিয়ে যাও। গোড়ালি থেকে কোমর পর্যন্ত সোজা থাকবে—হাঁটু যেন না ভাঙে। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস

অর্ধ-চন্দ্রাসন

স্বাভাবিক থাকবে। কুড়ি সেঃ থেকে তিরিশ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়াও। হাত নামিয়ে বিশ্রাম নিয়ে আসনটি চার বার কর। প্রয়োজন মনে করলে শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—আসনটি বিশেষভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, জঠরাগ্নি বৃদ্ধি করে। প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতি পেটের দেহ-যন্ত্রগুলিকে সক্রিয় রাখে। আসনটিতে এড্রিনাল গ্রন্থির খুব ভাল কাজ হয়। দেহের সমস্ত স্নায়ুজাল সুস্থ ও সক্রিয় থাকে, মেরুদণ্ড নমনীয় হয়। অর্ধ-চন্দ্রাসনের সঙ্গে পদহস্তাসন বা শশাঙ্গাসন

অভ্যাস রাখলে বাত, সায়টিকা, লাম্বার স্পণ্ডিলোসিস্, স্লীপ্ড্ ডীস্ক জাতীয় রোগ কোন দিন হতে পারে না। তাছাড়া, আসনটি বুকের খাঁচার দোষ-ত্রুটি দূর করে। মেরুদণ্ড-সংলগ্ন স্নায়ুমণ্ডলী ও পিঠের দু'পাশের পেশী সুস্থ ও সক্রিয় রাখে। পেট ও কোমরের অপ্রয়োজনীয় মেদ কমিয়ে দেহকে সুঠাম ও সুন্দর করে।

চন্দ্রাসন

আসন অবস্থায় দেহটি অনেকটা চাঁদের মত দেখায়, তাই আসনটির নাম চন্দ্রাসন।

১ম প্রণালী—পায়ের পাতা মুড়ে, হাঁটু ভেঙে, হাঁটুর উপর দাঁড়াও। এবার হাত কনুই থেকে ভেঙে দু'হাত দিয়ে দু'হাতের কনুই ধরে বুকের উপর রাখ। এখন দেহটি পিছনদিকে বাঁকিয়ে মাথা গোড়ালির দিকে নিয়ে এস এবং সামনের দিকে তাকাও। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। কুড়ি সেঃ থেকে তিরিশ সেঃ ঐ

চন্দ্রাসন ১ম প্রণালী

অবস্থায় থাক। পরে আস্তে আস্তে উঠে হাত আল্গা করে বসে বিশ্রাম নিয়ে আসনটি তিন বার কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—এ-আসনে উষ্ট্রাসন ও চক্রাসনের সব গুণ বর্তমান।

নিষেধ—উষ্ট্রাসনের নিষেধগুলি এই আসনটিতেও মেনে চলতে হবে।

২য় প্রণালী—পা দু'টি জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াও। হাত কনুই থেকে ভেঙে দু'হাত দিয়ে দু' কনুই ধরে বুকের উপর রাখ। এখন দেহের উপরাংশ পিছনদিকে বাঁকিয়ে গোড়ালির ঠিক উপরে নিয়ে এস। মাথার তালু গোড়ালি থেকে ১½ ফুট মতো উঁচুতে থাকবে। কিছুদিন অভ্যাসের পর মাথা আরও নীচু করবে, কিন্তু মেঝেতে লাগবে না। ঐ অবস্থায় কুঁড়ি সেঃ থেকে তিরিশ সেঃ থাক। তারপর আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়াও। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে।
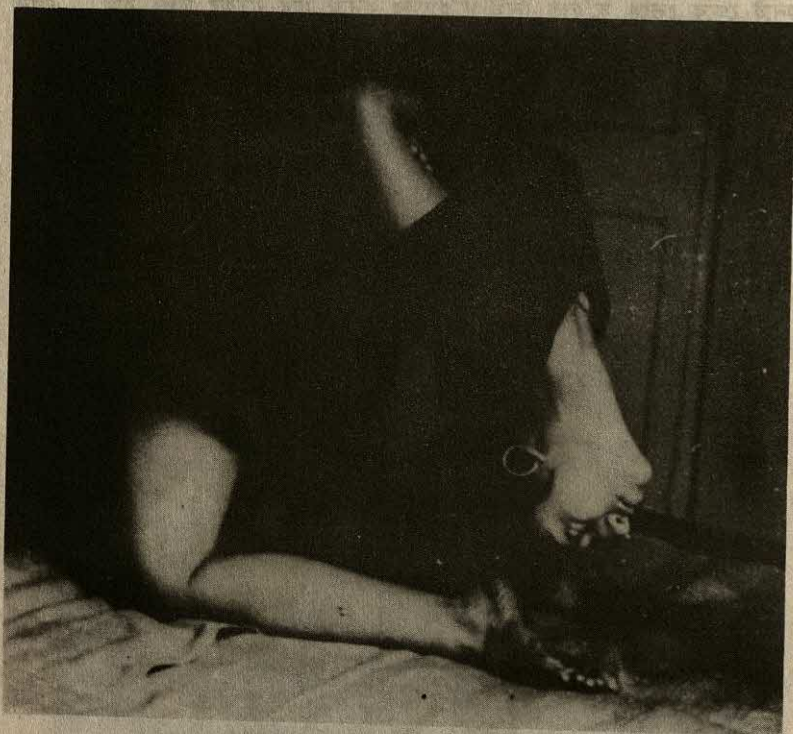
চন্দ্রাসন ২য় প্রণালী

অর্ধ-চন্দ্রাসন বা চন্দ্রাসন করার পর পদ-হস্তাসন অবশ্য করা উচিত। পদ-হস্তাসনে মেরুদণ্ড সামনের দিকে আর অর্ধ-চন্দ্রাসন বা চন্দ্রাসনে মেরুদণ্ড পিছন-দিকে বেঁকে যায়। অর্ধ-চন্দ্রাসন বা চন্দ্রাসনে যে কোন একটির সঙ্গে পদ-হস্তাসন অভ্যাস রাখলে মেরুদণ্ড সহজ ও নমনীয় থাকে।

উপকারিতা—আসনটিতে দেহের সব অংশের ব্যায়াম হয়, বিশেষভাবে ঘাড়, গলা, বুক, পেট, তলপেট, বস্তিপ্রদেশ, নিতম্ব, কোমর ও মেরুদণ্ডের খুব ভাল কাজ হয়। তাছাড়া, উষ্ট্রাসনের সব গুণ আসনটিতে বর্তমান।

পদ-হস্তাসন

প্রণালী—পা দু'টি জোড়া করে এবং হাত দু'টি মাথার উপর তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াও। এবার পায়ের গোড়ালি থেকে কোমর পর্যন্ত সোজা রেখে দেহের উপরাংশ নীচু করে দু'হাত দিয়ে দু'পায়ের গোড়ালির ঠিক উপরে ধর। মাথা হাঁটুতে এবং

পদ-হস্তাসন—১(ক)

বুক ও পেট ঊরুর সঙ্গে লাগাতে চেষ্টা করবে। হাঁটু যেন না ভাঙে। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। কুড়ি সেঃ থেকে তিরিশ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর হাত আল্‌গা করে আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়াও। হাত ঝুলিয়ে বিশ্রাম নিয়ে আসনটি তিন বার কর।

প্রথমে দু'একদিন হয়ত হাঁটু, বুক, পেট ঠিক জায়গায় যাবে না অথবা হাঁটু একটু বেঁকে যাবে ; কোন রকম ঝাঁকুনি দিয়ে বা জোর করে ঠিক করার চেষ্টা করবে না।

পদ-হস্তাসন—১(খ)

কোমরে বা মেরুদণ্ডে চোট্ লাগতে পারে। দু'চার দিন অভ্যাসের পর ঠিক হয়ে যাবে।

উপকারিতা—আসনটি অভ্যাস রাখলে মেরুদণ্ড সহজ ও নমনীয় থাকে, দেহের অসমতা দূর করে অর্থাৎ, দেহের উপরাংশ বা নিম্নাংশ ছোট অথবা বড় থাকলে ঠিক হয়ে যায়। প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতি সক্রিয় থাকে। অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা পেটফাঁপা প্রভৃতি পেটের রোগ হতে পারে না। রক্তাল্পতা রোগ দূর করতে সাহায্য করে এবং কিশোর-কিশোরীদের লম্বা হতে সাহায্য করে। আসনটিতে দেহের সব অংশের কম-বেশী ব্যায়াম হয়। ফলে, দেহের সমস্ত শিরা, উপশিরা, ধমনী, স্নায়ু ও পেশী সুস্থ ও সক্রিয় থাকে। পেট, কোমর ও নিতম্বের অপ্রয়োজনীয় মেদ কমিয়ে দেহকে সুঠাম ও সুন্দর করে তোলে।

দেহে কোন রকম বাত বা সায়টিকা আক্রমণ করতে পারে না—কোন স্ত্রী-ব্যাধিও হতে পারে না, আর থাকলেও অল্পদিন অভ্যাসে ভাল হয়ে যায়।

নিষেধ—যাদের প্লীহা, যকৃৎ অস্বাভাবিক বড় বা যাদের কোন হৃদ্‌রোগ আছে, রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত তাদের আসনটি করা উচিত নয়।

অর্ধ-চক্রাসন

আসন অবস্থায় দেহটি আধখানা চাকার মত দেখায়, তাই আসনটির নাম অর্ধ-চক্রাসন।

অর্ধ-চক্রাসন

প্রণালী—সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়। এবার পা দু'টি একটু ফাঁক করে, হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙে গোড়ালি পাছার কাছে রাখ। এখন হাত দু'টি কনুইয়ের কাছ থেকে ভেঙে, হাতের তালু উপুড় করে দু' পাশের মাটিতে রাখ। এবার হাত ও পায়ের উপর জোর দিয়ে মাথা, পিঠ ও কোমর সাধ্যমত উপরে তোল। ঠিক ধনুকের

মত হবে। মাথা যতদূর সম্ভব পিছনদিকে নিয়ে এস। হাত সোজা হয়ে থাকবে। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। কুড়ি সেঃ থেকে পঞ্চাশ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর হাতের উপর ভর রেখে মাথা আস্তে আস্তে মাটিতে এনে চিৎ হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নাও। আসনটি তিন বার কর। শবাসনে প্রয়োজনমতো বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—অর্ধ-চন্দ্রাসনের সব গুণ আসনটিতে বর্তমান। এতে আরো ভালো ও দ্রুত ফল পাওয়া যায়। তাছাড়া, শরীরের কোন অংশে বাত ও সায়াটিকা হতে পারে না।

চক্রাসন

প্রণালী—প্রথমে অর্ধ-চক্রাসনের ভঙ্গিমায় এস। তারপর হাত দুটি আস্তে আস্তে সরিয়ে এনে দু'পায়ের গোড়ালির কাছে রাখ অথবা গোড়ালি দু'টি ধর। মাথা
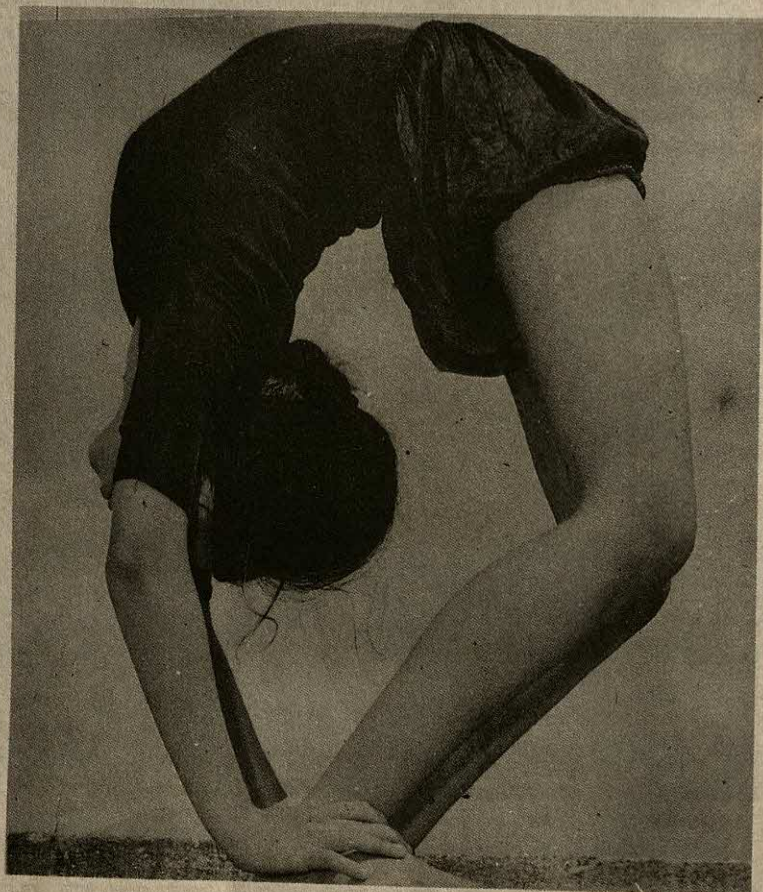
চক্রাসন

যতদূর সম্ভব পিছনদিকে বাঁকিয়ে নিয়ে যাও। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। কুড়ি সেঃ থেকে তিরিশ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর আস্তে আস্তে

মাথা মাটিতে নামিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়। বিশ্রাম নিয়ে আসনটি তিন বার কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—চন্দ্রাসন ও পূর্ণ-উষ্ট্রাসনের প্রায় সব গুণ আসনটিতে পাওয়া যায়।

নিষেধ—চন্দ্রাসন ও পূর্ণ-উষ্ট্রাসনের সব বিধি-নিষেধ এই আসনটিতেও মেনে চলতে হবে।

সর্বাংগাসন

আসনটি অভ্যাসে শরীরের সব অংশের উপর কম-বেশী প্রভাব পড়ে, তাই আসনটির নাম সর্বাংগাসন।
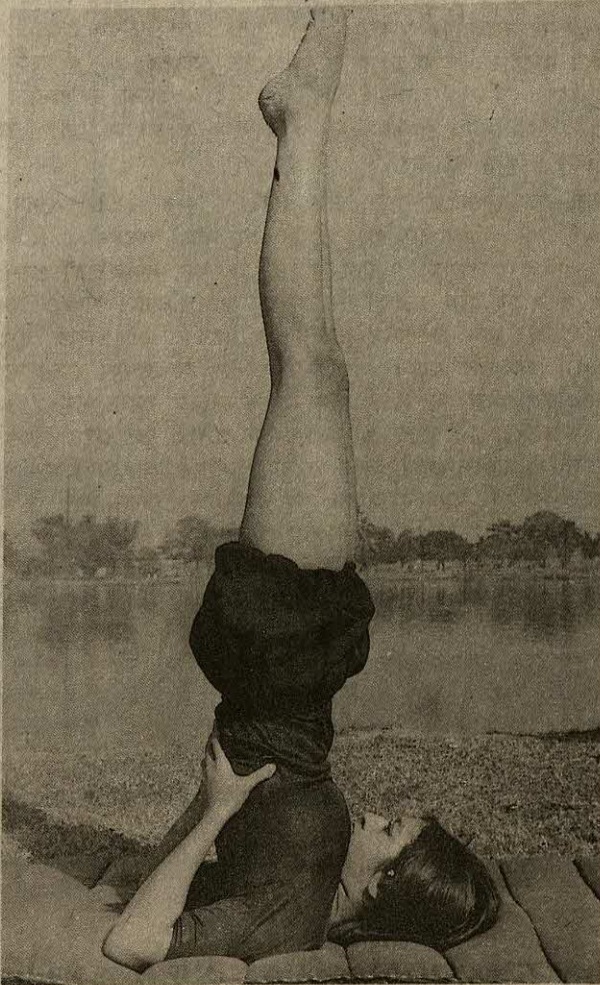
সর্বাংগাসন

প্রণালী—সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়। পা দু'টি জোড়া থাকবে এবং পায়ের আঙুলগুলি উপর দিকে থাকবে। হাত দু'টি পাঁজরের দু'পাশে মাটিতে রাখ। এখন হাতের উপর ভর দিয়ে পা জোড়া ও সোজা অবস্থায় যতদূর পারো উপরে তোল। এবার হাত দু'টি কনুইয়ের কাছ থেকে ভেঙে কোমরের দু'পাশে ধর এবং কনুইয়ের উপরে জোর দিয়ে কোমর ও পা সোজা অবস্থায় উপরে তুলে নিয়ে এস। পায়ের বুড়ো আঙুল ঠিক মাথা বরাবর উপরে থাকবে ; কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত দেহটি ঠিক ৯০° ডিগ্রীতে আসবে। কনুইয়ের উপর জোর রেখে হাত দিয়ে দেহটি উপর-দিকে ঠেলে রাখবে। চিবুক বুক ও কণ্ঠনালীর সংযোগস্থলে লাগবে। কনুই থেকে হাতের উপরাংশ, কাঁধ, ঘাড় ও মাথার পিছনদিকটা শুধু মাটিতে থাকবে। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। কুড়ি সেঃ থেকে তিরিশ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর কনুইয়ের উপর জোর রেখে আস্তে আস্তে পা নামিয়ে শবাসনে প্রয়োজনমতো বিশ্রাম নাও। আসনটি তিন বার কর। অবশ্য ভালোভাবে অভ্যস্ত হ'য়ে গেলে প্রথমবারে মিনিট খানেক সময় নিয়ে আসনটি অভ্যাস করলে, আর তিন বার ধ'রে করবার দরকার হয় না।

উপকারিতা—যোগশাস্ত্রমতে আসনটিতে সর্বরোগ দূর হয়। আসন অবস্থায় রক্তবাহী ধমনী, শিরা, উপশিরা বিপরীতমুখী হয় বলে গলদেশ ও মস্তিষ্ক রক্তে প্লাবিত হয়। ফলে থাইরয়েড্, প্যারাথাইরয়েড্, টন্‌সিল, স্যালিভারী প্রভৃতি গ্রন্থি-গুলি সতেজ ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। পিটুইটারী ও পিনিয়াল গ্রন্থিও বিশুদ্ধ রক্ত থেকে তাদের পুষ্টির জন্য উপাদান সংগ্রহ করতে পারে। এই গ্রন্থিগুলি দেহরক্ষার অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলি করে। থাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তঃস্রাবী রসের সঙ্গে অতি দরকারী আইওডিন থাকে, যা রক্তের সঙ্গে মিশে দেহের সমস্ত স্নায়ু ও গ্রন্থিকে সুস্থ ও সক্রিয় রাখে। থাইরয়েড্ গ্রন্থিকে যৌবন গ্রন্থিও বলা যেতে পারে। কারণ এই গ্রন্থিটি সক্রিয় থাকলে দেহে জরা ও ব্যাধি সহজে আক্রমণ করতে পারে না। যৌবনকে অটুট রাখতে আসনটি অদ্বিতীয়। আমাদের দেহে হৃৎপিণ্ড মস্তিষ্কের নীচে থাকায় মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে হৃৎপিণ্ডকে মস্তিষ্কে রক্ত পাঠাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। সর্বাংগাসন অবস্থায় মস্তিষ্ক হৃৎপিণ্ডের নীচে চলে আসে। ফলে হৃৎপিণ্ডের মস্তিষ্কে রক্ত পাঠাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় না, কিছুক্ষণ এই পরিশ্রম থেকে রেহাই পায়। ফলে তারও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া আসনটি জঠরাগ্নি বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ দূর করে, প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতিকে সক্রিয় রাখে। টন্‌সিলের দোষ কোনদিন হয় না। সর্বাংগাসন অভ্যাসকারিণীদের কোন স্ত্রী-ব্যাধি হতে পারে না—এমন কি স্থানচ্যুত জরায়ু ঠিক জায়গায় ফিরে আসে।

নিষেধ—হৃদ্‌রোগীদের এবং বার-তের বছরের কম বয়সের ছেলে-মেয়েদের আসনটি করা উচিত নয়।

বদ্ধ-সর্বাংগাসন

প্রণালী—প্রথমে সর্বাংগাসন কর। তারপর পা দু'টি হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙে পদ্মাসনের ভঙ্গিমায় নিয়ে এস। ছবি দেখ। কুড়ি সেঃ থেকে তিরিশ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। তারপর পা আল্‌গা করে আস্তে

আস্তে পা নামিয়ে, শুয়ে বিশ্রাম নাও। আসনটি তিন বার কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।
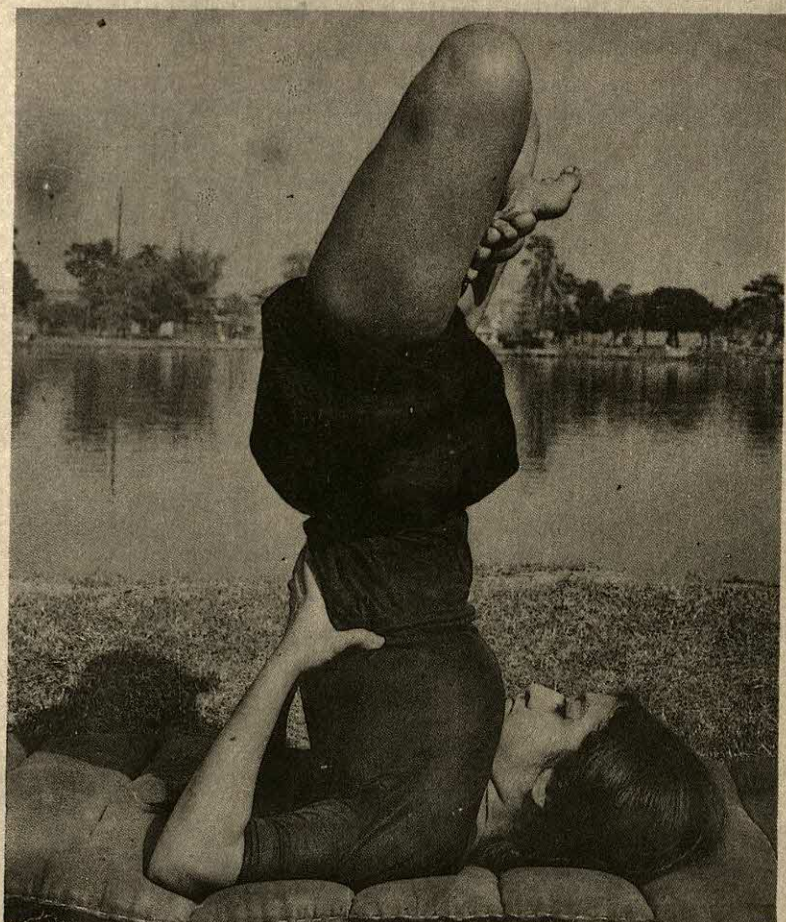
বদ্ধ-সর্বাংগাসন

উপকারিতা—সর্বাংগাসনের সব গুণ আসনটিতে বর্তমান। অধিকন্তু পায়ের খুব ভাল ব্যায়াম হয়।

নিষেধ—সর্বাংগাসনের নিষেধগুলি বদ্ধ-সর্বাংগাসনেও মেনে চলতে হবে।

পূর্ণ-বদ্ধ-সর্বাংগাসন

প্রণালী—প্রথমে সর্বাংগাসন এবং পরে বদ্ধ-সর্বাংগাসনে এস। এবার হাত দু'টি কোমর থেকে নামিয়ে নিয়ে সুপ্ত বজ্রাসনের ভঙ্গিমায় মাথার পিছনদিকে মেঝেতে

রাখ। এখন পা দু'টি পদ্মাসনে রেখে কপালের উপর অথবা মাথার পিছনে হাতের উপর নামিয়ে দাও। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। কুড়ি সেঃ থেকে তিরিশ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর আস্তে আস্তে প্রথমে বন্ধ-সর্বাংগাসনে, পরে সর্বাংগাসনে ফিরে যাও। পা নামিয়ে, হাত আলগা করে শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে আসনটি তিন বার কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।
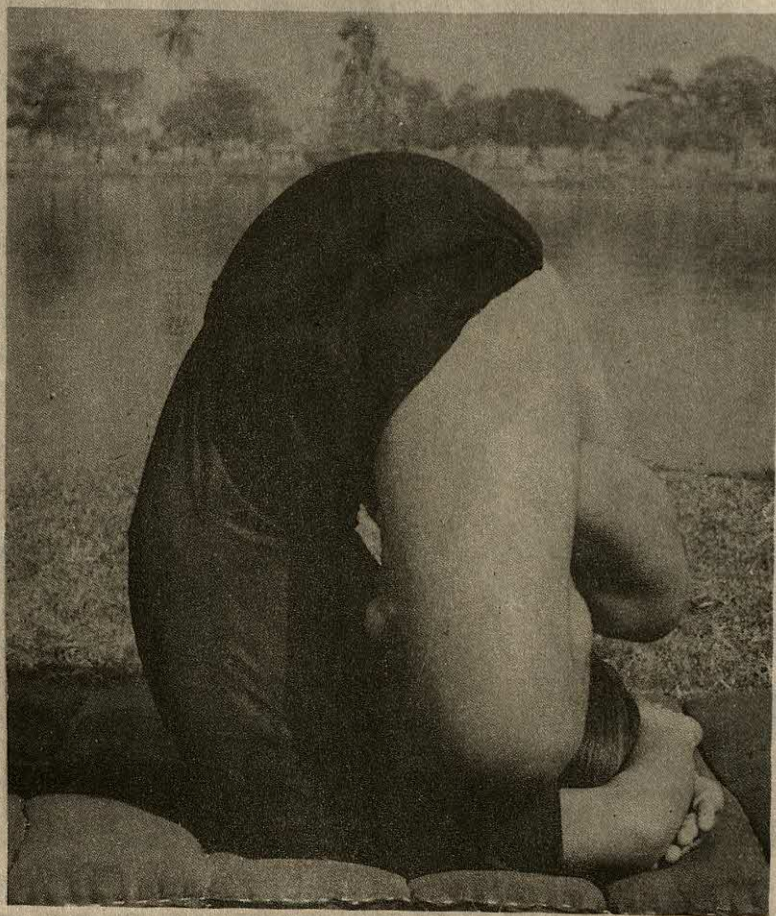
পূর্ণ-বন্ধ-সর্বাংগাসন

উপকারিতা—সর্বাংগাসন ও বন্ধ-সর্বাংগাসনের সবগুণ আসনটিতে বর্তমান। অধিকন্তু দেহের মধ্যভাগের খুব ভাল ব্যায়াম হয়। প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি পেটের রোগ হতে পারে না। মেরুদণ্ডের হাড়ের জোড় নমনীয় ও মজবুত করে। মেরুদণ্ড-সংলগ্ন স্নায়ুকেন্দ্র-গুলি ও মেরুদণ্ডের পেশী সুস্থ ও সক্রিয় রাখে। পেট, পিঠ, কোমর, নিতম্ব ও

পায়ের পেশী ও স্নায়ুজাল সতেজ ও সক্রিয় রাখে। ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃৎপিণ্ডের কর্ম-ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কিশোর-কিশোরীদের লম্বা হতে সাহায্য করে। শরীরের কোন অংশে বাত বা সায়াটিকা হতে পারে না। কোন স্ত্রী-ব্যাধি সহজে হতে পারে না, আর থাকলেও অল্পদিনের অভ্যাসে ভাল হয়ে যায়। দেহের মধ্যভাগের অপ্রয়োজনীয় মেদ কমিয়ে দেহকে সুঠাম ও সুন্দর করে তোলে।

এই আসনটির সঙ্গে ধনুরাসন, পূর্ণ-ধনুরাসন, উষ্ট্রাসন, পূর্ণ-উষ্ট্রাসন অভ্যাস রাখলে দেহে কোনদিন বাত বা সায়াটিকা, লাম্বার স্পণ্ডিলোসিস ও স্লীপড্‌ ডীস্ক জাতীয় রোগ হতে পারে না।

নিষেধ—যাদের প্লীহা ও যকৃৎ অত্যধিক বড়, যাদের কোন রকম হৃদ্‌রোগ আছে, রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই আসনটি করা উচিত নয়। ১২/১৩ বছরের কম বয়সের ছেলে-মেয়েদের এ-আসন করা বাঞ্ছনীয় নয়।

ব্যাঘ্রাসন

আসনটি অভ্যাসে শরীরে বাঘের মত ক্ষিপ্রতা আসে, তাই আসনটির নাম ব্যাঘ্রাসন।

প্রণালী—হাঁটু গেড়ে শুধু পায়ের আঙুলগুলি মেঝেতে রেখে বস। এবার কনুই

ব্যাঘ্রাসন

ভেঙে হাতের চেটো উপুড় করে মেঝেতে রাখ। হাতের চেটো থেকে কনুই পর্যন্ত মেঝেতে থাকবে। এখন হাতের চেটো ও কনুইয়ে ভর দিয়ে হাঁটু উঁচু করে, পায়ের আঙুল দিয়ে মেঝেতে সামান্য একটু ঠেলা দিয়ে পা দু'টি জোড়া অবস্থায় সোজা উপরে তুলে দাও এবং মাথার একটু পিছনদিকে নিয়ে এস। হাঁটু যেন না ভেঙে

যায়। মাথা একটু উপরে তোল। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর আস্তে আস্তে পা মেঝেতে নামিয়ে নিয়ে এস। শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে আসনটি ৩ বার কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—এ-আসনটিতে শীর্ষাসনের প্রায় সবগুণ পাওয়া যায়। অধিকন্তু হাত, পা, বুক, মেরুদণ্ড, পিঠ এবং দেহের মধ্যভাগেরও খুব ভাল ব্যায়াম হয়। পেটে ও কোমরে অপ্রয়োজনীয় মেদ জমতে পারে না। এই আসনে দেহ খুব হাল্‌কা হয় এবং দেহের ক্ষিপ্রতা বাড়ে, বিশেষ করে হাতে প্রচণ্ড শক্তি বৃদ্ধি করে।

৯-কারাসন (ক) ও (খ)

আসন অবস্থায় দেহটি অনেকটা ৯-কারের মত দেখায়, তাই আসনটির নাম ৯-কারাসন।
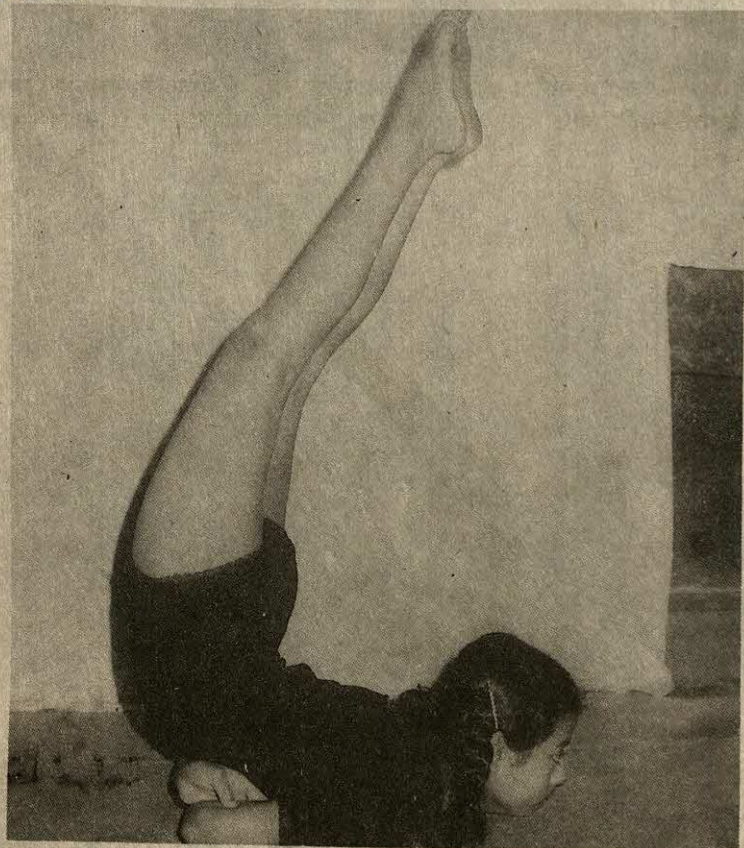
৯-কারাসন—১(ক)

প্রণালী—আসনটি প্রথম অবস্থায় অনেকটা শল্‌ভাসনের মত। তবে শল্‌ভাসনের মত হাত দু'টি শরীরের দু'পাশে না রেখে, কনুই থেকে ভেঙে দু'হাত দিয়ে দু' কনুই দৃঢ়ভাবে ধরে, বুকের ঠিক নীচে পেটের কাছে রাখ। এবার হাত ও বুকের উপর ভর দিয়ে, পা দু'টি জোড়া ও সোজা অবস্থায় প্রথমে শল্‌ভাসন-এর ভঙ্গিমায় ও পরে আরো উপরে তুলে মাথা বরাবর অথবা পিছনে নিয়ে এস। ক ও খ-এর ছবি দেখ। গোড়ালি একটু মাথার পিছনে এলে ভাল হয়। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। কুড়ি সেঃ থেকে তিরিশ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর বুক ও হাতে ভর রেখে আস্তে আস্তে পা মেঝেতে রাখ। শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে আসনটি তিন বার অভ্যাস কর। তারপর শবাসনে বিশ্রাম নাও।
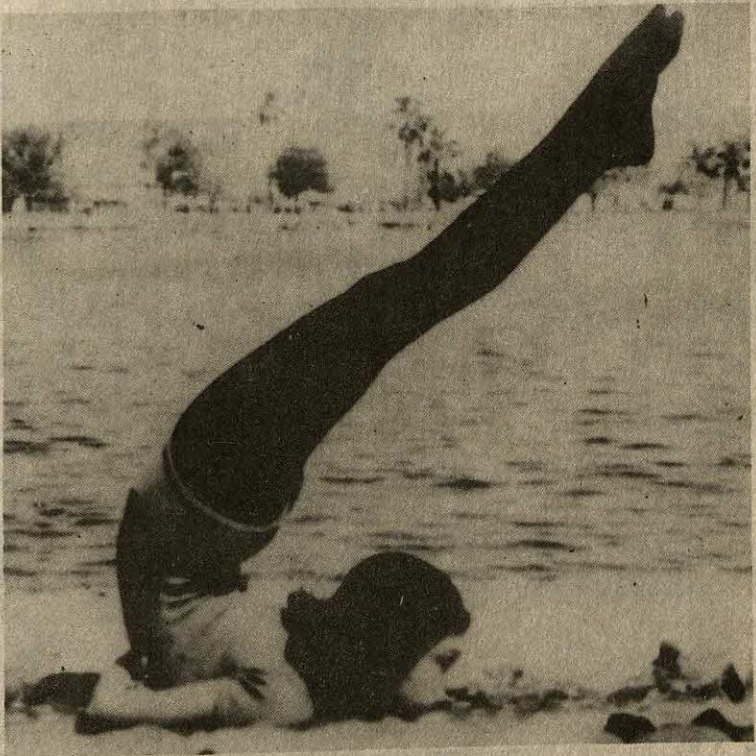
৯-কারাসন—১(খ)

উপকারিতা—শল্‌ভাসনের প্রায় সবগুণই এ-আসনটিতে বর্তমান। অধিকন্তু আসনাবস্থায় শরীরের মধ্য অংশে (যথা—পেট, তলপেট, কোমর ও নিতম্বে) প্রচন্ড চাপ পড়ে। ফলে দেহের ঐ সব অঞ্চলের খুব ভাল ব্যায়াম হয়। হৃৎপিন্ড ও ফুস্‌ফুসের কর্মক্ষমতা ও জঠরাগ্নি বৃদ্ধি পায় এবং সহজে পেটের কোন রোগ হতে পারে না। আসনটি অভ্যাস রাখলে একশিরা, হার্ণিয়া ও অর্শ রোগ হয় না। কোন স্ত্রী-ব্যাধিও সহজে আক্রমণ করতে পারে না। তাছাড়া আসনটি অভ্যাস করলে অতি অল্পদিনে দেহের অপ্রয়োজনীয় মেদ কমে গিয়ে দেহ সুঠাম ও সুন্দর হয়ে ওঠে।

যে সব মেয়েদের বুক অপেক্ষা নিতম্ব ছোট তাদের আসনটি অবশ্য করা উচিত। মেরুদণ্ডকে নমনীয় রাখতে আসনটি বিশেষভাবে সাহায্য করে। পিঠ ও মেরুদণ্ডের পেশী ও স্নায়ুজালের খুব ভাল উপকার হয়।

নিষেধ—যাদের কোন রকম হৃদ্‌রোগ বা আমাশয় রোগ আছে, অথবা প্লীহা, যকৃৎ অস্বাভাবিক বড়, রোগ-নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত তাদের এ-আসনটি করা উচিত নয়।

৯-কারাসন (গ)

প্রণালী—প্রথমে ৯-কারাসন ক-এর ভঙ্গিমায় এস। তারপর হাত দু'টি আল্‌গা করে হাতের তালু উপুড় করে দেহের দু'পাশে ছড়িয়ে রাখ। এবার আস্তে আস্তে গোড়ালি মাথার পিছনদিকে যতদূর সম্ভব দূরে মেঝেতে নামিয়ে দাও। ছবি দেখ।
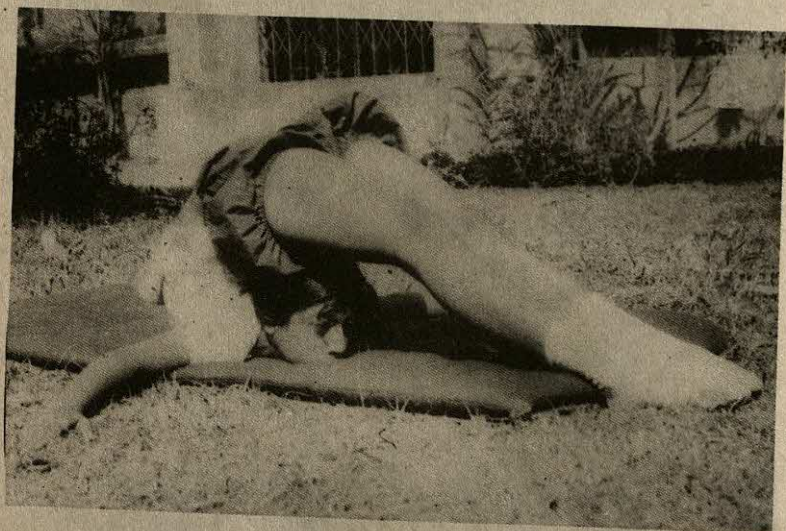
৯-কারাসন—১(গ)

হাঁটু যেন না ভাঙে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। কুড়ি সেঃ থেকে তিরিশ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর হাত ও বুকের উপর ভর রেখে আস্তে আস্তে পা উপরে তুলে মেঝেতে নামিয়ে রাখ। বিশ্রাম নিয়ে আসনটি তিন বার কর এবং প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—এই আসনটিতে ৯-কারাসন 'ক'-এর সব গুণ বর্তমান। এতে আরো দ্রুত ও ভালো ফল পাওয়া যায়। মেরুদণ্ড পিছনদিকে বাঁকানোর এমন সুন্দর আসন আর একটিও নেই। যৌবনকে দীর্ঘস্থায়ী রাখতে আসনটি বিশেষভাবে সাহায্য করে।

নিষেধ—৯-কারাসন 'ক'-এর সমস্ত নিষেধগুলি ৯-কারাসন 'খ' ও 'গ'-এ মেনে চলতে হবে।

গরুড়াসন

প্রণালী—শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াও, হাত দু'টি কনুইয়ের কাছ থেকে ভেঙে ডান হাত বাঁ কনুয়ের নীচ দিয়ে নিয়ে ডান হাতের তালু বাঁ হাতের তালুতে নমস্কারের ভঙ্গিতে রাখ (আঙুলগুলি ঠিক পাখীর ডানার মত দেখাবে), অথবা দু'হাতের

গরুড়াসন

আঙুল ঠিক পাখীর ঠোঁটের মত কর। আঙুলগুলি যেভাবে ইচ্ছা রাখা যায়—আসল কথা হচ্ছে, এক হাত দিয়ে অন্য হাতকে পেঁচিয়ে ধরতে হবে। এখন বাঁ পা মাটিতে রেখে ডান পা উঁচু করে, পায়ের পাতা দিয়ে ডান পায়ের গোছা আঁকড়ে ধর। অভ্যাস হয়ে গেলে, উঁচু পায়ের আঙুলগুলি আঁকড়ে ধরা অবস্থায় নীচে আনার এবং উরু একটার পর আর একটা ওঠাবার চেষ্টা কর। ছবি দেখ। তিরিশ সেঃ থেকে পঁয়তাল্লিশ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। হাত-পা বদল করে আসনটি চার বার কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—আসনটিতে এক পায়ের উপর দেহের সমস্ত ভার পড়ে বলে, পায়ের খুব ভাল ব্যায়াম হয়। ফলে, পায়ের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং গঠনও সুন্দর হয়। হাতের পেশী ও স্নায়ু সুস্থ ও সক্রিয় থাকে। বাঁকা মেরুদণ্ড সোজা ও সরল হয়। হাতে-পায়ে কোনদিন বাত বা সায়টিকা হ'তে পারে না।

ভটনাসন

প্রণালী—প্রথমে সোজা হ'য়ে দাঁড়াও। তারপর ডান পা হাঁটু থেকে ভেঙে পায়ের পাতা বাঁ উরুর উপর রাখ। এখন ধীরে ধীরে ডান হাঁটু মেঝের উপর রাখ এবং হাত দু'টি নমস্কারের ভঙ্গিতে বুকের উপর রাখ। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস
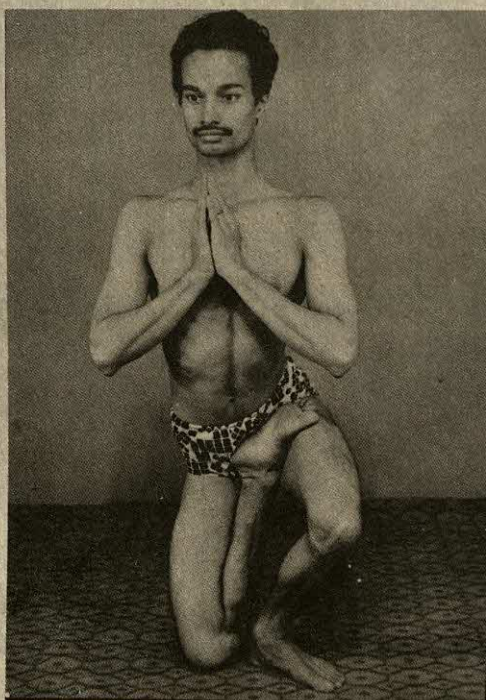
ভটাসন—১(ক)

স্বাভাবিক রেখে তিরিশ-চল্লিশ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। এর পর পা বদল ক'রে আসনটি চার বার অভ্যাস কর এবং প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।
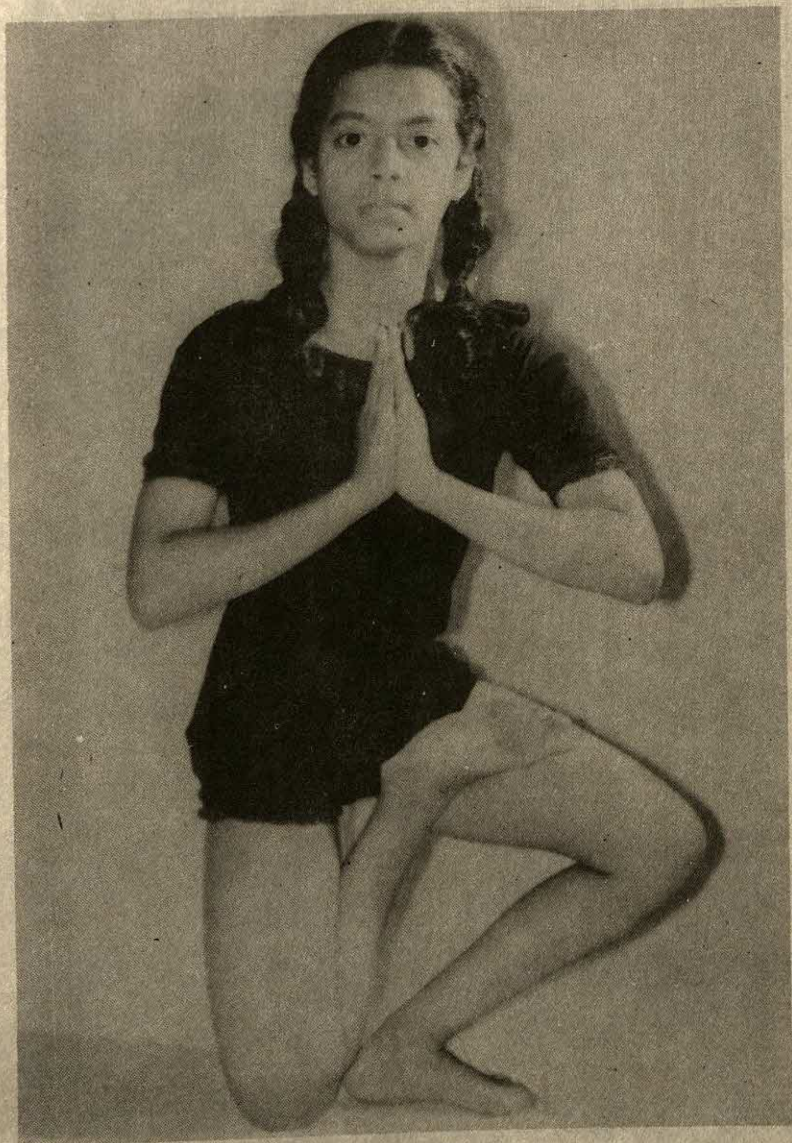
ভটাসন—১(খ)

উপকারিতা—আসনটি অভ্যাসের ফলে হার্ণিয়া রোগ দূর হয়—দেহের নিম্নাংশ সুস্থ ও সবল থাকে।

বৃক্ষাসন

প্রণালী—শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াও। হাত দু'টি নমস্কারের ভঙ্গিমায় রেখে মাথার উপর তোল অথবা নমস্কারের ভঙ্গিমায় বুকে রাখ। প্রথমাবস্থায় হাত কানের

বৃক্ষাসন—১(ক)

সঙ্গে লেগে থাকবে। এবার ডান পা উঠিয়ে বাঁ-পায়ের উরুতে রাখ। পায়ের পাতার নীচের দিকটা উরুর সঙ্গে লেগে থাকবে। ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক।
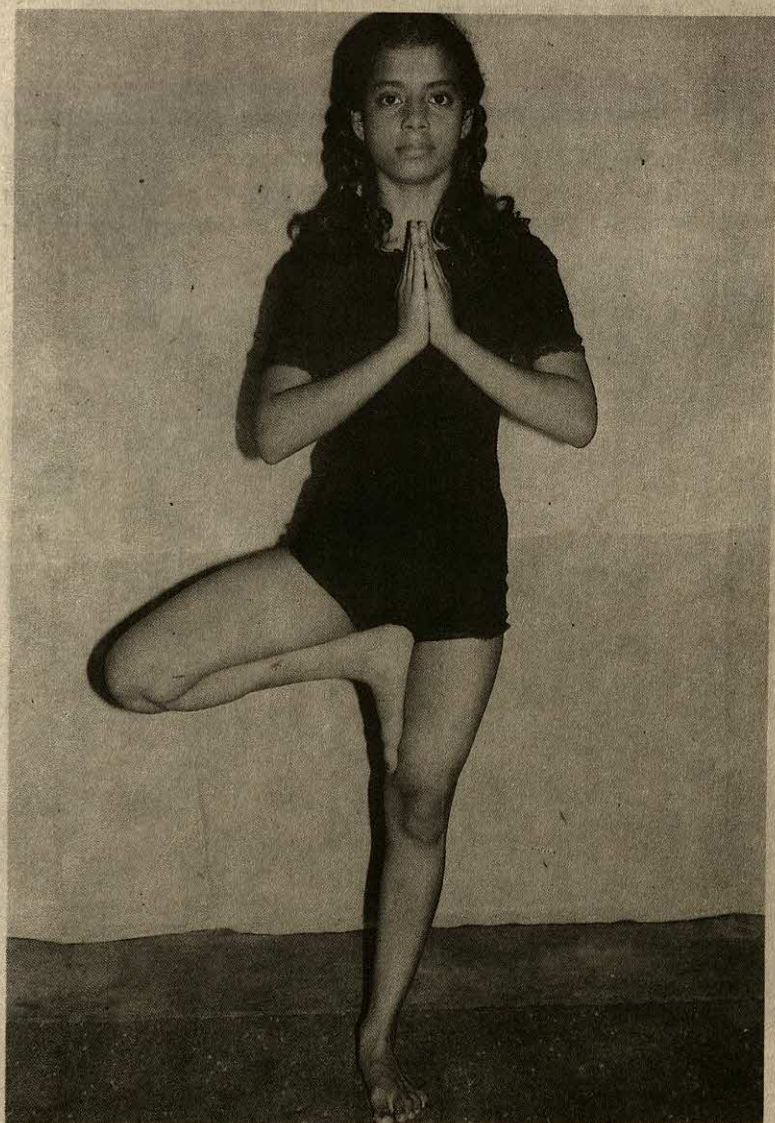
বৃক্ষাসন—১(খ)

তারপর ডান পা নামিয়ে একইভাবে বাঁ পা-ও কর। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। পা বদল করে আট বার আসনটি করার চেষ্টা কর।

উপকারিতা—আসনটি পায়ের ধমনী, শিরা, পেশী ও স্নায়ু সতেজ ও সক্রিয় রাখে এবং পায়ের শক্তি বৃদ্ধি করে। তাছাড়া উরুর সংযোগস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। আসনটি অভ্যাস রাখলে পায়ে কোনদিন বাত হতে পারে না। তাছাড়া পায়ের গঠন দৃঢ় ও সুন্দর হয়।

বকাসন

আসন অবস্থায় দেহটি অনেকটা বকের মত দেখায়, তাই আসনটির নাম বকাসন।

প্রণালী—হামাগুড়ি দিয়ে বস। পা একটু ফাঁক করে দু' হাতের তালু উপুড় করে মেঝেতে রাখ। এবার হাতের চেটোর উপর ভর দিয়ে, দু' হাঁটু তুলে, দু'হাতের বগলের ঠিক নীচে দৃঢ়ভাবে লাগাও। এখন দু' হাঁটুর উপর চাপ দিয়ে সামনের

বকাসন—১(ক)

দিকে হেলে পড়। যতদূর সম্ভব উপরদিকে তাকাও। হাঁটু দু'টি বগলের নীচে না রেখে, দু'হাতের বাইরেও লাগানো যেতে পারে। তবে বগলের নীচে রাখলে দেহের ভারসাম্য রাখতে সহজ হয়। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। কুড়ি

সেঃ থেকে তিরিশ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর আস্তে আস্তে হাঁটু নামিয়ে, বসে বিশ্রাম নিয়ে আসনটি তিন বার অভ্যাস কর।

বকাসন—১(খ)

উপকারিতা—আসনটি বিশেষভাবে হাত, পা ও ঘাড়ের শক্তি বৃদ্ধি করে ও পেশীর দোষত্রুটি দূর করে এবং দেহের অপ্রয়োজনীয় মেদ কমাতে সাহায্য করে। তাছাড়া, এতে পেট, পিঠ, কোমর ও নিতম্বের খুব ভালো ব্যায়াম হয়। আসনটি হাতের শক্তি প্রচন্ড বৃদ্ধি করে।

মার্গাসন

প্রণালী—হাঁটু মুড়ে বস। তারপর বাঁ পা হাঁটু থেকে ভেঙে পায়ের পাতার নীচের দিকটা বাঁ বগলের নীচে রাখ। এখন বাঁ হাতের তালু বাঁ হাটুর উপর এবং ডান হাতের তালু ডান পায়ের আঙুলের উপর রেখে, ঐ অবস্থায় ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ থাক। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। পা বদল ক'রে আসনটি চার বার অভ্যাস কর এবং শবাসনে প্রয়োজনমতো বিশ্রাম নাও।

মার্গাসন

উপকারিতা—আসনটিতে দেহের সকল অংশের কম-বেশী উপকার হয়। বিশেষ ক'রে এই আসনটি অভ্যাসের ফলে দেহের নিম্নাংশের উপকার হয়। পায়ে সহজে বাত বা সায়টিকা রোগ হয় না।

কুক্কুটাসন

প্রণালী—প্রথমে পদ্মাসনে বস। তারপর ডান পায়ের গোড়ালির সম্মুখ দিয়ে বাঁ হাতের তালু ও বাঁ পায়ের গোড়ালির সম্মুখ দিয়ে ডান হাতের তালু নিয়ে মেঝেতে রাখ। হাত দু'টি পায়ের ফাঁকের ভিতর দিয়ে যাবে এবং হাতের আঙুলগুলি মেঝেতে ছড়িয়ে থাকবে। এবার দু' হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে পা পদ্মাসন অবস্থায় রেখে দেহটাকে কনুই পর্যন্ত উপরে তোল। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর আস্তে আস্তে মেঝেতে বসে, হাত-পা আল্‌গা করে বিশ্রাম নাও। আসনটি তিন বার কর এবং প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।
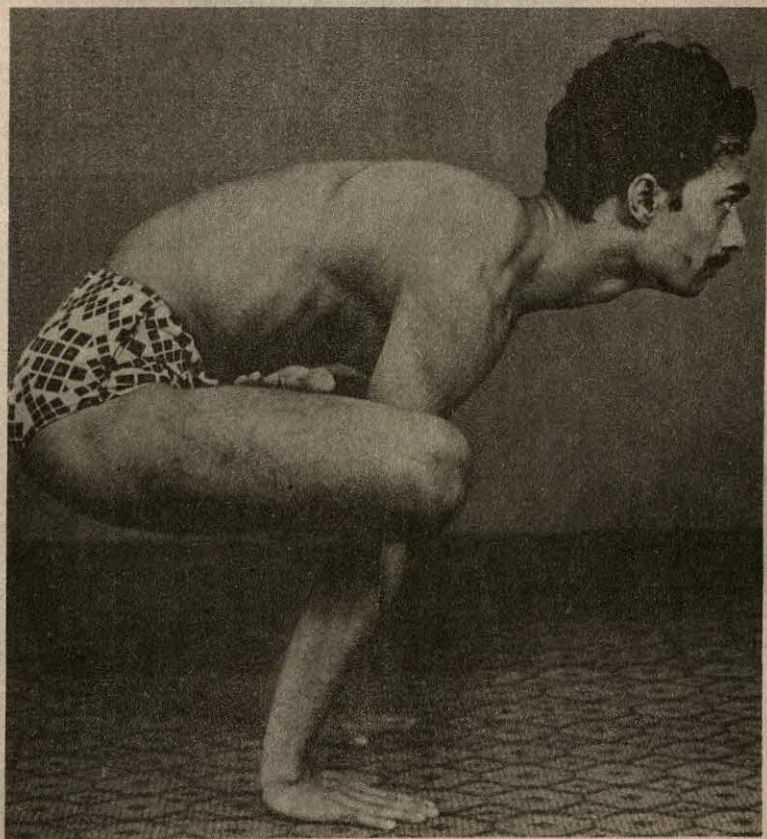
কুক্কুটাসন

উপকারিতা—আসনটি হাত-পায়ের পেশী ও স্নায়ুজাল সুস্থ ও সক্রিয় রাখে; বুক ও কাঁধের পেশী দৃঢ় করে, ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শরীরকে কষ্টসহিষ্ণু ও কর্মক্ষম রাখতে আসনটি বিশেষ উপযোগী। আসনটি কাঁধের পেশীর ও হাতের শক্তি প্রচণ্ড বৃদ্ধি করে।

কর্ণ-পিঠাসন

প্রণালী—(ক) প্রথমে হলাসন কর। এবার হাত দু'টি মাটি থেকে তুলে নিয়ে কোমরের দু'পাশে ধর। এখন পা দু'টি হাঁটু থেকে ভেঙে হাঁটু দু'টি দু'কানের পাশে মেঝেতে রাখ। পায়ের পাতা মোড়া অবস্থায় মেঝেতে লেগে থাকবে। হাঁটু কানের সংগে লেগে থাকবে।

কর্ণ-পিঠাসন—১(ক)

প্রণালী—(খ) প্রথমে সর্বাংগাসন কর। তারপর পা দু'টি হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙে, হাঁটু দু'টি দু' কানের পাশে মাটিতে রাখ। পায়ের পাতা জোড়া ও মোড়া অবস্থায় মেঝেতে রাখ। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ২০ সেঃ

থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর, প্রথমে হলাসন বা সর্বাংগাসনে যাও এবং আস্তে আস্তে পা মেঝেতে নামিয়ে, হাত আল্‌গা করে চিৎ হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নাও। আসনটি তিন বার কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।
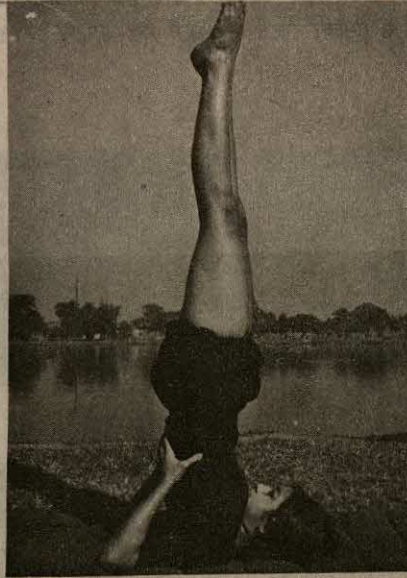
কর্ণ-পিঠাসন—১(খ)

কর্ণ-পিঠাসন—১(গ)

উপকারিতা—হলাসন ও পূর্ণ-বন্ধ-সর্বাংগাসনের প্রায় সব গুণ এ-আসনটিতে বর্তমান।

নিষেধ—পূর্ণ-বন্ধ-সর্বাংগাসনের নিষেধগুলি কর্ণ-পিঠাসনেও মেনে চলতে হবে।

মকরাসন

আসন অবস্থায় দেহটি মকরের মত দেখায় তাই আসনটির নাম মকরাসন।

প্রণালী—সটান উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। হাত দু'টি কনুই থেকে ভেঙে দু' হাতে ধরে ব্রহ্মতালুতে স্পর্শ করে রাখ। এখন মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত মেঝেতে রেখে এবং পা দু'টি জোড়া ও সোজা রেখে ১½ ফুট মত উপরে তোল। ছবি দেখ। ঐ
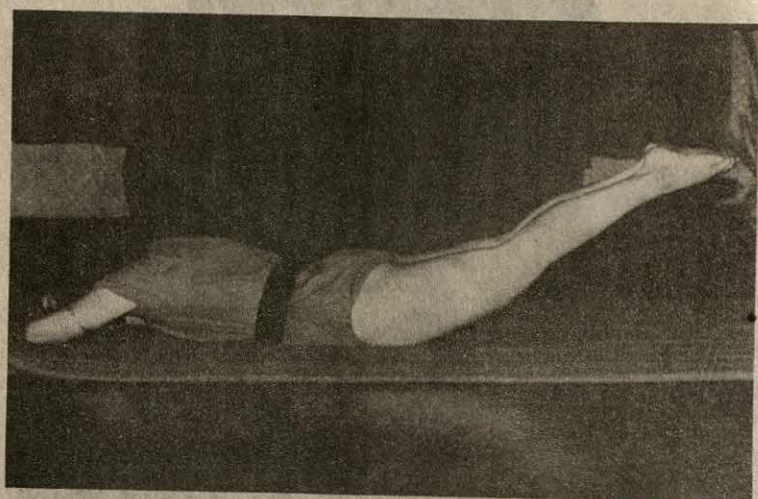
মকরাসন

অবস্থায় ২৫ থেকে ৩০ সেঃ থাক। তারপর পা নামিয়ে বিশ্রাম নিয়ে আসনটি ৬ বার কর। অভ্যাস হয়ে গেলে ১ মিঃ পর্যন্ত আসন অবস্থায় থাকবে, ৬ বার করার দরকার হবে না।

উপকার—আসনটিতে পেট, বস্তিপ্রদেশ, নিতম্ব, কোমর ও পায়ের খুব ভাল কাজ হয়। পায়ের গঠন সুন্দর ও মজবুত হয়।

নিষেধ—হৃদ্‌রোগীদের রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত, আসনটি করা উচিত নয়।

পূর্ণ-মকরাসন

প্রণালী—প্রথমে পদ্মাসনে বস। তারপর ঐ অবস্থায় পা দু'টি রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। এখন হাত দু'টি পিছনদিকে নিয়ে কনুই থেকে ভেঙে নমস্কারের
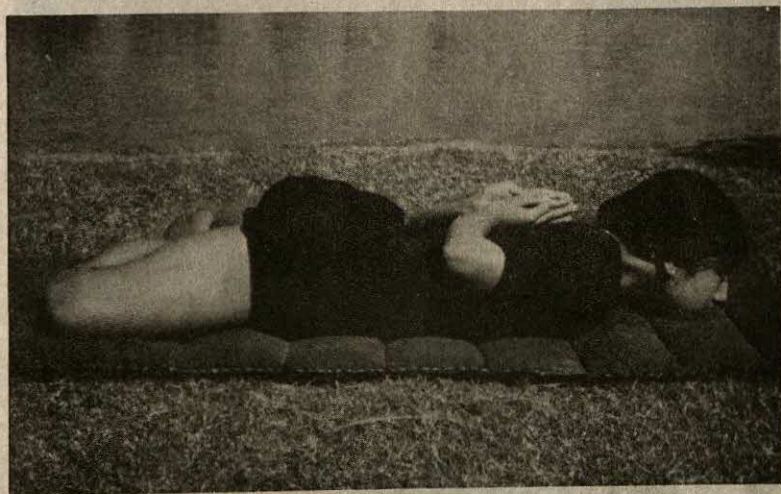
পূর্ণ-মকরাসন

ভঙ্গিতে পিঠের উপর রাখ। হাতের আঙুলগুলি মাথার দিকে থাকবে এবং চিবুক মেঝেতে থাকবে। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর হাত-পা আলগা করে উপুড় বা চিৎ হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে আসনটি তিন বার কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—আসনটি অভ্যাসকালে বুক, তলপেট, কোমর, নিতম্ব, হাত ও পায়ে প্রচন্ড চাপ পড়ে। ফলে ঐ অঞ্চলের পেশী, শিরা, উপশিরা, স্নায়ু প্রভৃতি সতেজ ও সক্রিয় থাকে—হজমশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সহজে পেটের কোন রোগ হয় না। পেট ও বস্তি-প্রদেশের অপ্রয়োজনীয় মেদ কমিয়ে দেহকে সুঠাম ও সুন্দর করে গড়ে তুলতেও আসনটির তুলনা নেই। আসনটি অভ্যাস রাখলে কোন স্ত্রী-ব্যাধি সহজে আক্রমণ করতে পারে না।

নিষেধ—হৃদ্‌রোগীদের রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত, আসনটি করা বাঞ্ছনীয় নয়।

ত্রিকোণাসন (ক)

প্রণালী—পায়ের পাতার মাঝে ২½ ফুট মত ফাঁক রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াও। এবার পায়ের পাতা থেকে কোমর পর্যন্ত সোজা রেখে দেহের উপরাংশ বাঁদিকে বাঁকিয়ে বাঁ হাতের তালু বাঁ পায়ের পাতার উপরে রাখ। ডান হাত মাথার সমান্তরাল থাকবে।
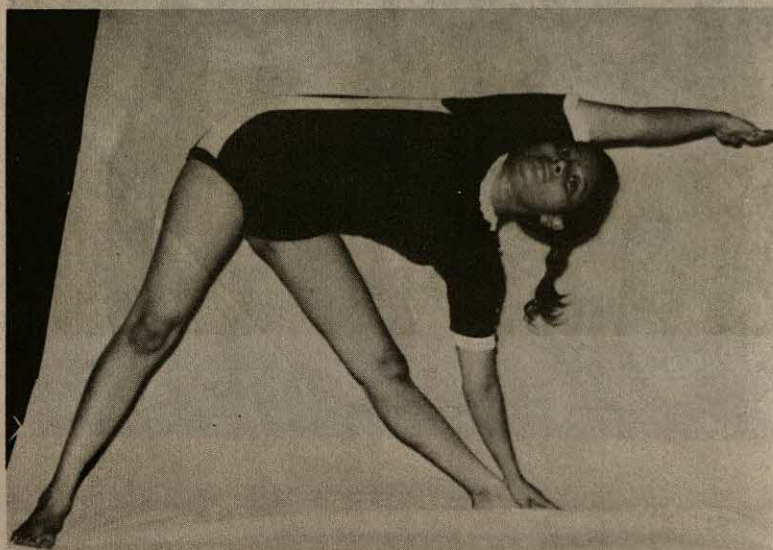
ত্রিকোণাসন—১(ক)

ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক। ১৫ থেকে ২০ সেঃ ঐভাবে থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং একইভাবে ডানদিকে অভ্যাস কর। ৪ থেকে ৬ বার আসনটি কর।

উপকারিতা—আসনটিতে দেহের সব অংশের কম-বেশী উপকার হয়। তবে পায়ের কাজ খুব ভাল হয়।

ত্রিকোণাসন (খ)

প্রণালী—ত্রিকোণাসন 'ক'-এর অনুরূপ। তবে ছবি দেখে পার্থক্য লক্ষ্য কর। ১। বাঁ পা হাটু থেকে ভাঙতে হবে। ২। ডান হাত সোজা উপরে তুলে সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। হাত-পা বদল করে ৪ থেকে ৬ বার আসনটি কর।
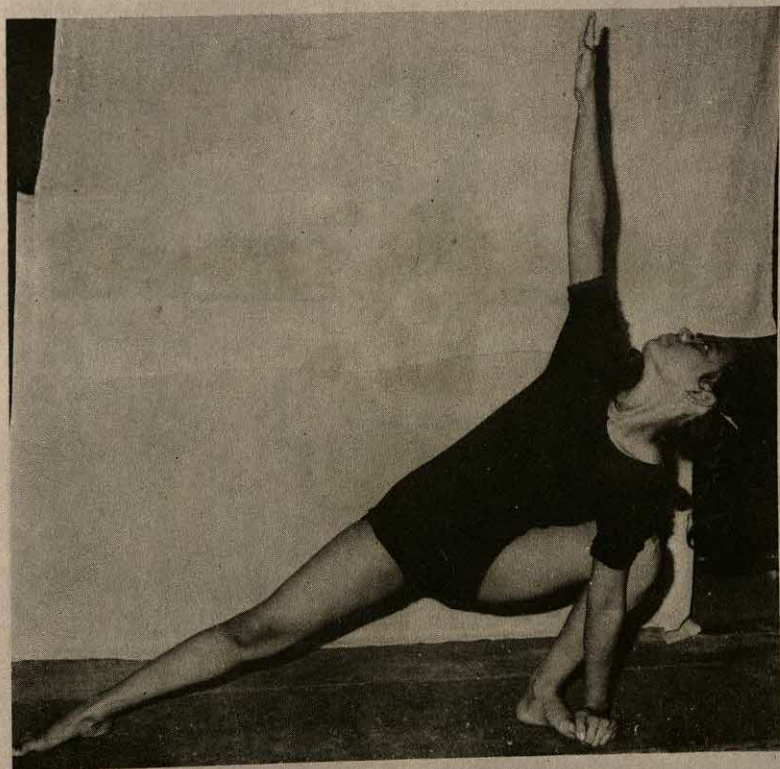
ত্রিকোণাসন—১(খ)

উপকারিতা—ভঙ্গিমাটিতে ঘাড়, কাঁধ, গলা, বুক, হাত-পা, কোমর ও পিঠের খুব ভাল কাজ হয়। তাছাড়া উরুর সন্ধিস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে। বাত বা সায়টিকা কোনদিন হতে পারে না। কাঁধ, হাত-পা, বুক, পিঠের গঠনে ত্রুটি অর্থাৎ অসমান থাকলে এই ভঙ্গিমা অভ্যাসে ঠিক হয়ে যায়। তাছাড়া আসনটি হজম-শক্তি বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, বাত বা সায়টিকা রোগের আক্রমণ থেকেও দেহকে রক্ষা করে। কোমর ও পেটের অপ্রয়োজনীয় মেদ কমিয়ে দেহকে সুন্দর করে গড়ে তুলতেও আসনটি অভ্যাস রাখা দরকার।

চতুষ্কোণাসন

আসন অবস্থায় দেহটি চতুষ্কোণের আকৃতি পায় বলে আসনটির নাম চতুষ্কোণাসন।

প্রণালী—হাঁটু মুড়ে বজ্রাসনের ভঙ্গিমায় বস, কিন্তু পাছা মেঝেতে থাকবে, গোড়ালির উপর থাকবে না। এবার বাঁ পা আল্‌গা করে হাঁটু ভেঙে একটু উঁচু করে, বাঁ হাত বাঁ পায়ের নীচে দিয়ে নিয়ে পা-টি উঁচু করে ধরে রাখ। এখন ডান

চতুষ্কোণাসন

হাত মাথার উপর তোল এবং কনুইয়ের কাছ থেকে ভেঙে মাথার পিছনদিক দিয়ে নিয়ে বাঁ হাতের আঙুল ধর। ছবি দেখ। ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। হাত-পা বদল করে আসনটি চার বার কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—আসনটিতে দেহের কম-বেশী সব অংশের ব্যায়াম হয়। এর ফলে, দেহের সমস্ত দেহযন্ত্র সুস্থ ও সক্রিয় থাকে। হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কোনদিকের কাঁধ উঁচু-নীচু থাকলে এই আসনটি অভ্যাস করলে তা ঠিক হয়ে যায়। এতে হাত, পা ও বুকের গড়ন দৃঢ় ও সুন্দর হয়। কোন স্ত্রী-ব্যাধি সহজে আক্রমণ করতে পারে না।

ভদ্রাসন

প্রণালী—সামনের দিকে পা ছড়িয়ে বস। এবার দু' পা হাঁটু থেকে ভেঙে পায়ের পাতার নীচের দিকটা পরস্পরের সঙ্গে লাগাও। এখন দু' হাত দিয়ে দু' পায়ের গোছা ধরে আস্তে আস্তে টেনে এনে দু' উরুর সংযোগস্থলের মেঝেতে রাখ। এবার আস্তে আস্তে দু' হাঁটুতে দু' হাত রেখে চাপ দাও এবং হাঁটু মেঝেতে লাগাও।
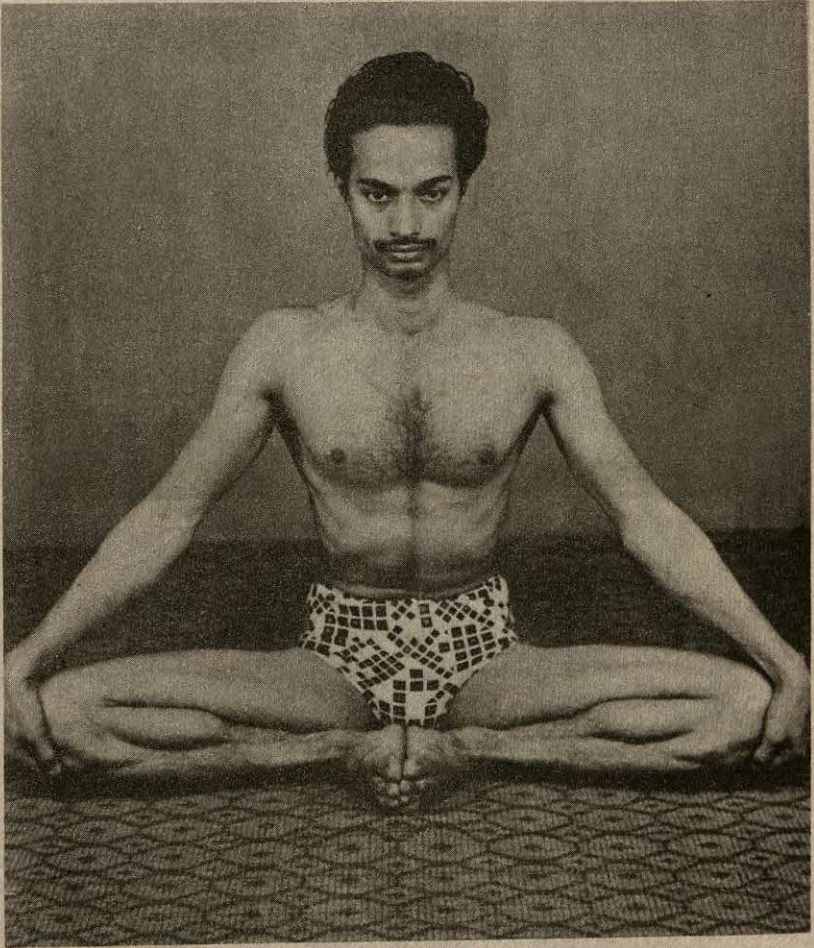
ভদ্রাসন—১(ক)

প্রথম প্রথম বেশ কষ্ট হবে, তারপর কয়েকদিন অভ্যাসের পর সহজ হয়ে যাবে। ঐ অবস্থায় ২৫ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ থাক। তারপর হাত-পা আলগা করে বিশ্রাম

নিয়ে আসনটি চার বার কর। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

ভদ্রাসন—১(খ)

উপকারিতা—আসনটি হাত ও পায়ের ধমনী, শিরা-উপশিরা, স্নায়ু ও পেশী সুস্থ ও সক্রিয় রাখে, উরুর সংযোগস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে এবং পায়ের গঠন দৃঢ় ও সুগঠিত করে। আসনটিতে উরুর সন্ধিস্থলের স্থিতিস্থাপকতা ঠিক থাকায় মেয়েদের সন্তান প্রসবে দৈহিক কোন বাধা সৃষ্টি করে না। তাছাড়া, আসনটি ব্রহ্মচর্য্য পালনে বিশেষ সাহায্য করে।

সিংহাসন

প্রণালী—প্রথমে বজ্রাসনে ও পরে মণ্ডুকাসনে সোজা হয়ে বস শুধু পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর থাকবে। ছবি দেখ। এবার মুখ-বিবর ফাঁক করে যতোটা সম্ভব জিব্ বের করে চিবুক কণ্ঠসংলগ্ন কর এবং গলা কাঁপিয়ে আওয়াজ করে মুখ দিয়ে শ্বাস ছাড়তে থাক। তারপর স্বাভাবিকভাবে নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে
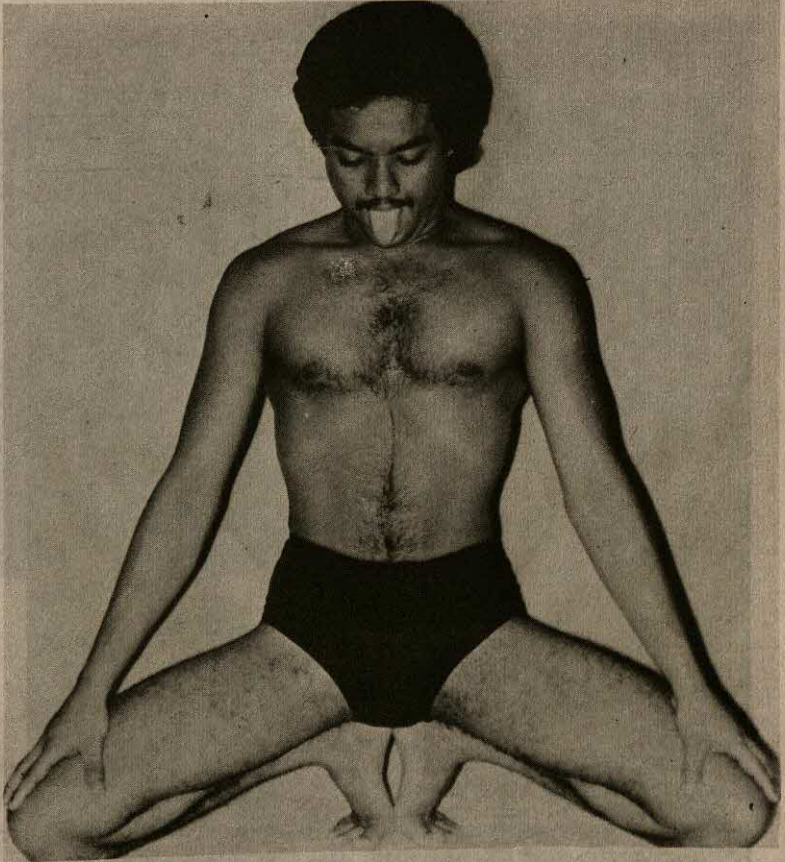
সিংহাসন

আগের মতো ছাড়তে থাক। এইভাবে একবারে সহজভাবে যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ অভ্যাস কর। তারপর বিশ্রাম নিয়ে আসনটি তিন বার কর এবং প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—আসনটি অভ্যাসে টন্সিল রোগ ও তোত্লামি দূর হয়। কানের পর্দা পুরু হওয়ার জন্য যাঁরা কানে কম শোনেন, আসনটি অভ্যাসে তাঁরা উপকার পেতে পারেন। তাছাড়া মণ্ডুকাসনের অনুরূপ উপকার এই আসনটিতেও পাওয়া যায়।

গর্বাসন

প্রণালী—পদ্মাসনে বসে হাঁটু দু'টি উঁচু কর এবং দু'হাত পায়ের ভিতর দিয়ে নিয়ে এসে দু' হাতের তালু দু' চোয়ালের উপর রেখে পাছার উপর বস। ২০ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। এরপর বিশ্রাম নিয়ে আসনটি তিন বার অভ্যাস কর এবং প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

গর্বাসন
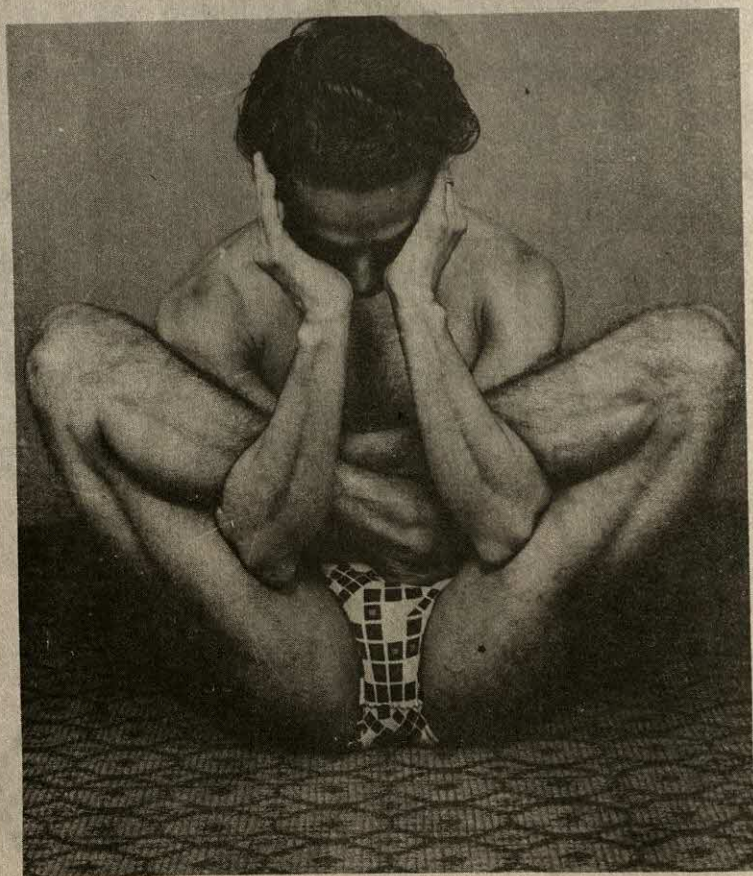
উপকারিতা—আসনটিতে দেহের সকল অংশের কম-বেশী উপকার হয়। আসনটি ধনুরাসনের সঙ্গে অভ্যাস রাখলে দেহের কোন অংশে বাত, সায়টিকা, লাম্বার স্পণ্ডিলোসিস, স্লীপ্‌ড ডীস্ক জাতীয় কোন রোগ হতে পারে না। আসনটি মহিলাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী—গর্ভাশয়ের সকল ত্রুটি দূর করে।

ময়ূরাসন

আসন অবস্থায় দেহটি অনেকটা ময়ূরের মত দেখায়, তাই আসনটির নাম ময়ূরাসন।

প্রণালী—পায়ের পাতা মুড়ে হাঁটুর উপর বস। এবার হাতের তালু দু'টি হাঁটু থেকে একহাত দূরে মাটিতে রাখ। হাতের কব্জি দু'টি একসঙ্গে এবং আঙুলগুলি পিছনদিকে মেলে থাকবে। এখন কনুই নাভির কাছে লাগাও। পা দু'টি সোজা কর। এবার হাতের তালুর উপর ভর রেখে পা জোড়া ও সোজা
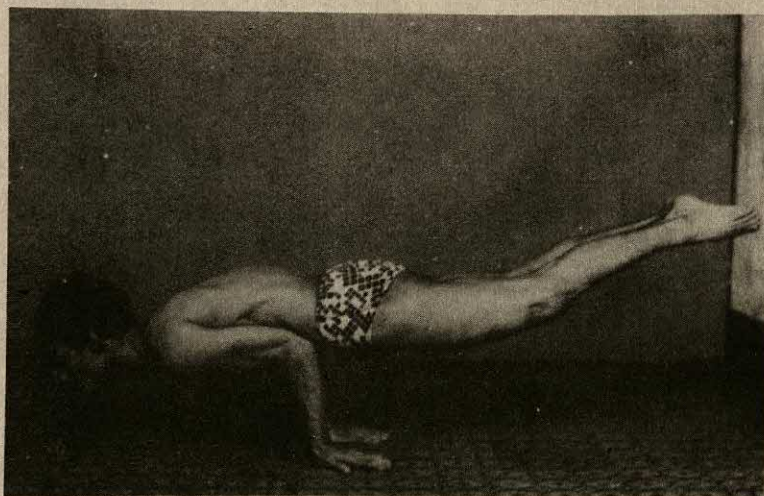
ময়ূরাসন

অবস্থায় উপরে তোল। ছবি দেখ। ১৫ সেঃ থেকে ২০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। তারপর পা নামিয়ে, হাত-পা আল্‌গা করে, শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে আসনটি তিন বার কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—আসনটিতে বিশেষভাবে প্যান্‌ক্রীয়াস ও এ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির খুব ভাল ব্যায়াম হয়। ফলে জঠরাগ্নি বৃদ্ধি পায়, পেটের কোন রোগ সহজে হয় না। তাছাড়া, এই এ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি সুস্থ ও সক্রিয় থাকলে পেশীসমূহের শক্তি ও সঙ্কোচন ক্ষমতা অটুট থাকে, দেহের জলীয় অংশ ধাতব-লবণের পরিমাণ আনুপাতিক থাকে, স্ত্রী ও পুরুষের যৌনগ্রন্থির বিকাশের স্বাভাবিকতা বজায় থাকে। তাছাড়া এ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি থেকে এ্যাড্রিনেলিন নামক একপ্রকার রস ঠিকভাবে নিঃসরণ হয় যা হৃৎপিণ্ডের কর্ম-দক্ষতা বৃদ্ধি করে, রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা ও রক্তের অক্সিজেন বহনক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

এক হস্ত-ময়ূরাসন

প্রণালী—ময়ূরাসনের অনুরূপ তফাৎ শুধু এক হাত মেঝে থেকে তুলে নিয়ে সমস্ত দেহের ভার এক হাতের ওপরে রাখতে হবে। ছবি দেখ। হাত বদল করে ৪ বার আসন অভ্যাস কর।

এক হস্ত-ময়ূরাসন

উপকারিতা—ময়ূরাসনের অনুরূপ উপরন্তু আসনটিতে হাতের শক্তি প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি করে।

বদ্ধ-ময়ূরাসন

প্রণালী—মুক্ত-পদ্মাসনে বস। হাতের তালু সামনে এক হাত দূরে মেঝেতে রাখ। হাতের আঙুল মেঝেতে পিছন দিকে মেলে থাকবে। এবার কনুই ময়ূরাসনের মত নাভির কাছে লাগিয়ে পা বদ্ধ অবস্থায় উপরে তোল। ছবি দেখ। হাত-পা আলগা করে, বিশ্রাম নিয়ে আসনটি ৩ বার অভ্যাস কর।
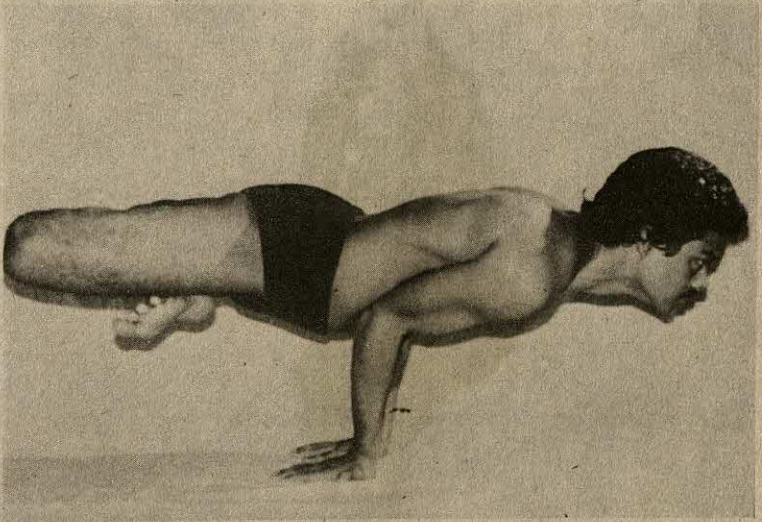
বদ্ধ-ময়ূরাসন

উপকারিতা—ময়ূরাসনের অনুরূপ তবে পায়ের কাজ আরো ভাল হয়।

তাছাড়া, আসনটি উদর ও বস্তিপ্রদেশের পেশী ও স্নায়ুজাল সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাতের উপর সমস্ত দেহের ভার পড়ে বলে হাতের শক্তি বৃদ্ধি করে।

নিষেধ- আসনটিতে পেট ও বুকে প্রচণ্ড চাপ পড়ে। যাদের কোন রকম হৃদ্‌রোগ আছে বা যাদের প্লীহা, যকৃৎ রুগ্ন বা অস্বাভাবিক বড়, রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত তাদের আসনটি করা উচিত নয়।

দণ্ডায়মান একপদ শিরাসন

প্রণালী—সোজা হয়ে দাঁড়াও। এবার ডান পা তুলে হাঁটু ভেঙে পায়ের পাতা যতদূর সম্ভব পিঠের দিকে নিয়ে এস। এবার দু'হাত পিছনদিকে নিয়ে ডান পায়ের পাতা ধরে টেনে নিয়ে এসে ঘাড়ের উপর রাখ অথবা গলায় আটকিয়ে দাও। দু'হাত দিয়ে ধরে মাথার উপরও রাখতে পার। পা যদি মাথার উপর না রাখ তবে হাত দু'টি

দণ্ডায়মান একপদ শিরাসন —১(ক)

নমস্কারের ভঙ্গিতে বুকের উপর রাখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ১৫ সেঃ থেকে ২০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর হাত-পা আলগা করে আস্তে আস্তে পা

মাটিতে নিয়ে এস (হাত দিয়ে পায়ের পাতা ধরে পা গলা থেকে ব্য ঘাড় থেকে আল্‌গা করা বাঞ্ছনীয়)। ঝট্‌কা দিয়ে পা খুলবে না, ঊরুর সংযোগস্থলে চোট্‌ লাগতে পারে পা বদল করে আসনটি ৪ বার কর। তারপর শবাসনে বিশ্রাম নাও।
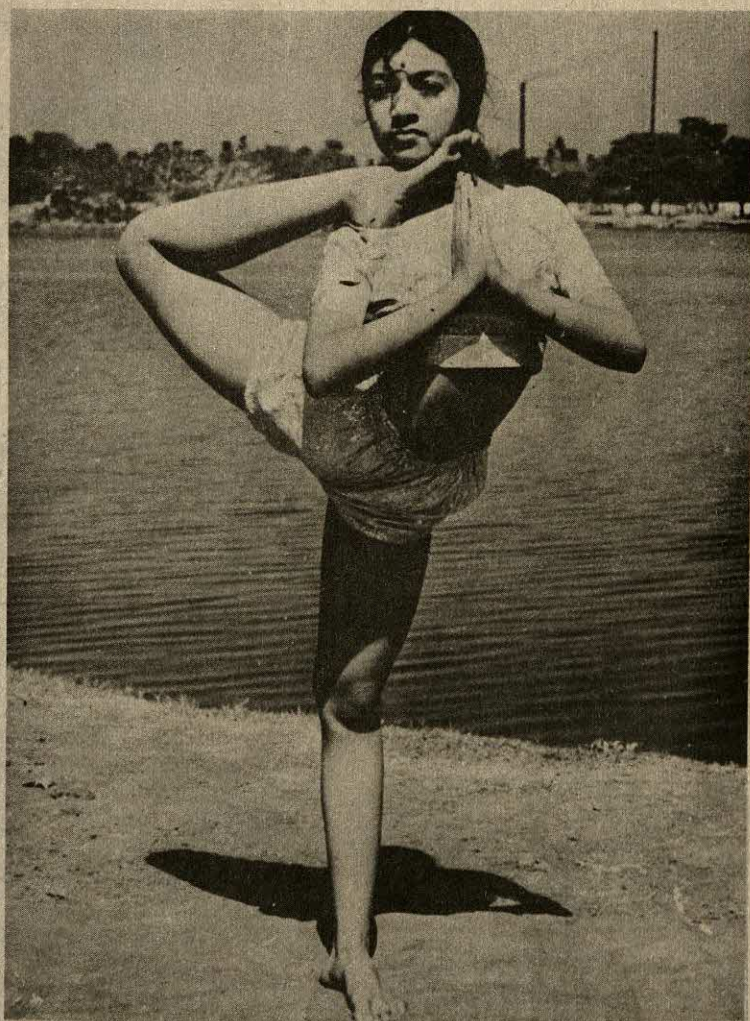
দণ্ডায়মান একপদ শিরাসন—১(খ)

উপকারিতা—আসনটি অভ্যাস করলে বিশেষভাবে কোমর ও ঊরুর সংযোগস্থলের মাংসপেশী ও হাড়ের জোড় মজবুত ও নমনীয় হয় এবং ঐ অঞ্চলের স্নায়ুজালও সুস্থ ও সক্রিয় থাকে। পায়েরও খুব ভাল ব্যায়াম হয়। এ ছাড়া বুক সুগঠিত হয়, ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়; একশিরা, হার্ণিয়া, অর্শরোগ ও কোন স্ত্রী-ব্যাধি হয় না।

নিষেধ—অর্শ, একশিরা ও হার্ণিয়া রোগীদের রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত আসনটি করা উচিত নয়।

উৎকটাসন

প্রণালী—পায়ের পাতা দু'টি ৮ ইঞ্চির মত ফাঁক ও সমান্তরাল রেখে সোজা হয়ে
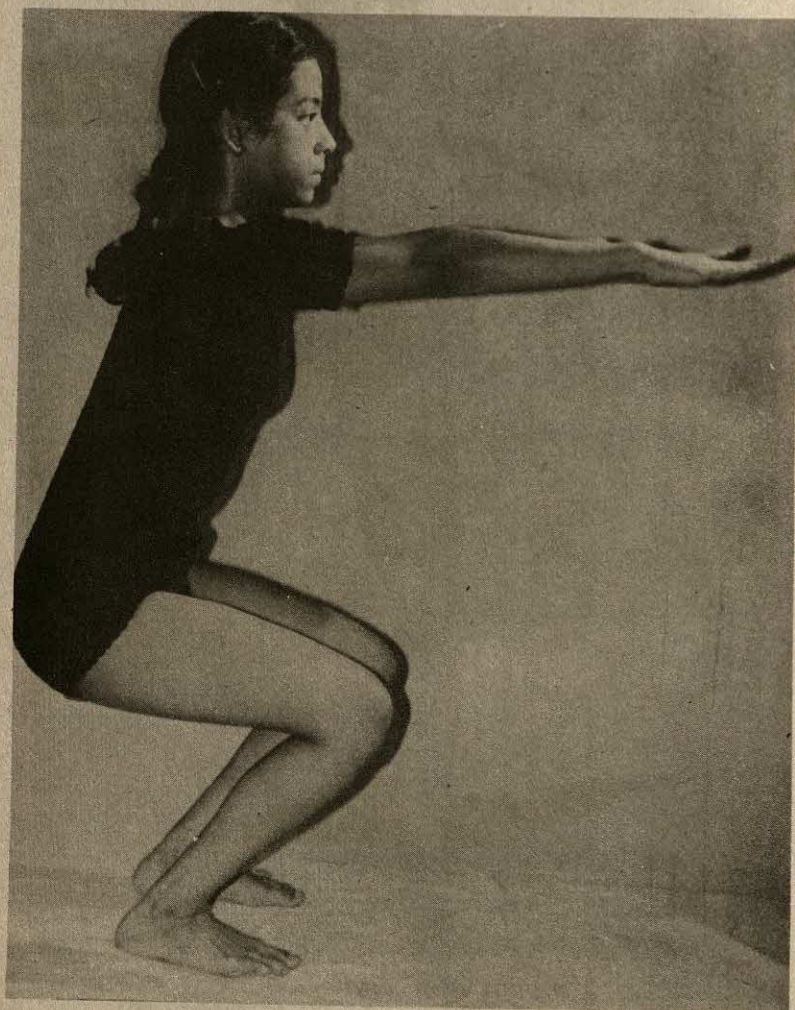
উৎকটাসন—১(ক)

দাঁড়াও। হাত দু'টি সামনে মেলে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল কর। এবার হাটু ভেঙে প্রথমে 'ক' ও পরে 'খ' চেয়ারে বসার ভঙ্গিমায় বস। ছবি দেখ।

চার থেকে ছয় বার আসনটি অভ্যাস কর। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।
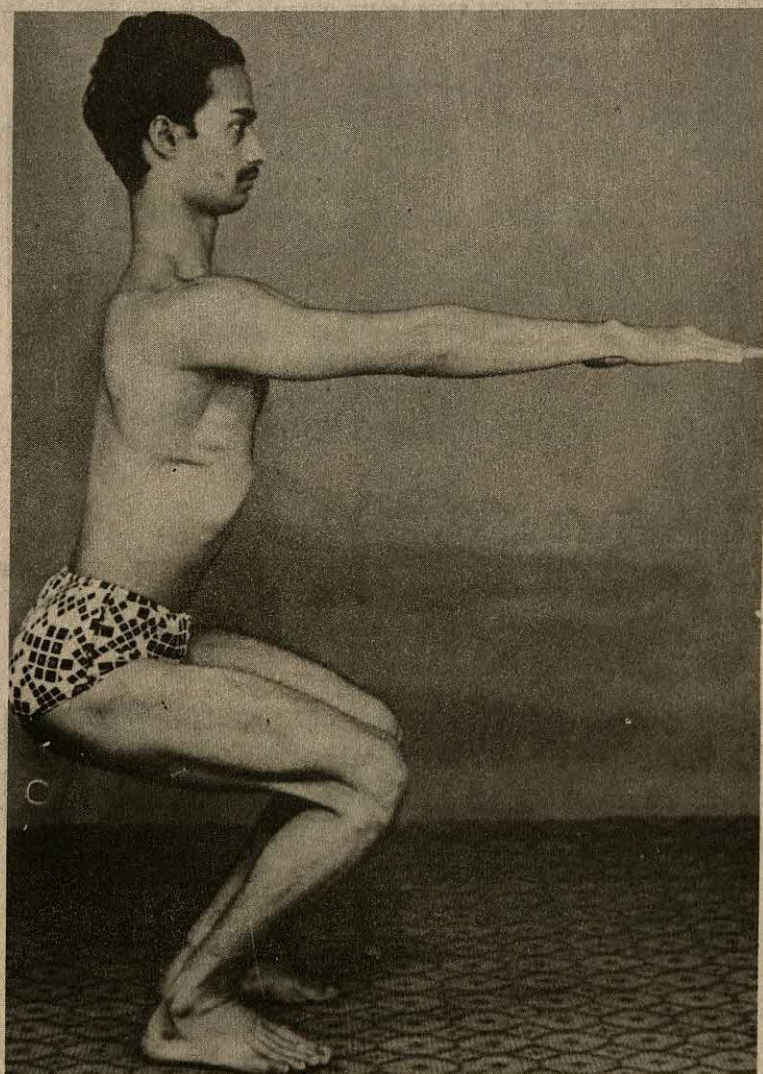
উৎকটাসন—১(খ)

উপকারিতা—আসনটি বিশেষভাবে পায়ের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পায়ের গঠন সুঠাম ও সুন্দর করে তোলে। কোমরে ও পায়ে বাত বা সায়টিকা হয় না।

উপাধানাসন

প্রণালী ঃ—চিৎ হয়ে শুয়ে পড় এবং মাথা উঁচু কর। এবার যে কোন পা হাঁটু থেকে ভেঙ্গে হাত দিয়ে টেনে এনে মাথার পিছনে গোড়ালীর ঠিক উপরের পিছন দিকটা

উপাধানাসন—১(ক)

লাগিয়ে দেবে। এবার অপর পা হাঁটু থেকে একটু উপরে তোল—পায়ের পাতা মেঝেতে লেগে থাকবে। এখন হাত দু'টি বই পড়ার ভঙ্গিমায় বুকের উপর নিয়ে এস। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক। ছবি দেখ। পা বদল করে আসনটি ৪ বার কর।

উপাধানাসন—১(খ)

উপকারিতা ঃ—আসনটিতে দেহের সব জায়গার উপকার হয়—বিশেষভাবে ঘাড়, কাঁধ, গলা, শিরদাঁড়ার উপরাংশ, পা ও উরুর সংযোগস্থলের উপকার হয়।

বীর-ভদ্রাসন

প্রণালী—আঙুলগুলি নমস্কারের ভঙ্গিতে রেখে হাত দু'টি সোজা মাথার উপর তোল এবং সোজা হয়ে দাঁড়াও। হাত কানের সঙ্গে লেগে থাকবে। এবার ঐ অবস্থায় সামনের দিকে বাঁ পা দু ফুট থেকে আড়াই ফুট দূরে রাখ। এখন ডান পা সোজা রেখে এবং বাঁ পায়ের হাঁটু ভেঙে, কোমর থেকে দেহের উপরাংশ সাধ্যমত পিছনদিকে বাঁকিয়ে নিয়ে যাও। ছবি দেখ। ঐ অবস্থায় ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ থাক। তারপর একই প্রণালীতে ডান পা এগিয়ে বাঁ পা সোজা রেখে আসনটি কর। এইভাবে আসনটি প্রতি পায়ের উপর তিন বার করে ছয় বার অভ্যাস কর। অভ্যাসকালে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে।

যে পা সোজা থাকবে তার গোড়ালি উঁচু করে আসনটি করা যায়। তবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই প্রণালীতে আসনটি করলে আরো ভালো ফল পাওয়া যায়।

বীর-ভদ্রাসন

উপকারিতা—এই আসনটি অভ্যাস করলে মেরুদণ্ডের হাড়ের জোড় নরম ও মজবুত হয়, মেরুদণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়, পাঁজরের হাড়ের অসাম্যতা দূর হয় এবং বুক সুগঠিত হয়। এতে পায়ের ভালো ব্যায়াম হয় বলে পায়ের শক্তি বৃদ্ধি এবং তার গঠন সুন্দর হয়। তলপেট, কোমর ও নিতম্বে বেশী মেদ জমতে পারে না বলে দেহ সুন্দর ও সুঠাম হয়ে ওঠে। আসনটি অভ্যাস রাখলে বাত বা সায়াটিকা হয় না।

যোগনিদ্রা

প্রণালী—সামনের দিকে পা ছড়িয়ে বস। তারপর দু'হাত দিয়ে ডান পায়ের ঠিক গোড়ালির উপর ধরে পা-টি উঁচু ক'রে টেনে এনে কাঁধের উপর রাখ। ঐ একই পদ্ধতিতে বাঁ পা-টিও কাঁধের উপর রাখ। তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড় এবং হাত দু'টি পাছার কাছে এনে এক হাত দিয়ে অন্য হাত ধর। ছবি দেখ। ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। বিশ্রাম নিয়ে আসনটি ৩ বার অভ্যাস কর এবং প্রয়োজনানুযায়ী শবাসনে বিশ্রাম নাও।

যোগনিদ্রা— ১(ক)

যোগনিদ্রা– ১(খ)

উপকারিতা—আসনটি দেহের সব অংশের উপকার সাধন করে। বিশেষ করে এই আসনটি অভ্যাসের ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কেননা, আসনাবস্থায়

হৃদ্‌যন্ত্র কিছুটা কম পরিশ্রম করার ফুরসৎ পায়। তাছাড়া, এই আসনটি অভ্যাসের ফলে উরুর সংযোগস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকে। আসনটি অভ্যাস রাখলে মেয়েদের সন্তান প্রসবে দৈহিক কোন বাধার সৃষ্টি হতে পারে না।

ওঁকারাসন

প্রণালী—সামনের দিকে পা ছড়িয়ে বস। বাঁ পা হাঁটু থেকে ভেঙে গোড়ালি পাছার কাছে এনে রাখ। এবার ডান পায়ের গোড়ালির ঠিক ওপরে দু'হাত দিয়ে ধরে

ওঁকারাসন—১(ক)

পা-টি উঁচু করে টেনে এনে কাঁধের উপর রাখ। তারপর হাতের তালু দু'টি মেঝের উপর রাখ (বাঁ হাত বাঁ পায়ের ভিতর দিয়ে যাবে)। এবার হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে দেহটাকে যতোটা সম্ভব উপরে তোল। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক

রেখে ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। বিশ্রাম নিয়ে হাত-পা বদল করে আসনটি চার বার অভ্যাস কর এবং প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।
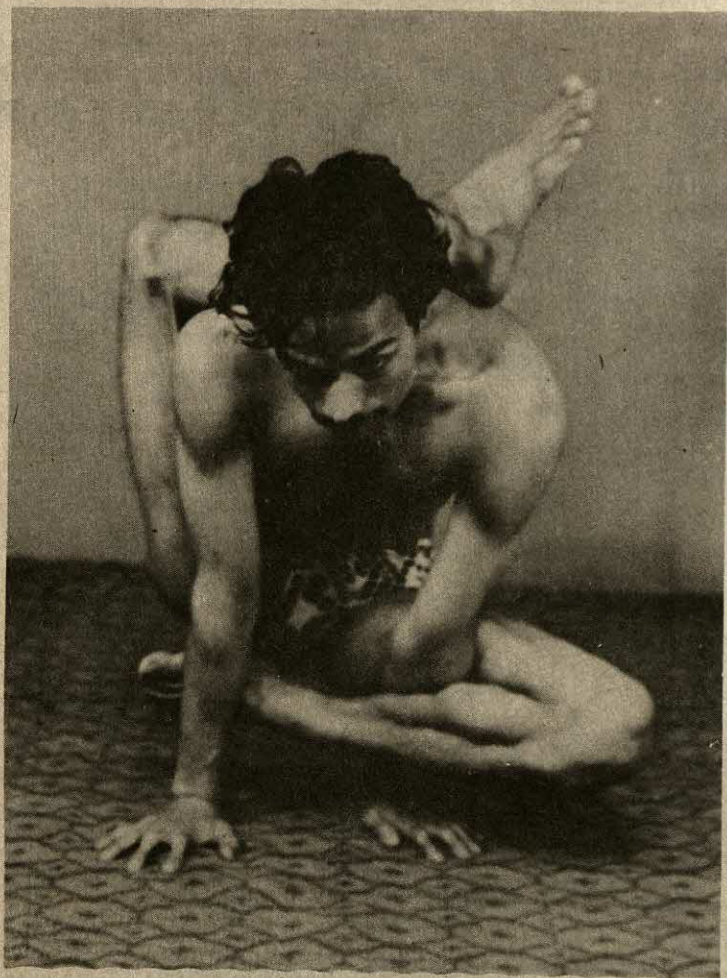
ওঁকারাসন—১(খ)

উপকারিতা—আসনটিতে দেহের সকল অংশের কম-বেশী উপকার হয়। বিশেষতঃ আসনটি অভ্যাসের ফলে পায়ের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

বৃশ্চিকাসন

প্রণালী—প্রথমে শলভাসনের ভঙ্গিমায় এস। হাত দু'টি দু'পাশে মেলে দাও। এবার পা দুটি আরো উঁচু করে এনে হাঁটু থেকে ভেঙে পায়ের পাতা মাথার দু'পাশে রেখে দাও। ছবি দেখ। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে ২০ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। তারপর হাত, বুক ও কোমরের উপর জোর রেখে পা দু'টি উচু করে মেঝেতে নামিয়ে নিয়ে এস ও উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। আসনটি ৩ বার অভ্যাস কর।

বৃশ্চিকাসন

উপকারিতা—দেখা যাচ্ছে আসনটিতে ঘাড়, কাঁধ, গলা, বুক, পিঠ, মেরুদণ্ড, পেট, বস্তিপ্রদেশ, নিতম্ব ও কোমরের উপর কি প্রচণ্ড চাপ পড়ছে—দেহে কি কোন রোগ আসতে পারে?

শীর্ষাসন

আসন অবস্থায় দেহের সমস্ত ভার মাথার উপর পড়ে, তাই আসনটির নাম শীর্ষাসন।

শীর্ষাসন—১(ক)
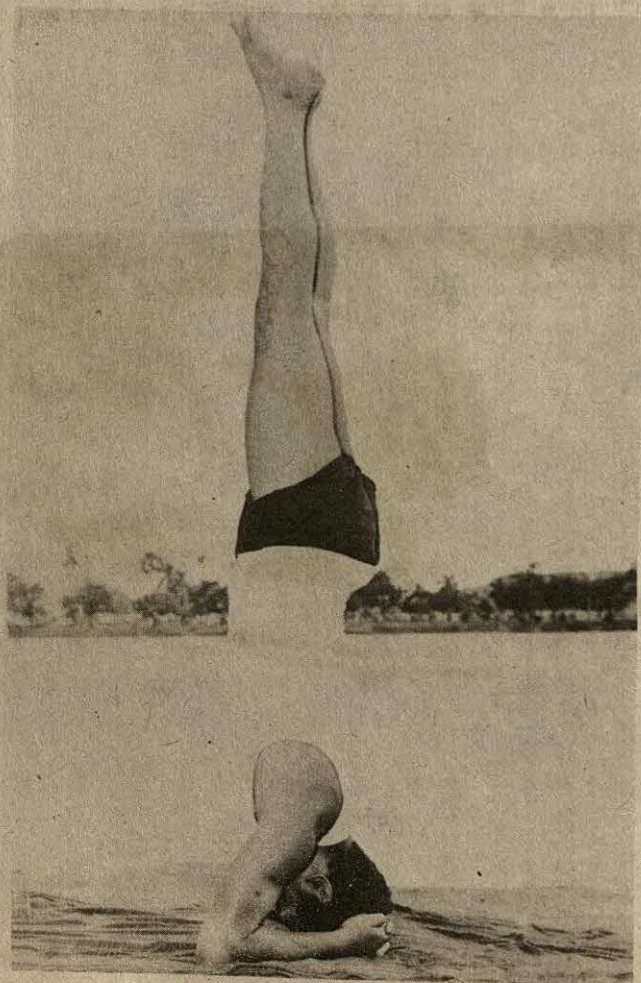
প্রণালী—পা মুড়ে হাঁটু গেড়ে বস। এবার মাথা নামিয়ে ব্রহ্মতালু হাঁটুর কাছে মাটিতে রাখ। দু'হাতের আঙুল পরস্পরের মধ্যে দৃঢ়ভাবে ধরে মাথার পিছনে ব্রহ্ম-

শীর্ষাসন—১(খ)
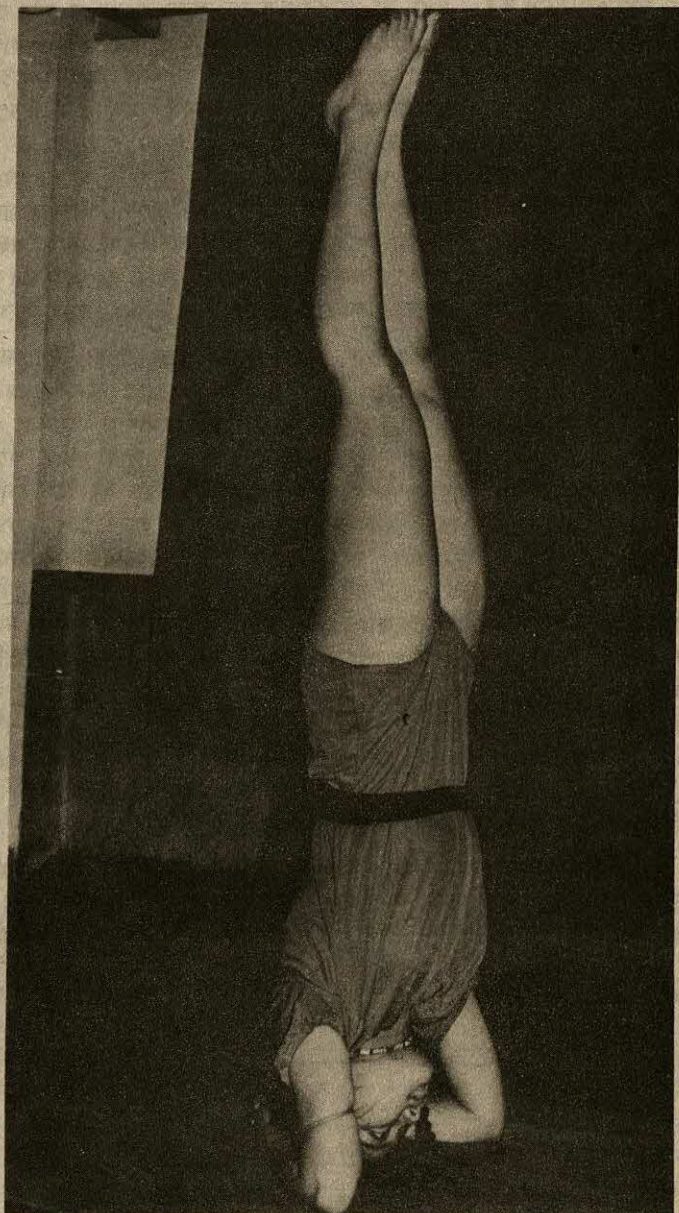
তালুর কিছু নীচে রাখ। দু'কনুই মাটিতে থাকবে। এবার মাথা ও কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে হাঁটু ভাঙা ও জোড়া অবস্থায় সোজা কর। তারপর আস্তে আস্তে পা দু'টি সম্পূর্ণ সোজা কর। প্রথম দু'একদিন যদি পা সোজা করতে না পার বা সোজা করে ধরে রাখতে না পার তবে হাঁটু ভাঙা অবস্থায় দু'চার দিন অভ্যাস কর, কিন্তু কোমর যেন না ভাঙে। প্রথমাবস্থায় দেওয়ালের ধারে আসনটি অভ্যাস করলে টাল সামলাতে সুবিধা হয়। আসন অবস্থায় দেহটি মাটির সঙ্গে ঠিক ৯০° ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি করবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ২০ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। অভ্যাস হয়ে গেলে সময় একটু বাড়িয়ে দেবে। তারপর আস্তে আস্তে পা নামিয়ে একটু সময় বস, পরে শবাসনে বিশ্রাম নাও। শীর্ষাসন অবস্থায় মাথা রক্তে প্লাবিত হয়। একটু বসে বিশ্রাম নিয়ে তারপর শবাসনে বিশ্রাম নিলে সহজে রক্ত চলাচলে স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। আসনটি সব আসন করার পর মাত্র একবার করা বাঞ্ছনীয়—কারণ রক্ত চলাচলের স্বাভাবিকতা ফিরে আসতে অনেক সময় লাগে।

উপকারিতা—আসন অবস্থায় হৃৎপিন্ড মাথার উপরে থাকে—শিরা, উপশিরা, ধমনী সব বিপরীতমুখী হয়। এতে সহজে হৃৎপিন্ড মস্তিষ্কে প্রচুর বিশুদ্ধ রক্ত পাঠাতে পারে। মস্তিষ্ক, গলদেশ রক্তে প্লাবিত হয়ে যায়। ফলে মাথায় ও গলদেশে অবস্থিত গ্রন্থিগুলি ও স্নায়ুজাল রক্ত থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে সুস্থ ও সক্রিয় থাকতে পারে। মাথার সমস্ত স্নায়ুজাল রক্তে প্লাবিত হয় বলে চোখ, কান, নাক ও দাঁতে সহজে কোন রোগ আক্রমণ করতে পারে না। লালা গ্রন্থির (স্যালভারী গ্রন্থি) নিঃসরণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে খাদ্যবস্তু সহজে হজম হয়—কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটফাঁপা প্রভৃতি রোগ হতে পারে না। থাইরয়েড্ গ্রন্থির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ফলে দেহের সমস্ত গ্রন্থি ও স্নায়ুজাল সুস্থ ও সক্রিয় থাকে। কোনদিন টন্‌সিলের দোষ হয় না। হৃৎপিন্ড আসন অবস্থায় কিছুক্ষণ মাধ্যাকর্ষণ থেকে অব্যাহতি পায়, ফলে তারও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। পিনিয়াল গ্রন্থি ও পিটুইটারী গ্রন্থি সুস্থ ও সক্রিয় থাকে, ফলে মনের শক্তি, স্মৃতিশক্তি, ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি পায়। দৃষ্টি-শক্তি হ্রাস, কর্ম-বিমুখতা, মাথাধরা, লিকুরিয়া, রক্তাল্পতা, অর্শ, একশিরা, হাঁপানি প্রভৃতি রোগ হতে পারে না। কোন স্ত্রী-ব্যাধি সহজে আক্রমণ করতে পারে না। এমন কি নিয়মিত আসনটি অভ্যাস রাখলে স্থানচ্যুত জরায়ু ঠিক জায়গায় ফিরে আসে।

নিষেধ—প্রাতঃক্রিয়াদি না করে, স্নান বা প্রাণায়াম করার ঠিক পরে অথবা কোন শ্রমসাধ্য ব্যায়ামের পর বিশ্রাম না নিয়ে শীর্ষাসন করা কখনও উচিত নয়। যাদের কোন হৃদ্‌রোগ বা রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ আছে, তাদের রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত এই আসনটি করা ঠিক নয়। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদেরও আসনটি করা উচিত নয়। আসনটি সন্ধ্যার সময় করলে বেশী উপকার পাওয়া যায়।

অষ্টম অধ্যায়

মুদ্রা

উড্ডীয়ান মুদ্রা

এই প্রক্রিয়াটি বুকের পাঁজর ও ডায়াফ্রাম উপরদিকে তুলে ধরে এবং তলপেট সঙ্কুচিত করে। তাই এর নাম উড্ডীয়ান। প্রক্রিয়াটি বসে ও দাঁড়িয়ে দু'ভাবে করা যায়।

প্রণালী—পদ্মাসনে বা সহজ আসনে বস। এবার দু'হাত দিয়ে দু'হাঁটু মাটির সঙ্গে চেপে রাখ অথবা পা দু'টি দেড় ফুটের মত ফাঁক করে দাঁড়াও। এবার একটু সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটু একটু ভেঙে হাত দু'টি উরুর উপর রাখ। ঘাড় ও কাঁধের মাংসপেশী দৃঢ় কর এবং দেহের মধ্য অংশের মাংসপেশী শিথিল করে দাও। এবার ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করে পেট একেবারে খালি করে দাও। দম বন্ধ কর। পেটের উপরিভাগ যতটা সম্ভব ভিতর দিকে টেনে নিয়ে যাও। বুকের পাঁজর ও ডায়াফ্রাম উপরে উঠে আসবে এবং তলপেট সঙ্কুচিত হবে। ভালভাবে অভ্যাস হয়ে গেলে প্রক্রিয়াটি করার সময় মনে হবে পেট-পিঠ এক হয়ে গেছে, পেট মেরুদণ্ডের সঙ্গে লেগে গেছে। ছবি দেখ। যতক্ষণ সহজভাবে পার ঐ অবস্থায় থাক। তারপর ঘাড় ও কাঁধের মাংসপেশী শিথিল করে ধীরে ধীরে দমভোর শ্বাস নাও। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিয়ে ১০ থেকে ১৫ বার প্রক্রিয়াটি কর। পদ্মাসনে বসে প্রক্রিয়াটি ঠিক একইভাবে করতে হবে, তবে পা বদল করে নেবে। মুদ্রাটি খালিপেটে করা উচিত।

উপকারিতা—উড্ডীয়ান তলপেট ও ডায়াফ্রামের একটি উত্তম ব্যায়াম বলা যেতে পারে। প্রক্রিয়াটিতে প্যানক্রীয়াস ও এ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির খুব ভাল ব্যায়াম হয়। প্রক্রিয়াটি অভ্যাস রাখলে কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, অম্লশূল, পিত্তশূল, অন্ত্রক্ষত প্রভৃতি রোগ কোনদিন হতে পারে না। উড্ডীয়ানে পেটের রেক্‌টাস নামক পেশীদ্বয় সতেজ ও দৃঢ় থাকে। উড্ডীয়ান ও নৌলী প্রক্রিয়ায় তলপেটের সমস্ত দেহযন্ত্রগুলি সবল ও সক্রিয় থাকে। ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্র সঙ্কুচিত হয়, ফলে অজীর্ণ ও সঞ্চিত খাদ্যাংশ ও মল সমস্তই মলনাড়ীতে চলে যায় এবং সহজে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়ে যায়। পেটে দূষিত বায়ু জমতে পারে না। প্রক্রিয়াটিতে ডায়াফ্রাম বিশেষভাবে ওঠা-নামা করে। ফলে ফুসফুস্ ও হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সহজে কোন স্ত্রী-ব্যাধি হয় না।

নিষেধ—যাদের হৃদ্‌রোগ, হার্ণিয়া, হাইড্রোসিল, একশিরা, এ্যাপেণ্ডিসাইটিস, অন্ত্রক্ষত প্রভৃতি রোগ আছে অথবা যাদের প্লীহা-যকৃৎ অস্বাভাবিক বড়, তাদের রোগ

উড্ডীয়ান মুদ্রা

নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি করা উচিত নয়। ১২ বছরের কম বয়সের ছেলে-মেয়েদেরও মুদ্রাটি করা উচিত নয়।

অশ্বিনী মুদ্রা

গরু, ছাগল, কুকুর প্রভৃতি জীব মলত্যাগ ক'রে মলদ্বার বার বার সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করে। এই প্রক্রিয়াকে অশ্বিনী মুদ্রা বলে।

প্রণালী—বজ্রাসন, গোমুখাসন বা বিপরীতকরণী মুদ্রা অবস্থায় শ্বাস নিতে নিতে মলদ্বার সংকুচিত কর আর শ্বাস ত্যাগ করতে করতে মলদ্বার শিথিল করে দাও। সহজভাবে সঙ্কোচন করার সময় মলদ্বার ভিতরদিকে আকর্ষণ করতে হবে। সহজভাবে যতটুকু সময় পার কর। অভ্যাস হয়ে গেলে, তিন মিনিট পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—অশ্বিনী মুদ্রা অভ্যাসে অর্শরোগ ভাল হয়, ধারণশক্তি বৃদ্ধি পায় ও মলদ্বারের পেশী দৃঢ় হয়।

শক্তিচালনী মুদ্রা

প্রণালী—পদ্মাসন, বজ্রাসন বা সহজ আসনে বস। দু'হাত দিয়ে দু' হাঁটু ধর। এবার শ্বাস নিতে নিতে মলদ্বার সংকুচিত করে তলপেট উপরদিকে টেনে তোল। এই টেনে তোলার বা কুঞ্চিত করার ফলে নাভিপ্রদেশ প্রায় মেরুদণ্ডের সঙ্গে লেগে যাবে। ঐ অবস্থায় যতক্ষণ সহজভাবে পার দম বন্ধ রাখ। তারপর আস্তে আস্তে শ্বাস-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তলপেট শিথিল করে দাও। এইভাবে মুদ্রাটি কুড়ি থেকে পঁচিশ বার কর।

উপকারিতা—মুদ্রাটিতে যৌনগ্রন্থির বিশেষ উপকার হয় এবং ধারণশক্তি, জীবনী-শক্তি, স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি পায়। জরাব্যাধির হাত থেকেও মুদ্রাটি দেহকে রক্ষা করে এবং সহজে কোন স্ত্রী-ব্যাধিও হয় না। ব্রহ্মচর্য-পালনে মুদ্রাটি বিশেষভাবে সাহায্য করে।

মহাবন্ধ মুদ্রা

জীবনীশক্তির প্রধান উৎস শুক্রধাতুর অপচয় বন্ধ ক'রে বলে এই প্রক্রিয়াটির নাম মহাবন্ধ মুদ্রা।

প্রণালী—পা ছাড়িয়ে সোজা হয়ে বস। এবার হাঁটু ভেঙে ডান পায়ের গোড়ালি যোনিমণ্ডলে এবং বাঁ পায়ের গোড়ালি ঠিক তার উপরে নাভিদেশে রাখ। হাত দু'টি দু' হাঁটুর উপর থাকবে। এখন শ্বাস নিতে নিতে মলদ্বার ও যোনিপ্রদেশ কুঞ্চিত করে উপরদিকে টেনে তোল বা আকর্ষণ কর। আকর্ষণের ফলে তলপেট কিছুটা মেরুদণ্ডের দিকে যাবে। তারপর শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আকুঞ্চন শিথিল করে দাও। দশ থেকে পনের বার এইভাবে আকুঞ্চন ও শিথিল কর।

উপকারিতা—মুদ্রাটি যৌনগ্রন্থিকে স্বাভাবিক ও সক্রিয় রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই গ্রন্থি সক্রিয় না থাকলে পুরুষের অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়, স্নায়বিক দৌর্বল্য, মাথাঘোরা, নানা রকম দৈহিক অক্ষমতা, অকালে দাড়ি-গোঁফ পাকা প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়। আর মেয়েদের, বিশেষভাবে নানা রকমের স্ত্রী-ব্যাধি দেখা দেয়। আবার গ্রন্থিটি অতিক্রিয় হলে পুরুষের চরিত্রে নানা প্রকার অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায় আর মেয়েদের রক্তচাপ কমে যায়, অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয়, বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। এমনকি জরায়ু স্থানচ্যুত হয়।

মহাবন্ধ মুদ্রা অভ্যাসে দেহ ও মন সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক থাকে।

মূলবন্ধ মুদ্রা

মূল শব্দের অর্থ আদি বা উৎপত্তিস্থল। আমাদের মেরুদণ্ড মস্তিষ্কের নিম্নাংশ থেকে বের হয়ে গুহ্যদেশে শেষ হয়েছে। নাভিপ্রদেশে কতকগুলো অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থি ও স্নায়ুতন্ত্র আছে। এই গ্রন্থিগুলি ও স্নায়ুকেন্দ্রগুলি মলমূত্রত্যাগ, সন্তান-প্রসব প্রভৃতি কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এই গ্রন্থিগুলির মধ্যে Kidney, পুরুষ-দেহের Testes, Prostrate gland, Cowper's gland এবং নারী-দেহের overy, Bertholin's gland and Skene's gland বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেহের এই অংশেই মূলাধার চক্র অবস্থিত। যে প্রক্রিয়ায় এই মূলস্থানের গ্রন্থি, স্নায়ু প্রভৃতি সুস্থ ও সক্রিয় থাকে, তাকে মূলবন্ধ মুদ্রা বলে।

প্রণালী—পদ্মাসনে বা যে কোন সহজ আসনে বস। এবার শ্বাস নিতে নিতে গুহ্যদেশ থেকে নাভিদেশ পর্যন্ত আকর্ষণ কর। আকর্ষণের সময় মলদ্বারও সংকুচিত হয়ে আসবে। শ্বাসত্যাগের সাথে সাথে আকুঞ্চন শিথিল করে দাও। সকাল-সন্ধ্যায় একবারে দশ বার করে মুদ্রাটি কুড়ি বার কর। প্রয়োজনমত শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—মুদ্রাটিতে বস্তিপ্রদেশের গ্রন্থি ও স্নায়ুতন্ত্রের খুব ভাল ব্যায়াম হয়। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ প্রভৃতি পেটের রোগ হয় না, জঠরাগ্নি বৃদ্ধি করে, ধারণ-শক্তি বৃদ্ধি পায়, কোনপ্রকার স্ত্রী-রোগ হয় না। এমন কি, বন্ধ্যাত্ব রোগও ভাল হয়ে যায়। মুদ্রাটি অভ্যাস রাখলে অর্শরোগ পর্যন্ত হয় না। ইন্দ্রিয় সংযম বা ব্রহ্মচর্য রক্ষায় মুদ্রাটি বিশেষভাবে সাহায্য করে।

মহামুদ্রা

মুদ্রাটি প্রায় জানুশিরাসনের মত। মহামুদ্রায় কপাল হাঁটুতে রাখতে হয় না, চিবুক বুক ও কণ্ঠনালীর সংযোগস্থলে লাগাতে হয়।

প্রণালী—সামনের দিকে পা ছড়িয়ে সোজা হয়ে বস। এবার ডান পা হাঁটু থেকে ভেঙে গোড়ালি যোনিমণ্ডলে রাখ। বাঁ পা সামনের দিকে ছড়ান থাকবে এবং মাটির সংগে লেগে থাকবে। এখন থুত্নি কণ্ঠকূপে রাখ, দু'হাত দিয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ধর। এবার আস্তে আস্তে দমভোর শ্বাস নিতে নিতে মলদ্বার সংকুচিত করে তলপেট ভিতরদিকে টেনে নিয়ে এস। শ্বাস না নেওয়া পর্যন্ত তলপেট আকুঞ্চিত এবং মলদ্বার সংকুচিত থাকবে। তারপর আস্তে আস্তে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে তলপেট ও মলদ্বার শিথিল করে দাও। হাত-পা বদল করে মুদ্রাটি দশ বার থেকে কুড়ি বার কর। দরকার মনে করলে শবসানে বিশ্রাম নেবে।

উপকারিতা—মহামুদ্রা অভ্যাসে অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অর্শরোগ ও যকৃতের দোষ দূর হয়। রক্তের সারাংশ শুক্র অপচয় বন্ধ হয়, তলপেট ও বস্তিপ্রদেশের সমস্ত গ্রন্থি এবং স্নায়ুতন্ত্রের ভাল ব্যায়াম হয়। কোন স্ত্রী-ব্যাধিও হয় না।

মহাবেধ মুদ্রা

প্রণালী—পদ্মাসনে বা সহজ আসনে সোজা হয়ে বস। এবার শ্বাস ত্যাগ করে দম বন্ধ কর। এখন মলদ্বার সংকুচিত করে এবং তলপেট কুঞ্চিত করে উপরদিকে টেনে তোল। সহজভাবে যতক্ষণ পার ঐ অবস্থায় থাক। তারপর শ্বাস নিতে নিতে আকুঞ্চন শিথিল করে দাও। দশ থেকে পনের বার প্রক্রিয়াটি কর। দরকার মনে করলে শবাসনে বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—মুদ্রাটিতে তলপেট ও বস্তিপ্রদেশের পেশী, গ্রন্থি ও স্নায়ুতন্ত্রের খুব ভাল ব্যায়াম হয়। দেহের যে অংশে যখন ব্যায়াম করা হয়, দেহের সেই অঞ্চলে তখন রক্ত প্লাবিত হয়—ফলে সেখানকার গ্রন্থি, স্নায়ুজাল তাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে সতেজ ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। অশ্বিনী মুদ্রা, শক্তিচালনী মুদ্রা, মূলবন্ধ মুদ্রা, মহামুদ্রা, মহাবেধ মুদ্রা প্রভৃতি সবগুলি মুদ্রাতেই তলপেট ও বস্তিপ্রদেশের গ্রন্থি, স্নায়ু, পেশী ও অন্যান্য দেহযন্ত্রগুলির কম-বেশী ব্যায়াম হয় এবং সবগুলিরই উপকারিতা প্রায় একই।

বিপরীতকরণী মুদ্রা

প্রণালী—সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়। হাত দু'টি পাঁজরের দু'পাশে মাটিতে রাখ। এবার পা দু'টি জোড়া ও সোজা অবস্থায় যতদূর পার মাথার উপরে তোল। হাত

বিপরীতকরণী মুদ্রা

দু'টি কনুই থেকে ভেঙে কোমরের দু'পাশে ধর। এখন কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে পা দু'টি আরো উপরে তুলে পায়ের পাতা মাথা বরাবর নিয়ে এস। হাত দিয়ে দেহের

নিম্নাংশ উপরদিকে ঠেলে ধরে রাখ। হাত দু'টি ঠিক গম্বুজের কাজ করবে। কোমর ভেঙে থাকবে, কিন্তু হাঁটু যেন না ভাঙে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ঐ অবস্থায় ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ থাক। তারপর আস্তে আস্তে পা নামিয়ে হাত আলগা করে বিশ্রাম নিয়ে আসনটি তিন বার কর। শবাসনে প্রয়োজনমতো বিশ্রাম নাও।

উপকারিতা—যোগশাস্ত্র মতে মুদ্রাটি 'বলি' ও 'পলি' থেকে দেহকে রক্ষা করে। 'বলি' অর্থ চর্মসঙ্কোচন আর 'পলি' অর্থ পক্ককেশ। অর্থাৎ মুদ্রাটি অভ্যাস রাখলে গায়ের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে না এবং চুল পাকে না—দেহে যৌবন অটুট থাকে। মুদ্রাটিতে থাইরয়েড্, প্যারাথাইরয়েড্, টন্‌সিল, স্যালভারী প্রভৃতি গ্রন্থির খুব ভাল কাজ হয়। ফলে দেহের সমস্ত দেহযন্ত্রগুলি সুস্থ ও সক্রিয় থাকে। দেহে সহজে কোন রোগ আক্রমণ করতে পারে না। মুদ্রা অবস্থায় হৃৎপিণ্ড মাথার উপরে থাকে। ফলে, হৃৎপিণ্ড সহজে প্রচুর বিশুদ্ধ রক্ত মস্তিষ্কে পাঠাতে পারে। পিনিয়াল গ্রন্থি, পিটুইটারী গ্রন্থি প্রয়োজনমত রক্ত থেকে পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করতে পারে। তাছাড়া হৃৎপিণ্ড কিছুক্ষণ মাধ্যাকর্ষণ থেকে মুক্তি পায়। ফলে, তারও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মুদ্রাটি হজমশক্তি বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্ল প্রভৃতি রোগ দূর করে, পেট ও তলপেটের পেশী দৃঢ় করে এবং ঐ অঞ্চলের স্নায়ুজাল সতেজ ও সক্রিয় রাখে। এতে পেট ও কোমরের অপ্রয়োজনীয় মেদও কমে যায়।

যোগমুদ্রা

যোগমুদ্রা—১(ক)

হাতের চেটো চিৎ করে কোলের উপর রাখ। এবার মাথা নুইয়ে কপাল মাটিতে রাখ। যারা খুব মোটা বা যাদের পেটে খুব চর্বি আছে, তারা মুদ্রাটি অন্যভাবে করতে পার।

দু'হাত কোলের উপর না রেখে পিছনদিকে নিয়ে যাও এবং একহাত দিয়ে আর এক হাতের কব্জি ধর। এবার আস্তে আস্তে মাথা নুইয়ে কপাল মাটিতে রাখ। উভয় প্রক্রিয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ২০ সেঃ থেকে ৩০ সেঃ ঐ অবস্থায় থাক। আস্তে আস্তে উঠে বসে পা আলগা করে বিশ্রাম নাও। পা বদল করে আসনটি চার বার অভ্যাস কর। প্রয়োজনমতো শবাসনে বিশ্রাম নাও।
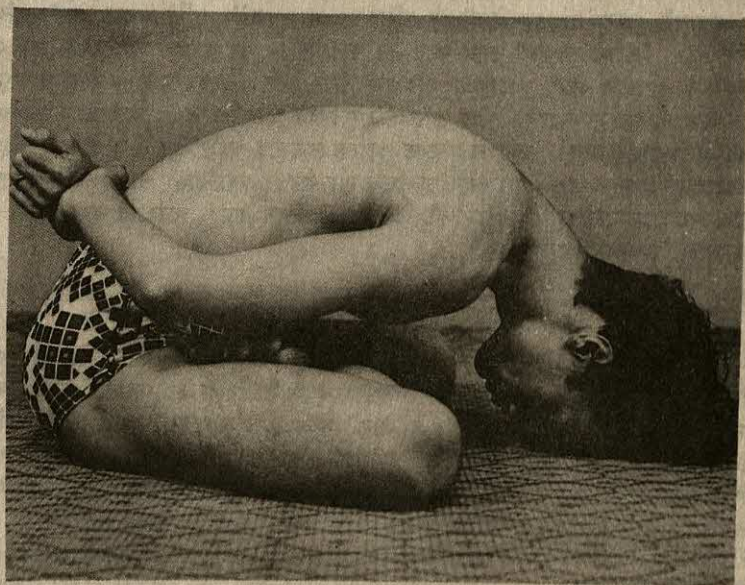
উপকারিতা—কোষ্ঠকাঠিন্য যত কঠিন বা যত পুরনো হোক না কেন, এই মুদ্রাটি নিয়মমত এবং নিয়মিত অভ্যাসে নিশ্চয়ই নিরাময় হবে। মুদ্রাটি দুর্বল, প্লীহা, যকৃৎ ও মূত্রাশয়কে সবল ও সক্রিয় করে, পেট-পিঠ-বস্তিদেশ ও পায়ের পেশীকে দৃঢ় করে এবং ঐ অঞ্চলের স্নায়ুজালকে সতেজ রাখে। মেয়েদের সন্তানপ্রসবের জন্য বা অন্য কোন কারণে যাদের তলপেটের পেশী শিথিল হয়ে পড়েছে, এই মুদ্রাটি অভ্যাস করলে অল্পদিনে তাদের শিথিল পেশী পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। তাছাড়া মুদ্রাটি অভ্যাস রাখলে পেট ও কোমরে অপ্রয়োজনীয় মেদ জমতে পারে না, কোন স্ত্রী-ব্যাধি সহজে আক্রমণ করতে পারে না।

নিষেধ—যাদের প্লীহা, যকৃৎ অস্বাভাবিক বড়, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত মুদ্রাটি তাদের করা উচিত নয়।

নৌলী

উড্ডীয়ান মুদ্রা ভালোভাবে অভ্যাস না হলে নৌলী করা যায় না। দাঁড়িয়ে নৌলী করা অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রক্রিয়াটিতে পেটের রেক্‌টাস নামক পেশীদ্বয় যুক্ত ও পৃথক-ভাবে সঞ্চালিত হয়। নৌলীতে পেশীদ্বয় ঠিকভাবে সঞ্চালিত হলে ঠিক ঢেউয়ের মত দেখায়।

প্রণালী—প্রথমে দাঁড়ানো উড্ডীয়ান ভঙ্গিমায় এস। হাঁটু দু'টি আরো একটু ফাঁক করে দাও। শ্বাস সম্পূর্ণ ত্যাগ করে দম বন্ধ কর। এবার রেক্‌টাস পেশীদ্বয়কে সঙ্কুচিত ও টেনে এনে তলপেটের মাঝখানে নিয়ে এস। তলপেটের মাঝখানটা দৃঢ় হবে এবং দু'ধার নরম হবে। এই প্রক্রিয়াটিকে মধ্যম নৌলী বলে। সহজভাবে যতক্ষণ পার ঐ অবস্থায় থাক। তারপর আস্তে আস্তে দমভোর শ্বাস নাও এবং দেহ শিথিল করে সোজা হয়ে দাঁড়াও। প্রক্রিয়াটিকে তিন বার কর। মধ্যনৌলী ভালোভাবে অভ্যাস হয়ে গেলে, বামনৌলী ও ডাননৌলী কিছুদিন অভ্যাস কর। তারপর বাম, ডান ও মধ্যনৌলী একসঙ্গে করবে।

বাম ও ডাননৌলী—

রেক্‌টাস পেশীদ্বয় পৃথকভাবে সঞ্চালিত করলে বাম ও ডাননৌলী হয়। যখন বাম রেক্‌টাসকে সংকুচিত করে ডান রেক্‌টাসকে স্ফীত করা হয়, তখন তাকে ডান-নৌলী বলে। ঐ অবস্থায় তলপেটের বাঁ ধারটা নরম ও নীচু থাকবে। আবার ঐ একই-ভাবে বাঁ রেক্‌টাসকে ফুলিয়ে তুললে বামনৌলী বলা হয়। বাম ও ডাননৌলী দু'বার ক'রে চার বার করবে। বাম, ডান ও মধ্যম নৌলী ভালভাবে অভ্যাস হয়ে গেলে তিনটি একসঙ্গে তিন বার ক'রে নয় বার করবে।

উপকারিতা—উড্ডীয়ান মুদ্রার সবগুণ নৌলীতে বর্তমান। অল্পসময়ে আরো ভাল ফল পাওয়া যায়। মুদ্রাটি অভ্যাস রাখলে একশিরা, হার্ণিয়া, হাইড্রোসিল্ ও কোন রকম স্ত্রী-ব্যাধি কোনদিন হতে পারে না। মেয়েদের গর্ভাশয়ের দোষ-ত্রুটি ও ঋতু-কালীন অনিয়ম মুদ্রাটি অল্পদিন অভ্যাসে স্বাভাবিক হয়ে আসে।

নবম অধ্যায়

প্রাণায়াম

যে প্রক্রিয়ায় দেহের প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং জরা, ব্যাধি ও অকালমৃত্যু থেকে দেহকে রক্ষা করে, তারই নাম প্রাণায়াম। প্রাণের আয়াম অর্থাৎ প্রাণের দীর্ঘতাই প্রাণায়াম।

যোগশাস্ত্রে বহু প্রকার প্রাণায়াম আছে। সাধারণের পক্ষে উপযোগী এবং হিতকর কতকগুলো সহজ প্রাণায়াম এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। যেহেতু, প্রাণায়ামের কাজ হলো বায়ুকে অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করে দেহের প্রাণশক্তিকে বৃদ্ধি করা, সেইহেতু প্রাণায়াম অভ্যাসকারীদের বায়ু সম্বন্ধে মোটামুটি একটু জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

বায়ুই দেহের প্রাণশক্তি, এবং রস-রক্তকে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিচালিত করে। বায়ু প্রধানতঃ 'প্রাণ', 'উদান', 'সমান', 'অপাণ' ও 'ব্যাণ'—এই পাঁচ ভাগে ভাগ হয়ে দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ত কাজ করে চলেছে। যেমন গলদেশে 'উদান', হৃদয়ে 'প্রাণ', নাভিদেশে 'সমান', গুহ্যদেশে 'অপাণ' এবং দেহের সর্বত্র 'ব্যাণ' কাজ করে যাচ্ছে। পাঁচ প্রকার বায়ুর মধ্যে সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো 'প্রাণ' বায়ুর। শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ, হৃদ্‌যন্ত্র পরিচালনা করা, খাদ্যবস্তুকে পাকস্থলীতে পাঠানো, ধমনী, শিরা, উপশিরা দিয়ে রক্তরস আনা-নেওয়া করা, ধমনী, শিরা, উপশিরা, স্নায়ুজালকে কাজে প্রবৃত্ত ও সাহায্য করা প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলি নিয়ত এই প্রাণবায়ু করে চলেছে। কাজেই দেহে প্রাণবায়ুর ভূমিকা প্রধান বলা যেতে পারে। 'উদান' বায়ুর কাজ হচ্ছে শব্দ করা এবং এই বায়ুর সূক্ষ্মাংশ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তিকে পুষ্ট করে। 'উদান' বায়ুর সাহায্যে আমরা হাসি, কাঁদি, গান করি, শব্দ করি ইত্যাদি। 'সমান' বায়ু আমাদের জঠরাগ্নিকে উদ্দীপ্ত করে, পাকস্থলী থেকে আধাজীর্ণ খাদ্যবস্তুকে গ্রহণী নাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। তারপর সার ও অসার অংশকে ভাগ করে অসার অংশকে মলনাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। 'আপন' বায়ুর কাজ হচ্ছে প্রাণবায়ুকে সাহায্য করা এবং মেয়েদের রজঃনিঃসরণ, সন্তানধারণ ও সন্তানপ্রসবে সাহায্য করা ইত্যাদি। 'ব্যাণ' বায়ুর কাজ হচ্ছে প্রাণবায়ুকে রক্ত পরিচালনায় সাহায্য করা, পেশী সঙ্কোচন ও প্রসারণে সাহায্য করা এবং দেহ থেকে ঘাম বের করে দেওয়া।

এই পাঁচটি বায়ুর একটি কুপিত হলে দেহে রোগাক্রমণ ঘটে—আসে মৃত্যুর হাতছানি।

যোগশাস্ত্র মতে বায়ু-গ্রহণকে 'পূরক', ধারণকে 'কুম্ভক' এবং ত্যাগকে 'রেচক' বলা হয়। এই তিন প্রকার কাজকে একসঙ্গে বলা যেতে পারে প্রাণায়াম। আমরা শ্বাস গ্রহণ করতে সাধারণত যে সময় নিই শ্বাস ত্যাগ করতে প্রায় তার দ্বিগুণ সময় নিই। তাই একটু সময় নিয়ে পূরক, কুম্ভক ও রেচকের আলোচনা করা উচিত। এ বিষয়ে নানা জনের নানা মত। অনেকে বলেছেন পূরক, কুম্ভক ও রেচকের অনুপাত ১ : ২ : ২ হওয়া উচিত। আবার অনেকে বলেছেন ২ : ১ : ২ হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্বাসক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ বহু অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। কেউ যদি এক মিনিটকাল কুম্ভক করতে

পারে এবং তা যদি আয়াসহীন ও সুখকর হয়, তবে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। পূরক, কুম্ভক, রেচক যত সময় নিয়ে করা যাক না কেন, আয়াসহীন হওয়া চাই। শরীরের ক্ষতি তখনই হয়, যখন জোর করে ফুস্ফুসের শক্তির বিচার না করে শ্বাস-ব্যায়াম করা হয়। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন প্রাণায়াম কতক্ষণ করা যেতে পারে? উত্তরে বলা যায়, যতক্ষণ ফুস্ফুস্ ক্লান্ত না হয়। যখন দেখা যায়, সে আর অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে পারছে না, তখন আর প্রাণায়াম করা উচিত নয়।

বায়ুর প্রধান উপাদান চারটি (১) অক্সিজেন, (২) হাইড্রোজেন, (৩) নাইট্রোজেন এবং (৪) কার্বন। ফস্ফরাস্, সাল্ফার প্রভৃতি আরও কয়েকটি উপাদান আছে। সেগুলোও মূলত বায়ুরই পরিণতি। শ্বাসের সঙ্গে আমরা যে পরিমাণ বায়ু দেহে গ্রহণ করি, তা ঠিকমত কাজে লাগাতে বা দেহ উপাদানে পরিণত করতে পারলে, আমাদের খাদ্য-সমস্যা অনেকটা মিটে যেত। তাইতো অনেক যোগী দিনের পর দিন কোন খাবার না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারেন। আমরা সাধারণ মানুষ একদিন না খেলেই আমাদের মাথা ঘুরতে আরম্ভ করে। আধুনিক দেহ-বিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের দেহের শতকরা বাষট্টি ভাগ অক্সিজেন দ্বারা গঠিত। শ্বাসের সঙ্গে আমরা যে বায়ু গ্রহণ করি এবং তাতে যে শতকরা একুশ ভাগ অক্সিজেন থাকে তার মাত্র চার ভাগ আমরা দেহের কাজে লাগাতে পারি। বাকী প্রায় সতের ভাগ আবার নিঃশ্বাসের সঙ্গে দেহ থেকে বের হয়ে যায়। এই অভাব খাদ্যবস্তু দ্বারা আমাদের পূরণ করতে হয়।

আমরা যদি এমন কিছু প্রক্রিয়া অভ্যাস করতে পারি, যার দ্বারা প্রচুর পরিমাণে বায়ু শরীরের ভেতরে নিতে পারি এবং তা দেহোপযোগী উপাদানে পরিণত করতে পারি, তবে খাদ্য-সমস্যা অনেকটা মিটে যায়। আবার আমরা যদি গভীরভাবে রেচক করতে পারি অর্থাৎ নিঃশ্বাস ছাড়তে পারি, তবে দেহের অপ্রয়োজনীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড্ বের হয়ে যেতে পারে এবং দেহও বিষমুক্ত হয়। একমাত্র প্রাণায়াম দ্বারাই এই কাজগুলি করা যেতে পারে। তাই প্রাণায়ামকে উত্তম শ্বাস-ব্যায়াম বলা হয়। এতে ফুস্ফুস্ ও হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, প্রাণায়াম অভ্যাস দীর্ঘ ও কর্মক্ষম জীবন লাভের একটি উৎকৃষ্ট উপায়।

আমাদের দেহ-কারখানায় যেসব যন্ত্র আছে, সেগুলো ঠিকভাবে কাজ করলেই একমাত্র সুস্বাস্থ্য লাভ করা যায়। হৃদ্‌যন্ত্র, স্নায়ু, গ্রন্থি, ধমনী, শিরা, উপশিরা প্রভৃতি যদি যথাযথভাবে কাজ করে, তবেই স্বাস্থ্য ভাল রাখা সম্ভব। স্বাস্থ্য রক্ষায় স্নায়ু-জাল এক বিরাট ভূমিকা নিয়ে আছে। কারণ শ্বাস-প্রশ্বাস, পরিপাক, রস-রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতি কাজ স্নায়ুজালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই বলে নালীহীন গ্রন্থিগুলির ভূমিকা দেহে কোন অংশে কম নয়। নালীহীন গ্রন্থিনিঃসৃত রস দেহকে রোগাক্রমণ থেকে রক্ষা করে, দেহযন্ত্রগুলিকে সুস্থ ও সক্রিয় রাখে এবং শক্তি যোগায়। এই গ্রন্থিগুলি যদি প্রয়োজনমত রস নিঃসরণ না করতে পারে, তবে অন্যান্য দেহযন্ত্রগুলির মত স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তা একদিন অকেজো হয়ে যায়। তাই নালীহীন গ্রন্থির সক্রিয়তার উপর স্নায়ুতন্ত্রের কর্মক্ষমতা নির্ভর করে।

আবার অক্সিজেনযুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু ও রক্ত ছাড়া নালীহীন গ্রন্থি ও স্নায়ুমণ্ডলী সতেজ ও সক্রিয় থাকতে পারে না। শ্বাসযন্ত্র যদি ঠিকমত কাজ না করে, তবে আবশ্যকীয় অক্সিজেন ফুস্ফুসে যেতে পারে না, আর দেহের কার্বন ডাই-অক্সাইড,

ইউরিয়া প্রভৃতি বিষও বের হয়ে যেতে পারে না। শ্বাসযন্ত্র এবং পরিপাকযন্ত্র কর্মক্ষম না থাকলে, দেহে এই সব বিষ জমতে আরম্ভ করে। ফলে, এক এক করে দেহযন্ত্রগুলি বিকল হয়ে আসতে থাকে। তাছাড়া, দেহে সবসময় কার্বোলিক এ্যাসিড প্রস্তুত হচ্ছে। এই এ্যাসিডের বেশীর ভাগ দেহের কাজে লাগে না। রক্তবাহী-শিরা-উপশিরা এই বিষ ফুস্ফুসে টেনে আনে এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে বের হয়ে যায়। তেমনি মূত্রাশয় ও মলনাড়ী দেহের বিষ ও অসার পদার্থ বের করে দেয়।

মূত্রাশয় ও মলনাড়ী তলপেটে এবং ফুস্ফুস্ ও হৃৎপিণ্ড বুকে অবস্থিত। মাঝে রয়েছে শক্ত পেশীর দেওয়াল 'ডায়াফ্রাম'। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই এই ডায়াফ্রামের যে উত্থান-পতন হয় এবং তলপেটের পেশীসমূহের যে সঙ্কোচন ও প্রসারণ হয়, তদ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয়, ক্ষুদ্রান্ত্র প্রভৃতিতে মৃদু কম্পন ও ঘর্ষণ লাগে। ফলে, ঐ সব যন্ত্রগুলির ভালো ব্যায়াম হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রাণায়াম শ্বাসযন্ত্র থেকে আরম্ভ করে দেহের প্রধান প্রধান যন্ত্রগুলি সবল ও সক্রিয় রাখে। তাছাড়া, আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এত অনিয়মিত যে ফুস্ফুস্ ঠিকমত সবখানি উঠানামা করে না। ফলে, ফুস্ফুসের ঠিক প্রয়োজনমত ব্যায়াম হয় না। ফুস্ফুস্ আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে আসতে থাকে। শ্বাসগ্রহণের সময় রোগ-জীবাণু ঐ দুর্বল ফুস্ফুসে গিয়ে বাঁসা বাঁধার সুযোগ পায়। ফলে, দেহে যক্ষ্মা, হাঁপানী প্রভৃতি নানা দুরারোগ্য রোগ দেখা দেয়। প্রাণায়াম অভ্যাসে ফুসফুস্ ও হৃৎপিণ্ডের খুব ভাল ব্যায়াম হয়। ফলে, শ্বাসযন্ত্র সবল ও সুস্থ থাকে আর তাদের কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। প্রাণায়াম অভ্যাসকারীদের নিম্নলিখিত বিধিনিষেধগুলি যতদূর সম্ভব মেনে চলা উচিত।

১। সকাল বা সন্ধ্যায় নির্মল বায়ুতে প্রাণায়াম অভ্যাস করা বাঞ্ছনীয়। তবে, কলকাতার মত বড় বড় শহরে সন্ধ্যায় বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া সম্ভব নয়, তাই সকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রাণায়াম অভ্যাস করা ভাল।

২। প্রাতঃক্রিয়াদির পূর্বে, স্নানের পরে অথবা কোন শ্রমসাধ্য কাজের বা ব্যায়ামের ঠিক পরে প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত নয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তবে তা করা যেতে পারে।

৩। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় প্রাণায়াম করা বাঞ্ছনীয় নয়। কফ্প্রধান ব্যক্তির রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত প্রাণায়াম করা নিষেধ। তবে, রোদ উঠলে করা যেতে পারে।

৪। ভরপেটে আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম কোনটাই করা উচিত নয়। আসন ও মুদ্রা প্রায় খালিপেটে করাই ভাল।

৫। শীর্ষাসনের পরে যেমন আর কোন আসন করা ঠিক নয়, তেমনি প্রাণায়ামের পরে তখনকার মত আর কোন ব্যায়াম করা উচিত নয়।

৬। প্রাণায়াম আট-নয় বছর বয়স থেকে আজীবন করা যেতে পারে। তবে অধিক বয়সে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

৭। তাড়াহুড়ো করে, চিন্তাযুক্ত মন নিয়ে প্রাণায়াম, আসন, মুদ্রা কোনটাই করা ঠিক নয়। মন শান্ত, ধীর ও চিন্তাশূন্য রাখতে হবে। আসন ও মুদ্রার মত প্রাণায়াম অভ্যাসের সময়ও একাগ্রতা থাকা দরকার।

কয়েকটি সাধারণ প্রাণায়াম

১। **প্রণালী**—পদ্মাসনে বা সহজ আসনে মেরুদণ্ড সোজা করে বস। এবার উভয় নাক দিয়ে সশব্দে দমভোর শ্বাস গ্রহণ কর। বায়ুগ্রহণ শেষ হলে, চিবুক কণ্ঠকূপে রাখ। এখন উভয় নাক দিয়ে ধীরে ধীরে এবং সজোরে শ্বাস ত্যাগ কর। চিবুক উঁচু কর এবং শ্বাস গ্রহণ কর। আবার চিবুক কণ্ঠকূপে রেখে শ্বাস ত্যাগ কর। সহজভাবে দু' মিঃ থেকে চার মিঃ বা যতটুকু পার কর। ভালোভাবে অভ্যাস হয়ে গেলে, শ্বাসগ্রহণের সময়ের চেয়ে শ্বাসত্যাগের সময় একটু বেশী নেবে—অর্থাৎ পূরকের সময় অপেক্ষা রেচকের সময় একটু বেশী নেবে।

উপকারিতা—প্রাণায়ামটিতে ফুস্‌ফুসের খুব ভাল কাজ হয়, সর্দি-কাশি ভালো করে। প্রাণায়ামটি অভ্যাস রাখলে, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড্, নিউমোনিয়া প্রভৃতি কঠিন রোগ পর্যন্ত হতে পারে না।

২। **প্রণালী**—পদ্মাসনে বা সহজ আসনে সোজা হয়ে বস। এবার উভয় নাক দিয়ে দমভোর শ্বাস গ্রহণ কর। শ্বাসগ্রহণ শেষ হলে মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে অথচ গভীরভাবে অবিচ্ছিন্ন জলধারার মতো শ্বাস ত্যাগ কর। এইভাবে নাক দিয়ে পূরক এবং মুখ দিয়ে রেচক দু' মিঃ থেকে পাঁচ মিঃ অভ্যাস কর।

উপকারিতা—প্রাণায়ামটি ফুস্‌ফুসের সঞ্চিত ধূলা-ময়লা পরিষ্কার করে। ফলে, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ ফুস্‌ফুস্‌কে সহজে আক্রমণ করতে পারে না। পাকস্থলী ও যকৃৎকে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। প্রাণায়ামটি অভ্যাস রাখলে খোস, পাঁচড়া, ফোঁড়া প্রভৃতি রোগ হতে পারে না, আর দেহে এ সব রোগ থাকলে, অল্পদিন অভ্যাসে তা ভাল হয়ে যায়।

৩। **প্রণালী**—পদ্মাসন, বজ্রাসন বা সহজ আসনে বস। উভয় নাক দিয়ে দমভোর শ্বাস গ্রহণ কর। শ্বাসগ্রহণ শেষ হলে, মুখ ও ঠোঁট পাখীর ঠোঁটের মত ছোট করে সজোরে এবং থেমে থেমে শ্বাস ত্যাগ কর। অল্প বায়ু ত্যাগ করে একটু থাম—আবার অল্প বায়ু ত্যাগ কর। এ-ভাবে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে দু' মিঃ থেকে তিন মিঃ প্রক্রিয়াটি অভ্যাস কর।

উপকারিতা—প্রাণায়ামটিতে অন্যান্য উপকারের সঙ্গে মুখের পক্ষাঘাতজাতীয় রোগ এবং মুখের রোগবীজাণু দূর হয় ; শ্বাসনালী সতেজ ও সুস্থ থাকে।

শীতলী

এ-প্রক্রিয়াটিতে দেহ শীতল হয়, তাই এর নাম শীতলী।

৪। **প্রণালী**—পদ্মাসনে বা সহজ আসনে শিরদাঁড়া সোজা করে বস। এবার মুখ ও ঠোঁট পাখীর ঠোঁটের মত করে জিহ্বাগ্র মুখ ও ঠোঁটের সঙ্গে লাগাও বা জিহ্বাগ্র মুখের একটু বাইরে নিয়ে এস। এবার সজোরে এবং ধীরে ধীরে দমভোর শ্বাস গ্রহণ কর। তারপর ধীরে ধীরে দু'নাক দিয়ে শ্বাস ত্যাগ কর। দু' মিঃ থেকে পাঁচ মিঃ প্রক্রিয়াটি অভ্যাস কর।

উপকারিতা—যারা পিত্তরোগী, যাদের গায়ে, হাতে, পায়ে মাঝে মাঝে জ্বালা বোধ

হয়, তাদের পক্ষে এই প্রাণায়ামটি বিশেষ উপকারী। প্রাণায়ামটি অভ্যাস রাখলে শরীরে রক্ত বিশুদ্ধ থাকে—কোনদিন কোনপ্রকার চর্মরোগ হয় না।

নিষেধ—ঠান্ডা আবহাওয়ায় বা শীতকালে সূর্য না ওঠা পর্যন্ত প্রাণায়ামটি করা নিষেধ। কফপ্রধান ব্যক্তিরও প্রাণায়ামটি করা উচিত নয়।

৫। **প্রণালী**—পদ্মাসনে বা সহজ আসনে সোজা হয়ে বস। এবার দু' হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে দু'কানের ছিদ্র বন্ধ কর এবং অপর আঙুলগুলি কপালে রাখ। বাইরের কোন শব্দ যেন কানে না আসে। এখন উভয় নাক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ কর। শ্বাসগ্রহণ শেষ হলে, যতক্ষণ সহজভাবে পার দম বন্ধ রাখ। তারপর উভয় নাক দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ কর। তিন মিঃ থেকে ছয় মিঃ প্রক্রিয়াটি অভ্যাস কর।

উপকারিতা—প্রক্রিয়াটি প্রাণায়ামের অন্যান্য উপকারের সঙ্গে মনস্থির ও মনোবল দৃঢ় রাখতে সাহায্য করে।

৬। **প্রণালী**—পদ্মাসনে বা সহজ আসনে সোজা হয়ে বস। এবার উভয় নাক দিয়ে দমভোর শ্বাস গ্রহণ কর। মাথা নত করে চিবুক কণ্ঠকূপে রাখ। যতক্ষণ সহজভাবে পার দম বন্ধ করে রাখ। এই সময় দৃষ্টি দু'ভুরুর ঠিক মাঝখানে নিবদ্ধ রেখে কোন দেবতার মূর্তি বা যে-কোন বিষয় একাগ্র মনে চিন্তা করতে হবে। তারপর, উভয় নাক দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ কর। ভালোমতো অভ্যাস হয়ে গেলে, কুম্ভকের সময় অর্থাৎ বায়ুধারণ সময় একটু একটু বাড়িয়ে দেবে। তিন মিঃ থেকে পাঁচ মিঃ প্রক্রিয়াটি অভ্যাস কর।

উপকারিতা—প্রাণায়ামের অন্যান্য উপকারের সঙ্গে প্রক্রিয়াটিতে মনস্থির ও মনোবল দৃঢ় করতে সাহায্য করে।

৭। **প্রণালী**—পদ্মাসনে বা সহজ আসনে শিরদাঁড়া সোজা করে বস। এবার ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ডান নাকের ছিদ্র বন্ধ কর। হাতের অপর আঙুলগুলি মুঠি করে রাখতে পার। এখন বাঁ নাক দিয়ে ধীরে ধীরে দমভোর শ্বাস গ্রহণ কর। শ্বাস নেওয়া শেষ হলে, একইভাবে বাঁ নাকের ছিদ্র বন্ধ করে ডান নাক দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ কর। অভ্যাস হয়ে গেলে, রেচকের সময় অর্থাৎ শ্বাস ত্যাগের সময় একটু বেশী নেবে। নাক বদল করে তিন মিঃ থেকে ছয় মিঃ প্রক্রিয়াটি অভ্যাস কর।

উপকারিতা—প্রাণায়ামটি বিশেষভাবে দেহে প্রাণশক্তি বৃদ্ধি করে, সর্দি-কাশির দোষ নষ্ট করে এবং দেহ থেকে রোগবিষ টেনে এনে বের করে দেয়।

৮। **প্রণালী**—পদ্মাসনে বা সহজ আসনে সোজা হয়ে বস। এবার শ্বাস ত্যাগ করে উদর বায়ুশূন্য কর। শ্বাস ত্যাগ শেষ হলে, শ্বাসগ্রহণ বন্ধ রেখে পেট ও তলপেট আকুঞ্চিত করে মেরুদণ্ডের সঙ্গে লাগাতে চেষ্টা কর। পেটের পেশীতে যেন হঠাৎ টান না পড়ে। যতক্ষণ সহজভাবে পার দম না নিয়ে ঐ অবস্থায় থাক। তারপর ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে নিতে পেট ও তলপেট শিথিল করে দাও।

উপকারিতা—প্রাণায়ামটি বিশেষভাবে হজমশক্তি বৃদ্ধি করে—যাবতীয় পেটের রোগ দূর করে ; প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয়, অগ্ন্যাশয়, যৌনগ্রন্থি প্রভৃতি সুস্থ ও সক্রিয় রাখে। প্রাণায়ামটি নিয়মিত অভ্যাস করলে, পেট ও তলপেটের পেশী দৃঢ় হয় এবং

ঐ অঞ্চলের স্নায়ুজাল সতেজ ও সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। পেট এবং বস্তিদেশের অপ্রয়োজনীয় মেদ কমাতেও প্রাণায়ামটির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।

৯। **প্রণালী**—পদ্মাসনে বা সহজ আসনে সোজা হয়ে বস। এবার উদর বায়ু-শূন্য কর। শ্বাসত্যাগ শেষ হলে, উভয় নাক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ করতে করতে পেট ও তলপেট সাধ্যমতো মেরুদণ্ডের সঙ্গে লাগাতে চেষ্টা কর। আকুঞ্চনের সময় যেন উদরের পেশীতে হঠাৎ টান না পড়ে। শ্বাস যতক্ষণ না টানবে, উদর ও তলপেট ততক্ষণ আকুঞ্চিত করে রাখবে। তারপর ধীরে ধীরে শ্বাসত্যাগের সঙ্গে আকুঞ্চন শিথিল করে দাও। প্রক্রিয়াটি তিন মিঃ থেকে পাঁচ মিঃ অভ্যাস কর।

উপকারিতা—আট নম্বরের অনুরূপ।

১০। **প্রণালী**—পদ্মাসনে বা সহজ আসনে সোজা হয়ে বস। এবার দমভরে শ্বাস নিতে নিতে নাভিপ্রদেশ ভিতরদিকে টেনে নাও। শ্বাস নেওয়া শেষ হলে, নাক বন্ধ করে, মুখ দিয়ে ফুঁ দিয়ে, শ্বাস ত্যাগ কর এবং নাভিপ্রদেশ শিথিল করে দাও। প্রক্রিয়াটি চার মিঃ থেকে ছয় মিঃ অভ্যাস কর।

উপকারিতা—প্রাণায়ামটি বিশেষভাবে জঠরাগ্নি বৃদ্ধি করে, পেটের যাবতীয় রোগ দূর করে, পেট ও তলপেটের মাংসপেশী দৃঢ় করে, ঐ অঞ্চলের স্নায়ুজাল সক্রিয় রাখে, প্লীহা, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, মূত্রাশয়, যৌনগ্রন্থি প্রভৃতি সুস্থ ও সক্রিয় রাখে। যাদের নাক-মুখ দিয়ে গরম হাওয়া বের হয়, রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, তাদের এই প্রাণায়াম করা অবশ্য কর্তব্য। প্রাণায়ামটিতে দেহের কুপিত বায়ু সহজে বের হয়ে যায়।

১১। **প্রণালী**—সোজা হয়ে দাঁড়াও। এবার বাম বুকের উপর বাঁ হাত এবং ডান বুকের উপর ডান হাত রাখ। কনুই দু'টি যথাসাধ্য পিছনদিকে ভেঙে রাখ। এখন উভয় নাক দিয়ে ধীরে ধীরে অথচ গভীরভাবে শ্বাস নাও। যতক্ষণ শ্বাস নেবে, ততক্ষণ বুক ও হাতের পেশী ও স্নায়ু সটান থাকবে। তারপর, ধীরে ধীরে শ্বাস-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ঐগুলি শিথিল করে দাও। প্রক্রিয়াটি দু' মিঃ থেকে চার মিঃ কর।

উপকারিতা—প্রাণায়ামের অন্যান্য উপকারের সঙ্গে সঙ্গে প্রক্রিয়াটি বুকের গড়ন সুঠাম ও সুন্দর করে। যাদের বয়স অনুযায়ী বুক সরু বা অপরিণত, তাদের এই প্রাণায়ামটি অবশ্যই করা উচিত।

১২। **প্রণালী**—সোজা হয়ে দাঁড়াও। পা দু'টি জোড়া থাকবে। এবার হাত দু'টি কাঁধ বরাবর উপরে তোল। এখন শ্বাস ত্যাগ করতে করতে একটু নত হয়ে দু' হাত দিয়ে দু' হাঁটু স্পর্শ কর। শ্বাসত্যাগও শেষ হবে আর হাতও হাঁটুতে লাগবে। তারপর শ্বাস নিতে নিতে সোজা হয়ে দাঁড়াও। শ্বাস নেওয়াও শেষ হবে এবং সেই সঙ্গে দেহটিও সোজা হবে। পাঁচ মিঃ থেকে দশ মিঃ প্রক্রিয়াটি কর।

উপকারিতা—প্রাণায়ামটিতে বিশেষভাবে ফুস্‌ফুসের বায়ুধারণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধ করে।

১৩। **প্রণালী**—সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়। পা দু'টি জোড়া থাকবে। হাত দু'টি পাঁজরের দু'পাশে লম্বা করে রাখ। এবার ধীরে ধীরে অথচ গভীরভাবে শ্বাস নিতে নিতে হাত দু'টি উপরদিকে তোল এবং মাথার পিছনদিকে নিয়ে মাথার দু'পাশে

লম্বা করে মাটিতে রাখ। শ্বাস নেওয়াও শেষ হবে আর হাত দ্‌'টি মাথার পিছনে মাটিতে লাগবে। তারপর শ্বাস ত্যাগ করতে করতে হাত দ্‌'টি প্‌র্বাবস্থায় মাটিতে রাখ। শ্বাসত্যাগও শেষ হবে, হাত দ্‌'টিও প্‌র্বাবস্থায় মাটিতে আসবে। চার মিঃ থেকে ছয় মিঃ প্রক্রিয়াটি অভ্যাস কর।

এবার হাতকে বিশ্রাম দিয়ে, পা দ্‌'টি অভ্যাস কর। প্রথমে শ্বাস নিতে নিতে ডান পায়ের হাঁট্‌ সোজা অবস্থায় যতদ্‌র পার, উপরে তোল, তারপর শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পা প্‌র্বাবস্থায় নিয়ে যাও। এরপর বাঁ পা একইভাবে অভ্যাস কর। পা বদল করে, দ্‌ মিঃ থেকে চার মিঃ কর। তারপর দ্‌'পা একসঙ্গে তিন মিঃ অভ্যাস কর।

উপকারিতা—প্রক্রিয়াটিতে প্রাণায়ামের অন্যান্য উপকারের সঙ্গে সঙ্গে হাত, পা ও তলপেটের পেশী দৃঢ় করে এবং ঐ সব অঞ্চলের স্নায়্‌জাল সতেজ ও সক্রিয় রাখে। সর্দি-কাশি দ্‌র করে।

১৪। **প্রণালী**—শবাসনে শ্‌য়ে সমস্ত দেহ শিথিল করে দাও। হাত দ্‌'টি আঙ্‌লবন্ধ অবস্থায় নাভির উপর রাখ। এবার নাক দিয়ে ধীরে ধীরে দমভর শ্বাস গ্রহণ কর। শ্বাস গ্রহণের সময় চিন্তা করতে হবে—বায়্‌র মাঝে যে প্রাণশক্তি আছে, তা নাভিদেশে এসে জমা হচ্ছে। তারপর, ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ কর। শ্বাস-ত্যাগের সময় মনে করতে হবে—দেহের সমস্ত সঞ্চিত রোগবিষ বায়্‌র সঙ্গে বের হয়ে যাচ্ছে। দশ মিঃ থেকে পনের মিঃ প্রক্রিয়াটি কর।

উপকারিতা—প্রাণায়ামের অন্যান্য উপকারের সঙ্গে সঙ্গে প্রক্রিয়াটি নীরোগ দেহ, প্রবল ইচ্ছাশক্তি, চিন্তাশক্তি ও বলিষ্ঠ মন গঠন করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

ভ্রমণ-প্রাণায়াম

১৫। **প্রণালী**—মের্‌দণ্ড সোজা রেখে সমান তালে পা ফেলে হাঁট। চার পদক্ষেপের তালে তালে মনে মনে ১, ২, ৩, ৪ গ্‌ণতে হবে। আর শ্বাস শেষ হলে আবার ১, ২, ৩, ৪ মনে মনে গ্‌ণতে হবে এবং শ্বাস ছাড়তে হবে। কিছ্‌দিন অভ্যাসের পর ৪ পর্যন্ত গ্‌ণতে গ্‌ণতে শ্বাস নিতে হবে, কিন্তু শ্বাস ছাড়ার সময় ১, ২ করে ৬ পর্যন্ত গ্‌ণতে হবে এবং সময় নিতে হবে। আবার কিছ্‌দিন অভ্যাসের পর ৬ পর্যন্ত গ্‌ণে শ্বাস নিতে হবে, কিন্তু ছাড়তে হবে ৮ পর্যন্ত গ্‌ণে। আবার কিছ্‌দিন অভ্যাসের পর ৮ পদক্ষেপ পর্যন্ত শ্বাস নিতে এবং ১২ পদক্ষেপে শ্বাস ছাড়তে হবে। এইভাবে ১২ পদক্ষেপ পর্যন্ত শ্বাস নেওয়া ও ১৮ পদক্ষেপ পর্যন্ত শ্বাস ছাড়া অভ্যাস হয়ে গেলে, আর মাত্রা বাড়াবার দরকার হয় না। প্রাণায়ামটির অভ্যাসের সময় দশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা করা যেতে পারে। সময় আরো বাড়ালে কোন ক্ষতি হয় না। ক্ষতি তখনই হয়, যখন প্রাণায়ামটি অভ্যাসের সময় হাঁপ ধরে যায়। প্রাণায়াম অভ্যাস সব সময় আয়াসহীন হওয়া চাই। যদি হাঁপ ধরে যায়, তবে স্বাভাবিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রেখে বিশ্রাম নিতে হবে। আর প্রাণায়ামটি অভ্যাসের সময় যদি বাঁ ব্‌কে একট্‌ চিনচিনে ব্যথা অন্‌ভূত হয়, তখন ব্‌ঝতে হবে, ফ্‌স্‌ফ্‌সের ক্ষমতা অন্‌যায়ী মাত্রা বেশী হ'য়ে যাচ্ছে। সেদিন অভ্যাস ঐখানেই বন্ধ রাখতে হবে।

একদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে এক মাত্রা কম করে পুনরায় আরম্ভ করতে হবে। প্রাণায়ামটি খোলা জায়গায় নির্মল বায়ুতে অভ্যাস করা বাঞ্ছনীয়।

উপকারিতা—প্রাণায়ামটি সবার পক্ষে বিশেষ উপকারী। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পক্ষে প্রক্রিয়াটি মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করে। তবে, স্বাস্থ্যানুযায়ী হওয়া চাই। নানা প্রক্রিয়ার প্রাণায়ামে যত রকম উপকার পাওয়া যায়, ভ্রমণ-প্রাণায়ামে তার প্রায় সবগুলি বর্তমান। নিয়মিত এবং নিয়মমতো প্রাণায়ামটি অভ্যাস রাখলে যক্ষ্মা, হাঁপানি, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগ কোনদিন হতে পারে না। অন্য কোন ব্যায়াম না করেও, একমাত্র ভ্রমণ-প্রাণায়াম অভ্যাস রাখলে দেহ রোগমুক্ত থাকে এবং অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ধৌতি

অগ্নিসার ধৌতি

প্রণালী—(ক) সোজা হয়ে দাঁড়াও। হাত কোমরের দু'পাশে রাখ। এবার শ্বাস ত্যাগ করে উদর বায়ুশূন্য কর। কুম্ভক কর অর্থাৎ দম বন্ধ কর। এখন ঐ অবস্থায় এক এক বারে যতবার সম্ভব যথাসাধ্য পেট ও তলপেট কুঞ্চিত করে মেরুদণ্ড-সংলগ্ন কর। আয়াসহীনভাবে যতবার সম্ভব প্রক্রিয়াটি অভ্যাস কর। তারপর ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ কর এবং পেট ও তলপেট শিথিল করে দাও। আট থেকে বারো বার প্রক্রিয়াটি কর।

প্রণালী—(খ) এখন পদ্মাসনে বা সহজ আসনে বস। হাত দু'টি হাঁটুর উপর রাখ। উদর বায়ুশূন্য করে কুম্ভক কর। একই প্রক্রিয়ায় আট থেকে বারো বার কর।

উপকারিতা—প্রক্রিয়াটিতে পাকস্থলী, প্লীহা, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, মূত্রাশয়, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, যৌনগ্রন্থি প্রভৃতি সবল ও সক্রিয় থাকে। পেট ও তলপেটের পেশী দৃঢ় হয়। ঐ অঞ্চলের স্নায়ুজালও সতেজ থাকে। এতে অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি পেটের রোগ হয় না এবং জঠরাগ্নি বৃদ্ধি পায়।

সহজ অগ্নিসার ধৌতি

প্রণালী—সোজা হয়ে দাঁড়াও। এবার ডান হাতের বুড়ো আঙুল ডানদিকের কোমরের খাঁজে রাখ। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটি একইভাবে বাঁদিকের কোমরে রাখ। উভয় হাতের মধ্যম আঙুল নাভির উপর রাখ। এখন উভয় কোমরে বুড়ো আঙুল দৃঢ়ভাবে রেখে দু'হাতের অন্য সব আঙুল দিয়ে, নাভিদেশ চাপ দিয়ে এবং সঙ্কুচিত করে মেরুদণ্ড সংলগ্ন কর। নাভিদেশ মেরুদণ্ডে লাগার সঙ্গে সঙ্গে নাভির উপর আঙুলগুলি আলগা করে নাভিপ্রদেশ চাপমুক্ত এবং শিথিল করে দাও। এইভাবে কুড়ি থেকে তিরিশ বার এই প্রক্রিয়াটি কর।

প্রথম প্রথম নাভিপ্রদেশে চাপ দিলে হয়তো একটু ব্যথা হতে পারে। যতটুকু সহ্য হয়, ততটুকু চাপ দেবে। জোর করে একদিনে অভ্যাস করতে যাবে না, দু'চার দিন অভ্যাসের পর ঠিক হয়ে যাবে। যাদের পেটে অত্যধিক চর্বি জমেছে, তাদের চর্বি না কমা পর্যন্ত, প্রক্রিয়াটি ইহা ঠিকভাবে করা সম্ভব নয়, যতটা সহজভাবে করা যায়, ততটা করবে।

উপকারিতা—প্রক্রিয়াটি অভ্যাসকালে পেট ও তলপেট রক্তে প্লাবিত হয়। তলপেটে জমা সমস্ত রোগজীবাণু রক্তের প্লাবনে ভেসে যায় এবং রক্তকণিকার আক্রমণে ধ্বংস হয়। এর ফলে, আমাশয়, কোষ্ঠতারল্য প্রভৃতি রোগ কোনদিনই হয় না—আর দেহে এসব রোগ থাকলে, এই ধৌতিটি অল্পদিন অভ্যাস করলে সহজেই তা থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়।

নিষেধ—মেয়েদের ঋতুকালে এবং গর্ভাবস্থায় প্রক্রিয়াটি একেবারে করা উচিত নয়।

বমন-ধৌতি

প্রণালী—সাধ্যমতো দেড় লিটার থেকে দু' লিটার ঈষৎ গরম জল পান কর। তারপর মধ্যম আঙুল মুখে দিয়ে আল্‌জিবে আস্তে আস্তে নাড়া দাও। সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যাবে। একবারে সব জল বের না হলে দু'-তিন বার প্রক্রিয়াটি কর। যাদের সহজে বমি হতে চায় না, তারা জলের সঙ্গে পরিমাণ মতো লবণ মিশিয়ে নেবে।

উপকারিতা—খাবার আধ-ঘণ্টা বা একঘণ্টা পরে, যাদের চোঁয়া ঢেকুর ওঠে, অথবা রোজ বিকেলে ঢেকুর উঠতে থাকে এবং ঢেকুর উঠলে মুখ তেতো বা টক লাগে, তাদের পক্ষে এ-প্রক্রিয়াটি বিশেষ উপকারী। প্রক্রিয়াটি সপ্তাহে দু'তিন দিন অভ্যাস করলে, কোনদিন অম্ল বা পিত্তদোষ হবে না। যদি কোন কারণে পিত্তদোষ দেখা দেয়, তবে ধৌতিটি অভ্যাস করলে সহজেই রোগমুক্ত হওয়া যায়। ধৌতিটি অভ্যাসের ফলে পাকস্থলীতে কোন দূষিত পদার্থ জমতে পারে না।

নাসা-পান

প্রণালী—বড় মুখওয়ালা বাটি বা ঐ-জাতীয় কোন পাত্রে জল ভর্তি করে মুখের কাছে এনে মুখ ও নাক ডুবিয়ে দাও। এবার শ্বাস বন্ধ কর। পরে মুখ বন্ধ রেখে নাক দিয়ে জল টেনে নাও। প্রথম দু' একদিন নাক জ্বালা করবে। হাঁচিও আসতে পারে, তবে দু' চারদিন অভ্যাসে ঠিক হয়ে যাবে। তখন মুখের মতো নাক দিয়ে জল পান করতে কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু নাক দিয়ে জল নিয়ে দেহে রাখা উচিত নয়, নাক দিয়ে জল নিয়ে মুখ দিয়ে ফেলে দিতে হবে। নচেৎ শ্বাসের সঙ্গে অনেক ময়লা ও রোগজীবাণু নাকে প্রবেশ করে এবং নাকের ভিতরে যে সকল লোম আছে তাতে বাধা পেয়ে নাকে জমে থাকে। নাক দিয়ে জল নিয়ে খেয়ে ফেললে, ঐ ময়লা ও রোগজীবাণু সোজা পাকস্থলীতে যাবার সুযোগ পায়।

উপকারিতা—প্রক্রিয়াটিতে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। কোনভাবেই মাথাধরা বা মাথার যন্ত্রণা-রোগ হয় না—এমন কি জ্বরেও মাথা ধরে না। তাছাড়া, নাক পরিষ্কার থাকে ; সহজে সর্দি, কাশি প্রভৃতি হয় না। নাক পরিষ্কার থাকলে ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড্, নিউমোনিয়া, হাঁপানি প্রভৃতি রোগ সহজে বংশবৃদ্ধি করার সুযোগ পায় না।

সহজ বস্তি-ক্রিয়া

যে-ক্রিয়ায় বস্তি অর্থাৎ তলপেট পরিষ্কার হয়, তারই নাম বস্তি-ক্রিয়া। অধিকাংশ রোগের মূল কোষ্ঠবদ্ধতা। তাই পায়খানা পরিষ্কার রাখার জন্য, প্রত্যেকের কয়েকটি নিয়ম মেনে চলা উচিত। এই নিয়মগুলিকে বস্তি-ক্রিয়া বলা হয়।

১। সকালে ঘুম থেকে উঠে জল কুল্‌কুচি করে মুখ ধুয়ে এক থেকে দু' গ্লাস জল পান করে পবন-মুক্তাসন ছ' বার, বিপরীতকরণী মুদ্রা তিন বার এবং সর্বাংগাসন তিন বার কর। সেই সঙ্গে প্রয়োজনমতো অর্ধ-চন্দ্রাসন চার বার ও পদ-হস্তাসন চার বার কর।

২। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ আছে, তাদের এক গ্লাস ঈষৎ গরম জলের সঙ্গে একটি পাতি বা কাগ্‌জি লেবুর রস এবং পরিমাণমতো লবণ মিশিয়ে পান করতে হবে। তারপর পবন-মুক্তাসন ছয় বার, বিপরীতকরণী মুদ্রা চার বার, পদ-হস্তাসন তিন বার, অর্ধচন্দ্রাসন তিন বার এবং সর্বাংগাসন চার বার কর।

উপকারিতা—প্রক্রিয়াগুলি অভ্যাস রাখলে অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ কোনদিন হয় না। হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়।

যাদের শরীর অত্যন্ত দুর্বল বা রুগ্ন অথবা যাদের বয়স অত্যধিক বেশী, যাদের পক্ষে কোন রকম আসন বা ব্যায়াম করা সম্ভব নয়, তারা সূর্যোদয়ের পূর্বে বিছানা ত্যাগ করে, পরিমাণমতো ঠাণ্ডা বা ঈষৎ গরম জল পান করবে এবং খোলা জায়গায় নির্মল বাতাসে কিছু সময় শুধু পায়চারী করবে। তা হলেই, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাছাড়া, ভোরের আর্দ্রবায়ু কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে।

একাদশ অধ্যায়

কয়েকটি সাধারণ রোগ ও তার প্রতিকার

১। অজীর্ণ

দেহ রোগাক্রান্ত হয় প্রধানত দুটি কারণে—(১) অস্বাভাবিক বা অনিয়মিত বিপাকক্রিয়াজনিত—যেমন অম্ল, কোষ্ঠবদ্ধতা, কোষ্ঠতারল্য, বহুমূত্র, রক্তের উচ্চচাপ বা নিম্নচাপ ইত্যাদি। (২) দেহে বীজাণু আক্রমণজনিত—যেমন যক্ষ্মা, টাইফয়েড্, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি।

রোগ-বীজাণু আমাদের দেহে নানাভাবে প্রবেশ করতে পারে। যেমন, প্রশ্বাসের সঙ্গে, জল ও খাবারের মাধ্যমে, হাত-পায়ের ত্বক ভেদ করে, ইনজেক্‌সনের ছুঁচের মাধ্যমে এরকম নানাভাবে আমাদের দেহে রোগ-বীজাণু প্রবেশ করতে পারে। তবে প্রবেশ করলেই যে আমরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ব তেমন কোন ভয় নেই। দেহে স্বাভাবিকভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। দেহে অজস্র রোগ-বীজাণু দেহের বিভিন্ন জায়গায় ওৎ পেতে বসে থাকতে পারে, সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে। আবার তেমনি দেহের রক্তের শ্বেতকণিকা অজস্র সৈন্য নিয়ে দেহকে পাহারা দিচ্ছে। রোগ-বীজাণু বিপাকক্রিয়ায় বা অন্য কোনভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলেই শ্বেতকণিকার সৈন্যবাহিনী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—তুমুল যুদ্ধ হয় এবং উভয়পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হয়। যুদ্ধে শ্বেতকণিকার জয় হলে আমরা সুস্থ থাকি আর পরাজয় হলে অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখন রোগ-বীজাণু দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে দেহে বিষ ছাড়িয়ে তার আধিপত্য কায়েম করে। উভয়পক্ষের মৃত সৈনিকদের মৃতদেহ রক্তের কলারসের মাধ্যমে এক বা একাধিক জায়গায় জমা হয়। ঐ জায়গা ফুলে পেকে যায় এবং মৃতদেহগুলির পচা দেহ পুঁজ আকারে দেহ থেকে বের হয়ে যায়। যাঁরা রক্তাল্পতায় ভুগছেন তাঁরা বিশেষ করে এই সব রোগের শিকার হন। রোগ থেকে দূরে থাকতে হ'লে আহার, নিদ্রা, বিশ্রামের মত প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যায়াম অভ্যাস রেখে দেহ সুস্থ ও সবল রাখা একান্ত প্রয়োজন।

রোগের লক্ষণ—কোষ্ঠকাঠিন্য বা তারল্য, পেটে বায়ু-জমা, মুখে ও শ্বাসে দুর্গন্ধ, আহারে অরুচি, তলপেটে সব সময় ভার-ভার বোধ, জিহ্বায় সাদা অথবা হলদে ময়লার স্তর, মুখ দিয়ে জল ওঠা ইত্যাদি অজীর্ণ রোগের লক্ষণ।

অজীর্ণ রোগের কারণ—তাড়াহুড়ো করে বা অন্যমনস্কভাবে আহার, অপরিমিত অক্ষুধায় বা অল্প-ক্ষুধায় পুরো আহার, বাসী-পচা, অতিরিক্ত তেল, ঘি, মশল্লাযুক্ত, আমিষ জাতীয় খাবার গ্রহণ, ওষুধ-প্রীতি, অধিক রাত্রে ভরপেট খাবার অভ্যাস, অতিরিক্ত ধূম বা মদ্যপান। দিনের পর দিন একই ধরনের খাবার গ্রহণ, দীর্ঘদিন অত্যধিক চিন্তা বা মানসিক চাপ। কায়িক-শ্রমবিমুখতা, পাচক-রস নিঃসরণ একটি বা একাধিক গ্রন্থির অক্ষমতা প্রভৃতি যে কোন কারণে অজীর্ণ রোগ দেখা দিতে পারে।

রোগ নিরাময়ের উপায়—সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে ১-২ গ্লাস জল (শীতকালে ঈষৎ উষ্ণ জল) খেয়ে পবন-মুক্তাসন, পদ-হস্তাসন, অর্ধ-কূর্মাসন, যোগমুদ্রা,

বিপরীতকরণী মুদ্রা করা উচিত। বিকালে কিছু সহজ খালি-হাতে ব্যায়ামের পর সর্বাংগাসন, মৎস্যাসন, পশ্চিমোত্থানাসন, অর্ধ-চক্রাসন, ধনুরাসন, শলভাসন, উড্ডীয়ান মুদ্রা (এক মিনিট) এবং নৌলী (এক মিনিট) করা বাঞ্ছনীয়।

অল্প বয়সের ছেলে ও মেয়েদের (মেয়েদের ঋতু প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত) উড্ডীয়ান ও নৌলী অভ্যাস করা উচিত নয়।

পথ্য ও নিয়ম—রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত, আহারের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। আহার্য দ্রব্য লঘুপাক ও সহজপাচ্য হওয়া চাই। আহারের সময় মনে কোন ক্ষোভ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, চিন্তা প্রভৃতি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। শান্ত মনে খাদ্যদ্রব্য ভালভাবে চিবিয়ে খেতে হবে। মুখের লালা খাদ্যদ্রব্যের সংগে যত মিশবে, তত সহজে খাদ্য হজম হবে। প্রধান আহারের পর মাঝারি ধরনের পাকা অথবা ডাঁশা পেয়ারা বা গোটাকয়েক খেজুর খেলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

আহারের সময় জল যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল। খাওয়ার আধঘণ্টা পর সাধারণ পানীয় জল বা ডাবের জল খাওয়া উচিত। দিনে যত বেশী জল খাওয়া যায় ততই উপকারী। দুপুরে খাওয়ার সময় ১২টা এবং রাত্রে খাবার সময় ৯টার মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন সময় ভরপেটে খেতে নেই। তাছাড়া, রাত্রের খাবার হাল্কা ধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয়। অক্ষুধায়, অল্প-ক্ষুধায় বা অপ্রয়োজনে কোন খাবার খাওয়া ঠিক নয়। রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত সপ্তাহে একদিন এবং পরে সপ্তাহে একবেলা বা পনর দিনে একদিন সম্পূর্ণ উপবাস করা উচিত। উপবাসের সময় শুধু লেবুর রসসহ প্রচুর জল পান করা বাঞ্ছনীয়। উপবাসের পর প্রথমে তরল খাবার খেতে হবে।

নিষেধ—রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত, যে-কোন ধূমপান, চা, কফি প্রভৃতি একেবারে বর্জন করা উচিত।

২। কোষ্ঠবদ্ধতা

রোগের লক্ষণ—তলপেট ভার ভার বোধ, মুখে ও শ্বাসে দুর্গন্ধ, জিহ্বায় সাদা বা হলদে ময়লা, মাথাধরা, মাথায় ভারবোধ, অনিদ্রা, মলত্যাগে অনিয়ম, মাঝে মাঝে কাদা দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ, খিট্‌খিটে মেজাজ, আহারে অরুচি ইত্যাদি কোষ্ঠবদ্ধতা রোগের লক্ষণ।

রোগের কারণ—অজীর্ণ রোগের কারণগুলি দেখুন। তাছাড়া মলত্যাগের প্রয়োজন হলেই মল চেপে রাখতে হয় তাদেরও এরোগ আসতে পারে এবং এই কারণেই পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা বেশী ভোগে।

রোগ নিরাময়ের উপায়—সকালে উঠেই, মুখ ধুয়ে লেবুর রস ও ঈষদোষ্ণ জল লবণসহ ১-২ গ্লাস খেয়ে পবন-মুক্তাসন, পদ-হস্তাসন, অর্ধ-চক্রাসন, পশ্চিমোত্থানাসন, শলভাসন, যোগমুদ্রা, বিপরীতকরণী মুদ্রা এবং বিকালে কিছু খালিহাতে সহজ ব্যায়ামের পর, সর্বাংগাসন, মৎস্যাসন, পশ্চিমোত্থানাসন, অর্ধ-কূর্মাসন, অর্ধ-চক্রাসন, ধনুরাসন, উষ্ট্রাসন ও হলাসন নিয়মিত অভ্যাস করা উচিত।

পথ্য ও নিয়ম—অজীর্ণ রোগের অনুরূপ।

৩। আমাশয়

কয়েক বছর আগেও আমরা আমাশয় রোগকে একধরনের মনে করতাম। কিন্তু এখন গবেষণা করে দেখা গেছে আমাশয় দুই প্রকার এবং রোগের কারণ আলাদা হলেও লক্ষণাদিতে কিছুটা মিল আছে। তাই একসঙ্গে আমাশয় রোগ বলা হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে এক ধরনের এ্যামিবা বীজাণু থেকে অ্যামিবিক এবং এক ধরনের সিগেলা জাতীয় ব্যাসিলাস থেকে ব্যাসিলারী আমাশয় হয়। এধরনের আমাশয় আমি আন্ত্রিক রোগে আলোচনা করেছি।

অ্যামিবিক আমাশয়ের কারণ—জল, বাতাস, মাছি, মশা ও খাবারের মাধ্যমে সাধারণত এ রোগ সংক্রামিত হয়।

রোগের লক্ষণ—বীজাণু পেটে গেলে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। ক্ষুদ্রান্ত্রে ও বৃহদান্ত্রে প্রদাহ সৃষ্টি করে, অন্ত্রের ঝিল্লী ছিঁড়ে খেতে আরম্ভ করে ফলে প্রদাহ, ঘা, ক্ষত হতে পারে। বৃহদান্ত্রে ক্ষত বা ঘা হলে তাকে বলা হয় কোলাইটিস (Colitis) আর ক্ষুদ্রান্ত্রে ক্ষত হলে বলা হয় অন্ত্র-প্রদাহ (Eteritis)। আবার দুই অন্ত্রে ক্ষত, ঘা প্রদাহ হতে পারে, ঐ অবস্থাকে বলা হয় এন্টারোকোলাইটিস (Enterocolitis)। এসব উপসর্গগুলো দেখা দেয় যখন অ্যামিবিক আমাশয় ক্রনিকে আসে। এখন রোগের প্রথম লক্ষণগুলো দেখা যাক। কয়েকদিন আগে থেকে পেটে অস্বস্তি, ভার ভার বোধ হয়, কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। তার পরে উদরাময় দেখা দেয়। পায়খানার পূর্বে তলপেটে নাভির চারপাশে ব্যথা অনুভব হয়। পেট কামড়াতে থাকে, বার বার পায়খানার বেগ হয় অথচ পায়খানা খুব অল্পই হয়। পায়খানার পরেও ব্যথা বা পেট কামড়ানো কিছুক্ষণ থাকে। প্রথমে কাদা কাদা তারপর কফ মিশ্রিত। আম বা মিউকাস্ মিশ্রিত অল্প অল্প মল আসতে থাকে। মলের রং হলদে, সবুজ, কালো আর যদি বীজাণু অন্ত্রের ঝিল্লী ক্ষতবিক্ষত করে দেয় এবং রক্তস্রাব হয়, তবে লালচে হয়ে যায়। মলের সঙ্গে রক্ত পড়লে তখন রক্ত আমাশয় বলা হয়। অ্যামিবিক আমাশয়ে পায়খানা হলেও বেগ ও ব্যথা প্রশমিত হতে বেশ সময় লাগে। অনেক সময় পেটে বায়ু জমে, দেহের তাপ বাড়ে, অল্প জ্বরও আসতে পারে এবং দিনে-রাতে ৮ থেকে ১২/১৪ বার পায়খানা হতে পারে। পায়খানা দুর্গন্ধযুক্ত হয়। দেহ বীজাণুমুক্ত না হলে অ্যামিবিক আমাশয় ক্রনিক আমাশয়ে পরিণত হয়। তখন রোগী এই রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে।

অ্যামিবিক আমাশয় আপাতঃ জীবনসংশয়কারী না হলেও বড় যন্ত্রণাদায়ক এবং বিরক্তিজনক। ক্রনিক হলে দেহে অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে। গরম এবং নাতি-শীতোষ্ণ অঞ্চলে প্রকোপ বেশী দেখা যায়।

রোগ নিরাময়ের উপায়—আমার মতে কোন রোগীর ক্ষেত্রে উপরের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ডাক্তার দ্বারা মল পরীক্ষা করানো উচিত এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ ব্যবহার করে প্রথমে দেহকে বীজাণুমুক্ত করা দরকার। যৌগিক নিয়মে আমাশয় নিরাময় যে হয় না তা নয়, তবে সময় ও সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। আজকের দিনে সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা একেবারে অসম্ভব।

আমাদের দেহ বাইরের কোন বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রোগগ্রস্ত হলে, বাইরের সাহায্য নিয়ে—অর্থাৎ ঔষধের সাহায্য নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব দেহকে বীজাণুমুক্ত

করা বাঞ্ছনীয় এবং সেই সঙ্গে যৌগিক-ব্যায়াম ও নিয়মগুলি ঠিকমত পালন করলে, সে-রোগ আর আক্রমণ করতে পারে না। এ জাতীয় রোগ শুধুমাত্র ঔষধে চিরতরে দূর হয় না। সুযোগ পেলে আবার দেহে বাসা বাঁধে—যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস রাখলে রোগ-বীজাণু সে-সুযোগ আর পায় না।

নিয়ম ও পথ্য—আমাশয়ের সঙ্গে জ্বর থাকলে অথবা অন্যান্য লক্ষণ প্রবলভাবে দেখা দিলে, প্রথম দিন সম্পূর্ণ উপবাস করতে হবে। উপবাসের সময় জল ভাল করে সিদ্ধ করে সেই জল ঠাণ্ডা করে পাতিলেবু, কাগজিলেবু বা মিষ্টি কমলা-লেবুর রসের সঙ্গে মিশিয়ে প্রচুর পরিমাণে পান করা উচিত। দ্বিতীয় দিনে সকালে ভিজানো সাগু এবং পাতলা বার্লি বা ঐ জাতীয় খাবার ৩-৪ বার খেতে হবে। ঘোলের বা বেলের সরবৎও খাওয়া যেতে পারে। তৃতীয় দিনে থানকুনী ও কাঁচকলা দিয়ে চর্বিহীন ছোট মাছের ঝোল বা শুক্ত দিয়ে দুবার অল্প অল্প ভাত খাওয়া যেতে পারে। ছোট সিঙ্গি বা মাগুর মাছের সঙ্গে গাঁদাল পাতার ঝোল খুব উপকারী। আমাশয় রোগীদের রোজ দু'বেলা দু'ছটাকের মত থানকুনীর রস অল্প খেজুর গুড় বা চিনির সঙ্গে মিশিয়ে খেলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ভাত খাবার শেষে টক দই বা ঘোলের সঙ্গে লবণ মিশিয়ে খেলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। আহারের এক ঘণ্টা পরে, এক গ্লাস কচি ডাবের জল খেতে পারলে ভাল হয়। তাছাড়া, সকালে ও বিকালে কাঁচা বেল সিদ্ধ বা পোড়া অথবা বেলের সরবৎ বিশেষ উপকারী। রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলি দূর না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিশ্রাম বাঞ্ছনীয়। পেটে গরম কাপড় বা ঐ জাতীয় কোন জিনিস দিয়ে আলতো করে বেঁধে রাখলে, তাড়াতাড়ি রোগ নিরাময় হয়। কারণ, পেটে ঠাণ্ডা লাগলে আমাশয় রোগ বৃদ্ধি পায়।

রোগ বেশ কিছুটা প্রশমিত হওয়ার পর, সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে এক গ্লাস জল পান করে পবন-মুক্তাসন, পদ-হস্তাসন, বিপরীতকরণী মুদ্রা, যোগমুদ্রা অভ্যাস করা উচিত। বিকেলে খোলা জায়গায় কিছুক্ষণ পায়চারী করতে হবে। এসময় কোন কঠিন ব্যায়াম বা আসন করা ঠিক নয়। রোগ নিরাময় হওয়ার পর, সকালের আসন মুদ্রাগুলির সঙ্গে বিকালে পশ্চিমোত্থানাসন, অর্ধ-কূর্মাসন, অর্ধ-চক্রাসন, পদ-হস্তাসন, মৎস্যাসন ও সর্বাংগাসন করতে হবে। তারপর, বেশ কিছুক্ষণ খোলা জায়গায় পায়চারী করা বাঞ্ছনীয়।

নিষেধ—আমাশয় রোগীর পক্ষে দুধ অথবা ছানাজাতীয় খাবার একেবারে নিষিদ্ধ।

৪। জিয়ার্ডিয়াসিস্

আমাশয়ের মত এ-ও একপ্রকার আন্ত্রিকরোগ। গ্রীষ্মপ্রধান এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এ রোগ বেশী হয়ে থাকে। জিয়ার্ডিয়া বীজাণু থেকে এ রোগ আসে। শাক-সবজি ও কাটা ফলের মাধ্যমে এ রোগ সংক্রামিত হয়। এর বীজাণু পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র, পিত্তকোষে আশ্রয় নেয় এবং বংশ বৃদ্ধি করতে থাকে। পিত্তরসই এদের প্রধান খাদ্য। এরা অন্ত্রে সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে থাকে। আমাদের দেহ যখন যে কোন কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে, দেহের প্রতিরক্ষা বাহিনী যখন তাদের স্বাভাবিক শক্তি হারায় ঠিক তখনই এই বীজাণু ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দেহ রোগাক্রান্ত হয়। রোগের প্রথম অবস্থায় আমরা প্রায়ই খেয়াল করি না কিন্তু রোগ যখন ক্রমে বাড়তে থাকে তখন খেয়াল করতেই হয়।

রোগের লক্ষণ—দিন-রাতে ৮/১০ বার পাতলা অথবা কাদা-কাদা পায়খানা, মলের সঙ্গে আম থাকতে পারে অথবা মলের রং হলদে হতে পারে। ওষুধ খেলে এবং খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করলে কমে যাবে কিন্তু ওষুধ দ্বারা দেহ সম্পূর্ণ বীজাণুমুক্ত না হলে এ রোগ আবার দেখা দেবে এবং অন্তর্বর্তী সময়ে প্রায়ই পেটের গণ্ডগোল থাকবে। এ রোগ ঠিকমত চিকিৎসা না হলে ক্রনিক হয়ে যেতে পারে। রোগাবস্থায় অজীর্ণ, পেটে বায়ু, ভুট-ভাট শব্দ হতে পারে। দেহ ক্রমশ রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে, দুর্বল, কর্মশক্তিহীন হয়ে পড়বে। চিকিৎসা না হলে রোগী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলবে।

রোগের কারণ—প্রত্যক্ষ কারণ রোগ-বীজাণু আর পরোক্ষ কারণ অতি ভোজন, অক্ষুধায় ভোজন, অধিক তেল, ঘি, ঝাল, মশলাযুক্ত বাসী-পচা খাবার ফলে অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, কোষ্ঠতারল্য প্রভৃতি রোগ। দেহের রক্ত অম্লবিষে জর্জরিত হয়ে, স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে দেহের প্রতিরক্ষা বাহিনীও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রোগী বীজাণুর সহজ শিকার হয়ে পড়ে।

নিরাময়ের উপায়—বাইরের রোগ-বীজাণু দ্বারা রোগাক্রান্ত হলে বাইরের সাহায্য অর্থাৎ ওষুধের সাহায্যে আপনাকে বীজাণুমুক্ত হতেই হবে এবং তার সঙ্গে রোজ সকালে খালিপেটে আদা ও কাঁচা হলুদের রস সহ চা চামচের ৫/৬ চামচ থানকুনি পাতার রস খেতে হবে। আধ ঘণ্টা পরে যে কোন হালকা খাবার খাওয়া যেতে পারে। দিন-রাতে সহজপাচ্য খাবার খেতে হবে। হেলেঞ্চা, পলতা, উচ্ছে, করোলা, নিম-পাতা এবং কালমেঘের পাতার রস এ রোগে বিশেষ উপকারী—রান্না করে খাওয়া যেতে পারে।

৫। আন্ত্রিকরোগ

প্রতি বছর গরমকালে যখন পানীয় জলের অভাব দেখা দেয় তখন এই আন্ত্রিক-রোগ প্রায় মহামারী রূপে আসে। এই আন্ত্রিকরোগটা কি কোথা থেকে আসে, তার লক্ষণাদি বা কি সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। দেহের অন্ত্র বলতে বুঝায় ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্র সাধারণ ভাষায় আমরা যাকে নাড়ী বলি। আমি আগেই আলোচনা করেছি পাচনতন্ত্র ও পরিপাক ক্রিয়ায় এদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এবং নামেই বলে দিচ্ছে এ রোগের উৎপত্তিস্থল অন্ত্র। কলেরা এবং উদরাময় বা আমাশয় পায়খানা রোগের মধ্যে বেশ উল্লেখযোগ্য দু'টি নাম। দু'টি রোগের উৎপত্তিস্থল উদর বা পেট হলেও লক্ষণাদি দেখলে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন আমাশয়ে পায়খানার পূর্বে পেটব্যথা বা পেটকামড়ানো প্রায়ই থাকে, কলেরায় পেটে কোন ব্যথা বা কামড়ানো থাকে না। আমাশয়ে মলের রং হলদে, সবুজ, কালো এবং আমযুক্ত সাদাটে হতে পারে। মল অল্প থাকে এবং গন্ধযুক্ত। কলেরায় মল প্রথমেই চালধোয়া জলের মত সাদা এবং প্রথমে একটু গন্ধ থাকলেও দু'তিনবার পায়খানার পর আর কোন গন্ধ থাকে না। কলেরা ও আমাশয়ে এরকম অনেক পার্থক্য রয়েছে।

আমাশয় আবার দু' ভাগে ভাগ করা যায় যেমন অ্যামিবিক আমাশয় এক ধরনের এ্যামিবা বীজাণু থেকে সংক্রামিত হয়, ব্যাসিলারী আমাশয় সিগেলা জাতীয় ব্যাসিলাস থেকে এ জাতীয় আমাশয় সংক্রামিত হয়। বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষার ফলে জানা গেছে এই আন্ত্রিক রোগ ব্যাসিলারী আমাশয়। অ্যামিবিক ও ব্যাসিলারী আমাশয় রোগী লক্ষ্য করলে বহু পার্থক্য দেখা যায় যেমন অ্যামিবিক আমাশয় বছরে প্রায় সব সময় দেখা যায়। সব বয়েসেই হতে পারে, হঠাৎ বা ধীরে ধীরে—দু' রকমের আক্রমণ দেখা যায়, জ্বর সামান্য হতে পারে, নাও হতে পারে। ৮ থেকে ১২/১৩ বার পায়খানা হয়। ক্রনিক হতে পারে। অল্প সময়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে না। তেমনি ব্যাসিলারী আমাশয়

গরমকালে বা বর্ষার প্রথমে দেখা দেয়। সব বয়েসেই হয় তবে শিশুদের বেশী হয়, হঠাৎ আক্রমণ করে, প্রবল জ্বর হতে পারে, ২০/২৫ থেকে ৩০ বার এমন কি তারও বেশী বার পায়খানা হতে পারে, ক্রনিক হয় না খুব অল্প সময়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এরকম বহু পার্থক্য দু' শ্রেণীর আমাশয়ের ভিতর দেখা যায়।

এখন দেখা যাক কিভাবে এই ব্যাসিলারী আমাশয় খুব অল্প সময়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামাঞ্চলে গরমের সময়ে পানীয় জলের প্রচণ্ড অভাব দেখা দেয়—পরিশ্রুত জলের তো প্রশ্নই ওঠে না। এমনও দেখা যায় যে পুকুরে বা নদীতে রোগীর জামা-কাপড়, বিছানা, মলমূত্র পরিষ্কার করছে সেই পুকুর বা নদীর জল সমস্ত গ্রামের লোক পান করছে, ফলে রোগ খুব দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে মহামারীরূপে দেখা দেয়। শহরে গরমকালে রাস্তায় কাটা ফল, রঙিন ঠাণ্ডা-বরফজল, সরবৎ, আখের রস, লেবু জল, ফুটপাথে খোলা রেস্টুরেণ্ট বা খাবার ব্যবস্থা থাকে। এখানে নিশ্চয় পরিশ্রুত জল ব্যবহার হয় না, তাছাড়া মাছি তো আছেই ; অতএব শহরাঞ্চলে এরোগ আসতে বাধা নেই তবে মহামারীরূপে দেখা দিতে পারে না কারণ চিকিৎসক সব সময় পাওয়া যায়।

পরীক্ষায় জানা গেছে অনেক রোগী ব্যাসিলারী ও অ্যামিবিক আমাশয়ে একসঙ্গে আক্রান্ত হয়। রোগ-বীজাণু ব্যাসিলাস দেহে প্রবেশ করে ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্রকে একসঙ্গে আক্রমণ করে। অন্ত্রের ঝিল্লী কুরে কুরে খেতে থাকে—ছিঁড়তে থাকে তাই মলের সঙ্গে রক্তও দেখা যায়। মলের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে আম বা মিউকাস্ বের হয়ে আসে ফলে রোগী খুব অল্প সময়ে মারা যেতে পারে। বার বার পায়খানার জন্য প্রচুর পরিমাণে জল ও প্রয়োজনীয় লবণ বের হয়ে যায়। এই রোগে শিশুরা খুব অল্প সময়ে মারা যায়। রোগীর দেহে লবণ, গ্লুকোজ, পটাসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতির অভাব তীব্র হতে থাকে।

নিরাময়ের উপায়—যদি সম্ভব হয় ইলেকট্রল জাতীয় ট্যাবলেট্ রোগীকে বারে বারে দিতে হবে এবং যদি এ জাতীয় কোন কিছু না পাওয়া যায় তবে এক লিটার পরিশ্রুত জলে একমুঠ গুড় বা চিনি চা চামচের আধ চামচ নুন ও একটু খাবার সোডা মিশিয়ে মিক্চার করে নিতে হবে এবং রোগীকে বারে বারে দিতে হবে, তার সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে রোগীকে ব্যাসিলাস বীজাণুমুক্ত করার জন্য ওষুধ দিতে হবে। নিজে বা বিজ্ঞাপন দেখে ওষুধ দিলে হিতে বিপরীত হতে পারে। আর রোগীকে সহজ-পাচ্য খাবার দিতে হবে। শিশু যদি মায়ের দুধ খায় তবে তাই দিতে হবে। অনেকের ধারণা এ সময় খাবার বন্ধ রাখা উচিত অথবা পাতলা সাগু-বার্লির জল দেওয়া যেতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে দেহে যেন জল, গ্লুকোজ, লবণ প্রভৃতির অভাব না ঘটে। ঠিক সময়ে ব্যবস্থা নিতে পারলে প্রায় সব রোগীকে বাঁচানো সম্ভব। বলা বাহুল্য রোগীকে আলাদা রাখতে হবে—কারণ রোগটা সংক্রামক।

৬। কলেরা

কলেরার আর এক নাম ওলাউঠা। ওলা মানে পায়খানা আর উঠা মানে বমি। একসঙ্গে ভেদবমি হয় বলে নাম দেওয়া হয়েছে ওলাউঠা। গ্রীষ্মপ্রধান, নাতিশীতোষ্ণ, শীতপ্রধান সব দেশে এ রোগ দেখা যায়। যে সব অঞ্চলে মশা-মাছির সংখ্যা যত বেশী এ রোগের প্রকোপও তত বেশী। এক প্রকার বীজাণু থেকে এ রোগ হয় এবং এই বীজাণু দেখতে অনেকটা ইংরাজি (,) কমার মত। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে কমা-

বীজাণু (Comma vachilli), এ বীজাণুর বিশেষ বাহন হচ্ছে মশা, মাছি, কাটা ফল, খোলা জায়গায় রাখা খাবার, অপরিশোধিত জল ইত্যাদি। রোগের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করলেই যে লোকটি রোগাক্রান্ত হবে তার কোন ঠিক নেই. আসলে লোকটির শরীরে প্রতিরোধ-ক্ষমতার ওপরে রোগাক্রমণ নির্ভর করে। দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতা, অসুস্থ লোকই এ রোগের শিকার হয়। রোগ বীজাণু দেহে প্রবেশ করার পর ১০ থেকে ৩০/৩৫ ঘণ্টার মধ্যে এ রোগ আত্মপ্রকাশ করে। এ রোগ ভীষণ সংক্রামক কিন্তু আজকের দিনে আর মারাত্মক নয়—ঠিক সময়ে রোগ ধরা পড়লে এবং ঠিকমত চিকিৎসা হলে শতকরা ৯৫ ভাগ রোগীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব।

রোগের লক্ষণ—প্রথমে ব্যথা ও যন্ত্রণাহীন পাতলা পায়খানা। প্রথম ২/৩ বার মলের স্বাভাবিক রং থাকে পরে চাল-ধোওয়া জলের মত বারে বারে পায়খানার সঙ্গে বমিও আরম্ভ হয়। মলে পিত্তরস থাকে না বলে মলের রং সাদা চালধোয়া জলের মত হয়ে যায়। এ রোগের নির্দিষ্ট কোন ওষুধ বা প্রক্রিয়া নেই। রোগীর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে তবে শরীরে স্যালাইন বা জলের ঘাটতি যতদূর সম্ভব মেটাতে হবে, রক্তে জলীয় অংশের অভাবই রোগীর মৃত্যুর প্রধান কারণ। রক্তে জলীয় অংশ কম হলে দেহের পেশীতে, ধমনীতে, শিরায় খিঁচুনি বা ক্র্যাম্প আরম্ভ হয়। হৃৎপিণ্ড অকেজো হতে আরম্ভ করে। দেহের তাপ ও রক্তের শক্তি কমতে আরম্ভ করে, রোগীর হাত-পা থেকে আরম্ভ করে সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হয়ে আসতে থাকে, চোখ ঝাপসা হয়ে যায় এবং শরীর আচ্ছন্ন অবস্থায় রোগীর ভেদবমি হতে থাকে। এসময় রোগীকে গরম কম্বল বা লেপ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। স্যালাইন ইন্‌জেকসন যদি দেওয়া সম্ভব না হয় তবে গ্লুকোজ জল এবং বাড়ীতে করা স্যালাইন জল ৫/৭ মিনিট অন্তর দিতে হবে। খুব সহজে এ জল তৈয়ার করা যায়। পরিমাণ মত হাতের মুঠির ৩ মুঠ গুড় বা চিনি (খেজুর বা তাল রসের চিনি হলে ভাল হয়) আর ২ আঙ্গুলে এক চিমটি লবণ ভাল করে মিশিয়ে একটা পাত্রে ঢেকে রেখে রোগীকে বার বার দিতে হবে। দেখতে হবে স্যালাইন জল যেন বেশী গরম বা ঠাণ্ডা না হয়। দেহের তাপের সমান রাখতে হবে। তবুও যদি দেহের ঠাণ্ডা ভাব না যায় তবে গরম জলে তোয়ালে দিয়ে হাত-পায়ে গরম ছেক দিতে হবে। বার বার গ্লুকোজ জল ও স্যালাইন দিতে হবে কারণ রোগীর ভীষণ তেষ্টা পায় অথচ বলতে পারে না। এই বীজাণু যখন পাকস্থলীর অন্ত্রের টিসু আক্রমণ করে ক্ষত-বিক্ষত করে তখন পেটে যন্ত্রণা আরম্ভ হয় এবং পেটে খিঁচুনি ধরে, জিভ ঠাণ্ডা হয়ে যায় কিন্তু মলম্বার বেশ গরম থাকে। আঙ্গুল, মাথা, ঠোঁট নীল হয়ে যায়, চোখ কোঠরে ঢুকে যায়, নাড়ীর গতি ক্ষীণ হয়ে আসতে পারে, তা বাহুমূলেও অনুভব করা যায় না। দেহের তাপ আস্তে আস্তে ১০০ ডিগ্রীর নীচে নেমে আসে। প্রস্রাব কমে যায় অথবা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, জল বেশী দিলেই বমি হয়ে যায়। এসব হচ্ছে অশুভ লক্ষণ, জলের অভাবে দেহের সব অংশে ক্র্যাম্প বা খিঁচুনি আরম্ভ হয়—ক্রমে রোগী অসাড় হয়ে যায়, হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যায় এবং রোগী মারা যায়।

আর যদি ওষুধ ও সেবা-শুশ্রূষায় সাড়া পাওয়া যায়, প্রস্রাব বন্ধ না হয় তবে ভেদবমি বারে কমে আসে, নাড়ীর গতি ফিরে আসে। রক্তের চাপ ও দেহের তাপ বাড়তে থাকে, হাতের তালু এবং আঙ্গুল ও ঠোঁটের রং স্বাভাবিক হতে থাকে, দৃষ্টি-শক্তিও ফিরে আসে। এ সময় রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে। রোগীর ঘরে কোন আলোচনা বা কথা বলা চলবে না। তবে গ্লুকোজের জল ও স্যালাইন দিয়ে

যেতে হবে। রোগী নিস্তেজ থাকলেও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কথা বলতে ও নিজের সুবিধা-অসুবিধা জানাতে পারে।

কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে—রোগীর কাপড়-চোপড় সোডা দিয়ে ফুটিয়ে, বীজাণু-নাশক জলে ধুয়ে ব্যবহার করতে হবে। পুকুরের জলে বা নদীতে ধোয়া নিষিদ্ধ। রোগীর মলমূত্র মাটির গর্তে ফেলে মাটি চাপা দিতে হবে। থালা, বাসন, গেলাস অন্য কেউ ব্যবহার করতে না পারে। রোজ দু'বেলা রোগীর ঘরের মেঝে, আসবাবপত্র ফিনাইল জল বা আইজল দিয়ে মুছে দিতে হবে। রোগী একটু সুস্থ হলে পাতলা সাগু বা বার্লির জল, গ্লুকোজের জল অল্প করে বারে বারে দিতে হবে। অন্ততঃ ২০ মিনিট ধরে জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে সেই জল রোগীকে দিতে হবে। রোগী সুস্থ হলে ব্যবহৃত সমস্ত কাপড়-চোপড়, বিছানা হয় মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে না হয় পুড়িয়ে ফেলতে হবে। নিয়ম ও পথ্য আন্ত্রিক রোগের অনুরূপ।

সংক্রামিত এলাকার এবং পার্শবর্তী এলাকার প্রত্যেককেই কলেরা ভ্যাকসিন নিতে হবে।

৭। অম্লরোগ

অম্লরোগ একটি সাংঘাতিক রোগ। এ রোগ আপাতঃদৃষ্টিতে জীবনসংশয়কারী না হলেও, মানুষের জীবনীশক্তি ও কর্মশক্তি নষ্ট করে আস্তে আস্তে অকালমৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শহর-জীবনে একটু খোঁজ নিলে দেখা যায়, অনেকেই এ রোগে ভুগছেন—কিন্তু আমরা বর্তমান অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে এমনই হাবুডুবু খাচ্ছি যে, প্রথম কয়েক মাস এ রোগের কথা অনেক সময় মনেও আসে না। যখন নিয়মিত বুক জ্বালা, পেটব্যথা আরম্ভ হয়, তখনই খেয়াল হয়। তখন কিন্তু চিকিৎসা করার সময় অনেকটা দেরী হয়ে যায়।

রোগের লক্ষণ—প্রথম দিকে, অনেক সময় রোগ বাইরে প্রকাশ পায় না, বেশ কয়েকদিন ভেতরে ভেতরে অম্বল হতে থাকে, রোগীর মেজাজ খিট্‌খিটে হয়, কাজে মন লাগে না, দেহে অবসন্নতা আসে, বারে বারে জলপিপাসা পায় এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। তাছাড়া, উদ্গার উঠতে থাকে, খাবার কিছুক্ষণ পর, বুক জ্বালা করে, টক্ ঢেকুর ওঠে এবং মুখ টক্ লাগে। অনেক সময় ক্ষুধা পায়, আবার একবার খেলে সমস্ত দিন আর খেতে ইচ্ছা করে না। রোগের শেষ পর্যায়ে পেটে অসহ্য ব্যথা আরম্ভ হয়। তখন একে বলা হয় অম্লশূল-ব্যথা। ব্যথা উঠলে সোডা বা ক্ষার-জাতীয় কোন কিছু খেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা কমে যায়।

রোগের কারণ—অক্ষুধায়, অল্প-ক্ষুধায় এবং অসময়ে পরিমিত বা অপরিমিত খাদ্যগ্রহণ, বাসী-পচা এবং বেশী মশলাযুক্ত খাদ্যগ্রহণ, অতিরিক্ত ডালডা-তেল-ঘি ও চর্বি দ্বারা রান্না করা খাদ্যগ্রহণ, শ্রমবিমুখতা ও ন্যূনতম ব্যায়ামের অভাব—এক কথায় বদহজম এ রোগের মূল কারণ। অক্ষুধায় ঐ সমস্ত উগ্র খাদ্য খেলে পাকস্থলীতে ঐ খাদ্যদ্রব্য হজম করতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় এবং পাচকরস নিঃসরণকারী গ্রন্থিগুলিকে অতিরিক্ত পাচকরস সরবরাহ করতে হয়। ফলে কয়েকদিন পরে তারাও দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন আর ঐসব গ্রন্থি থেকে প্রয়োজনমতো পাচকরস নিঃসৃত

হয় না। এই অজীর্ণ খাদ্য গ্রহণীনাড়িতে চলে যায় এবং সেখানে পিত্তরস ও যকৃৎরস এসে ঐ অজীর্ণ খাদ্যকে পরিপাক করার চেষ্টা করে। এই রস এ্যাসিডের মত তীব্র ও শক্তিশালী। ক্ষুদ্রান্ত্রেও যখন ঐ সব খাদ্য হজম হয় না, তখন ঐসব রস ও অজীর্ণ খাদ্য পচে অম্লবিষ সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় পাচকরস ও পিত্তরস অজীর্ণ খাদ্যকে জীর্ণ করে এবং নিজেরাও জীর্ণ হয়। কিন্তু অজীর্ণ হলেই অম্লবিষে পরিণত হয়। এই অম্লবিষ রক্তের ক্ষারজাতীয় অংশকে নষ্ট করে দেয়—ফলে দেহের স্নায়ু, পেশী, গ্রন্থি প্রভৃতি সকল দেহযন্ত্র আস্তে আস্তে অকেজো হয়ে আসতে থাকে। ঐ অম্লবিষ বুকে উঠলে বুক জ্বালা করে ও যন্ত্রণা হয় এবং গলায় উঠলে গলা জ্বালা করে ও মুখ টক্ লাগে। যখনই পেটের দেহযন্ত্রগুলি শোধিত রক্তের অভাব বোধ করে, তখনই অসহ্য ব্যথা আরম্ভ হয়। এই ব্যথাকে বলা পিত্তশূল বা অম্লশূল-ব্যথা।

দেহের রক্তে যখন দূষিত পদার্থের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পায় তখন রক্তবাহী শিরা-উপশিরা ঐ অম্লবিষে জর্জরিত হয়ে তার স্থিতি-স্থাপকতা হারায় এবং শক্ত হয়ে যায়, আর ঠিকমত কাজ করতে পারে না। দেহের প্রতিটি দেহযন্ত্র তখন বিশুদ্ধ রক্তের জন্য স্থানীয় স্নায়ুজালকে উত্তেজিত করতে থাকে ফলে প্রদাহ ও তীব্র ব্যথা আরম্ভ হয়।

দেহে যকৃত নিঃসৃত পিত্তরস চর্বিজাতীয় খাদ্য জীর্ণ করে, যকৃত যখন দুর্বল হয়ে পড়ে রক্তবাহী শিরাও যখন কর্মক্ষমতা হারায় তখন যকৃত নিঃসৃত পিত্তরস আর প্রয়োজন মত সরবরাহ হয় না—ফলে ঐ রস তখন তীব্র অম্লবিষে পরিণত হয়—এই অবস্থাকে বলা হয় পিত্তশূল ব্যথা। একই অবস্থা যদি হৃৎপিণ্ড বা তার চারপাশে কোথাও আরম্ভ হয় তখন বলা হয় হৃদ্‌শূল। এ সব কিছুর জন্য দায়ী কিন্তু অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি।

রোগ নিরাময়ের উপায়—রোগ খুব কঠিন হয়ে দেখা দিলে, সকালে উঠেই একটু লবণসহ ভরপেট জল (শীতকালে জল একটু গরম করে নিতে হবে) খেতে হবে। তারপর ১ মিনিট পরে গলায় আঙুল দিয়ে জল বের করে ফেলে দিতে হবে। কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে আবার জল খেয়ে একইভাবে জল বমি করে ফেলে দিতে হবে। প্রথম তিন দিন তিন বার করে ঐভাবে জল-বমি করতে হবে এবং পরে যতদিন পর্যন্ত রোগ প্রশমিত না হয়, ততদিন একবার করে প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যেতে হবে। ১ ঘণ্টা কোন খাবার না খেয়ে পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিতে হবে। রোগপ্রশমিত হওয়ার পর, সকালে উঠে সহজ বস্তি-ক্রিয়া পবন-মুক্তাসন অর্ধ-কূর্মাসন, বিপরীতকরণী মুদ্রা ও যোগমুদ্রা অভ্যাস করতে হবে। বিকালে পদ-হস্তাসন, অর্ধ-চক্রাসন, পশ্চিমোত্থানাসন, মৎস্যাসন এবং সর্বাংগাসন করতে হবে। তীব্র অম্লশূল-ব্যথা আরম্ভ হলে, নাসিকা-ছিদ্র পরিবর্তন করে শ্বাস প্রবাহিত করলে অর্থাৎ যে নাসিকাছিদ্র দিয়ে শ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে, ঐ নাসিকাছিদ্র বন্ধ করে, অন্য নাসিকাছিদ্র দিয়ে শ্বাস প্রবাহিত করালে ব্যথা কিছুক্ষণের মধ্যে প্রশমিত হয়।

পথ্য ও নিয়ম—অম্লরোগে আহার সম্বন্ধে বিশেষভাবে সজাগ থাকতে হবে। আহারের চার ভাগের তিন ভাগ ক্ষারজাতীয় খাদ্যদ্রব্য খাওয়া বাঞ্ছনীয়। যে-সমস্ত রোগীর বুকজ্বালা, গলাজ্বালা, অম্লশূলের ব্যথা আছে, তাদের প্রথম দিন সম্পূর্ণ

উপবাস করতে হবে। উপবাসের সময় ঈষৎ গরম জলে লেবুর রস মিশিয়ে যতবার ইচ্ছা পান করা যেতে পারে। প্রথম দিনে, অন্য কোন পথ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। যদি অম্লশূলের ব্যথা না থাকে, তবে গরম জলের পরিবর্তে ঠান্ডা জল পান করতে হবে। দ্বিতীয় দিনে যে কোন লঘুপথ্য গ্রহণ করা যেতে পারে, তবে পথ্যের মধ্যে ক্ষারজাতীয় উপাদান বেশী থাকা বাঞ্ছনীয়। বুকজ্বালা, গলাজ্বালা, ব্যথা প্রভৃতি উপসর্গগুলি দূর হয়ে যাবার পরও চার-পাঁচ দিন লঘু ও সহজপাচ্য খাবার খেতে হবে। এই সময় অক্ষুধায় বা অল্প-ক্ষুধায় কোন খাবার খাওয়া একেবারেই উচিত নয়। প্রধান আহারের পর, অন্ততঃ ১ ঘণ্টা ডান নাসাপথে শ্বাস প্রবাহিত করালে, অম্লরোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

যতদিন রোগী সম্পূর্ণ রোগমুক্ত না হবে, ততদিন খাদ্যের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ যাতে ক্ষারজাতীয় খাদ্য হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঘি, মাখন, চর্বি, মাংস, ডিম, ছানা ও ছানার তৈরী কোন খাদ্য, অধিক মশলাযুক্ত খাদ্য অম্লরোগীর কখনই গ্রহণ করা উচিত নয়। তবে ঘোল বা ঘোলের সরবৎ অম্লরোগীর পক্ষে উপকারী। এইভাবে আহারের প্রতি দৃষ্টি রেখে, প্রয়োজনমত ও নিয়মমত ব্যায়াম ও যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস রাখলে, সহজে অম্লরোগ নিরাময় হয় এবং ভবিষ্যতেও এ রোগ পুনরায় হবার সম্ভাবনা থাকে না।

৮। কৃশতা

কৃশতা রোগ বহু কারণে হতে পারে। পিতামাতার সন্তান-বীজের উপর সদ্য-আগত শিশুর সুস্থতা, কৃশতা, দুর্বলতা ও রুগ্নতা নির্ভর করে। পিতামাতার সন্তান-বীজ যদি সুস্থ ও সবল থাকে, তবে কোন শিশুই কৃশতা বা রুগ্নতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। তবে জন্মাবার পর শিশুর পথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখলে, কয়েক মাসেই শিশুর রুগ্নতা বা কৃশতারোগ দূর হয়ে যায়।

আমাদের সকলেরই জানা আছে, শিশুর মায়ের দুধের চেয়ে ভাল খাদ্য আর নেই। তবে মা যদি রুগ্না হন, তবে সে মায়ের দুধ শিশুর দেহের তো কোন উপকার করেই না বরং অপকার করে। সে-ক্ষেত্রে মা যতদিন না রোগমুক্ত হন, ততদিন শিশুর খাদ্যের বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুর জন্য মায়ের দুধের পরেই আসে গরুর দুধ বা ছাগলের দুধ প্রভৃতি। এইসব দুধ শিশুকে দেওয়ার সময় শিশুর হজমশক্তির উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। শিশুকে বাজারের কোন বেবীফুড্ দেওয়ার পূর্বে ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে। কারণ, বেশীর ভাগ তথা-কথিত বেবীফুড্ শিশুদের পক্ষে অনুপযোগী।

উপযুক্ত খাদ্যাভাবও শিশুদের কৃশতারোগের আর একটি কারণ। দারিদ্র্যতার জন্য শিশু জন্মাবার কয়েকমাস পরেই মা-বাবা ভাত, মাছ প্রভৃতি খাদ্য শিশুকে দিতে আরম্ভ করেন, ফলে অল্পদিনেই শিশুর হজমশক্তি নষ্ট হয়ে যায়—যকৃৎ দুর্বল হয়ে পড়ে। শিশু দুর্বল ও কৃশ হতে থাকে। আমাদের মত গরম দেশে শিশুদের এক বছর বয়সের পূর্বে আমিষজাতীয় খাদ্য না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আবার মা-বাবার স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাবেও শিশুর এ রোগ হয়। অতি আদরের ফলে শিশু এ রোগে

আক্রান্ত হতে পারে। অনিয়মিত ও অপরিমিত খাদ্য গ্রহণের ফলে শিশুর হজমশক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং যকৃৎ তার কর্মক্ষমতা হারায়। প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর কৃশ ও রুগ্ন হওয়ার বহু কারণ থাকতে পারে। যেমন, গ্রন্থিগুলির দুর্বলতা, অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম, বিশ্রামের অভাব, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা বা তারল্য-রোগ প্রভৃতি। কৃশতা বিশেষ কোন রোগ নয়—ইহা অন্য সব রোগের বহিঃপ্রকাশ। এ রোগ দূর করতে হলে, প্রথমে রোগের কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আহার ও নিয়ম মেনে চলতে হবে। সেই সঙ্গে প্রয়োজনমত ব্যায়াম বা যোগ-ব্যায়াম করতে হবে।

৯। মেদরোগ বা স্থূলতা

চর্বি বা মেদ আমাদের দেহের পক্ষে অত্যাবশ্যক। শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ চর্বি চামড়ার ঠিক নিচে থাকে। চর্বি আমাদের দেহ নরম ও মসৃণ রাখে, দেহে তাপ সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং উত্তাপ বজায় রাখে। তাছাড়া দেহে চর্বি না থাকলে, সহজে চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, দৌড়ানো, লাফানো কখনই সম্ভব হতো না। অস্থির সন্ধিস্থলে ও মাংসপেশীর পাশাপাশি চর্বি আছে বলেই ঐ সব কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব। শুধু তাই নয়, আমরা যখন ক্ষুধার্ত হই বা উপবাস করি বা অন্য কোন কারণে খাদ্যগ্রহণে অসমর্থ হই, তখন আমাদের সঞ্চিত চর্বি ক্ষয় হয়ে দেহযন্ত্র-গুলিকে চালু রাখে এবং দেহের শক্তি ক্ষতিপূরণ করে। তাই অসময়ে দেহযন্ত্রগুলি চালু রাখার জন্য আমাদের কিছু চর্বি সঞ্চিত রাখা প্রয়োজন। কিন্তু এই চর্বি যদি দেহে অত্যধিক জমা হয় ; আর চর্বির সঙ্গে যদি মাংস বাড়তে আরম্ভ করে তবে তা দেহের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক। দেহে চর্বি না থাকলে যেমন আমরা হাঁটতে, চলতে, বসতে, দৌড়তে, লাফাতে পারি না, তেমনি দেহে অতিরিক্ত চর্বি জমলেও একই দশা হয়। মেদবহুল রোগী স্বাভাবিকভাবে কর্মক্ষমতা ও রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা হারায় এবং প্রায়ই রক্তচাপবৃদ্ধি ও বহুমূত্র রোগের শিকার হয়। তাই স্ত্রী ও পুরুষ সবারই দেহে কিছু চর্বি সঞ্চিত থাকা অবশ্য প্রয়োজন—কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত নয়। প্রাকৃতিক নিয়মে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের চর্বি একটু বেশিই থাকে—তাই মেয়েদের দেহ এত নরম ও কমনীয়। তাছাড়া মেয়েদের সন্তানধারণ এবং সেই সন্তানের দেহ-গঠনের জন্য দেহে সঞ্চিত চর্বির পরিমাণ একটু বেশী রাখার প্রয়োজন হয়। চর্বিহীনা মেয়েদের সন্তান রুগ্ন হয়।

মেদ বাড়তে শুরু করলে প্রথমেই ব্যবস্থা নিন—ওজন যত বাড়বে ওজন কমানো ততই কঠিন হবে, নিচে উচ্চতা ও দেহের গড়ন অনুযায়ী সাধারণতঃ নিচের চার্ট অনুযায়ী থাকা বাঞ্ছনীয়—এর থেকে শতকরা ১০ ভাগ ওজন বৃদ্ধি পেলেই মেদ বৃদ্ধি বা স্থূলতা রোগ বলা যেতে পারে।

ওজন—কিঃ গ্রাঃ হিসাবে

উচ্চতা		দেহের গড়ন					
		ছোট		মাঝারি		বড়	
ফুট	ইঞ্চি	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
৫	০	৫০	৪৫	৫৩	৪৯	৫৬	৫২
৫	৩	৫৩	৪৯	৫৬	৫১	৫৯	৫৬
৫	৫	৫৭	৫২	৫৯	৫৫	৬৩	৫৯
৫	৮	৬৩	৫৯	৬৬	৬২	৬৯	৬৫
৫	১০	৬৬	৬২	৬৯	৬৫	৭৩	৬৯

রোগের কারণ—দেহে নানা কারণে চর্বি জমতে পারে। এই মেদরোগ কারো কারো মা-বাবার দোষে হয়—অর্থাৎ, মা কিংবা বাবা চর্বিবহুল হলে, সন্তানও চর্বি-বহুল হতে পারে। মা-বাবার গ্রন্থির দোষেও সন্তান মেদরোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এজাতীয় কারণ শতকরা পঁচিশ ভাগের বেশী নয়। তাছাড়া, শিশুদের চর্বি ও স্নেহজাতীয় খাবার বেশী খেতে দিলে বা প্রয়োজন-মতো ছোটাছুটি করতে না দিলে, তাদের দেহে চর্বি জমতে পারে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে, সাধারণতঃ দিবানিদ্রা, শ্রমবিমুখতা, অতিভোজন, অধিক পরিমাণে আমিষ ও চর্বিজাতীয় খাদ্যগ্রহণ, পরিপাকযন্ত্র ও গ্রন্থির অকর্মণ্যতা, ন্যূনতম ব্যায়ামের অভাব প্রভৃতি কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। মেদরোগীরা প্রায়ই ভোজনবিলাসী হয়। কারণ, অতিরিক্ত মেদ জমার ফলে, উদরে ঠিকভাবে বায়ু সঞ্চারিত হতে পারে না—ফলে বায়ু ক্ষুব্ধ হয়ে জঠরাগ্নি বৃদ্ধি করে এবং কৃত্রিম ক্ষুধার উদ্রেক করে। তাই দেখা যায়, সাধারণ লোকের চেয়ে মেদবহুল লোকেরা বেশী খায়। এভাবে, এ রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

রোগ নিরাময়ের উপায়—মেদরোগীদের আহারে সংযমী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সকালে অল্প পরিমাণে চিড়া, মুড়ি, খই অথবা সেঁকা-রুটি-জাতীয় যে-কোন ধরনের খাবার এবং সেই সঙ্গে এক কাপ (চিনি ছাড়া), পাত্‌লা দুধ এক চামচ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে। দুপুরে ১০টা থেকে ১২টার মধ্যে ভাত, ডাল, শাকসব্‌জি, তরকারি, মাছ প্রভৃতি খাওয়া যেতে পারে—তবে তরকারী ও শাকসব্‌জির পরিমাণ বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়। চর্বি বা অধিক মশলাযুক্ত খাবার খাওয়া উচিত নয়। কাঁচা ঘি, মাখন বা ঐ-জাতীয় কোন জিনিষ রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত একেবারে খাওয়া উচিত নয়। দুপুরে খাবার পর এক গ্লাস পাত্‌লা ঘোল খেতে পারলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। বিকালে অল্প যে-কোন জলখাবার খাওয়া যায় —তবে ক্ষুধা না থাকলে খাওয়া উচিত নয়।

রাত্রে দু' একটি আটার রুটি ডাল বা শাকসব্‌জিসহ খাওয়া যেতে পারে। তবে, তা ৯টার মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত সপ্তাহে একবেলা অথবা পনের দিনে একদিন সম্পূর্ণ উপবাস করতে হবে। তাছাড়া পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় নিশিপালন করা উচিত। উপবাসের সময় প্রচুর পরিমাণে লেবুর রসসহ জল পান করা বাঞ্ছনীয়।

সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে কাগজি বা পাতিলেবুর রসসহ একগ্লাস জল পান করে, পবন-মুক্তাসন, উত্থিত-পদাসন, অর্ধ-চক্রাসন, পদ-হস্তাসন, পশ্চিমোত্থানাসন করতে হবে। রোগ একটু প্রশমিত হলে, ঐ সঙ্গে মৎস্যাসন ও সর্বাংগাসন করলে আরো ভাল ফল পাওয়া যাবে। কিছুদিন পর উষ্ট্রাসন, ধনুরাসন, হলাসন প্রভৃতি করা যেতে পারে। তবে, এক সঙ্গে ছয় থেকে আটটি আসনের বেশী যেন না হয়।

বিকালে পঁয়তাল্লিশ মিনিট দ্রুত ভ্রমণ অথবা সুবিধা বা অভ্যাস থাকলে আধ-ঘণ্টা সাঁতার কাটলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। রাত্রে ঘুমোবার পূর্বে পনের মিনিট বজ্রাসন অবশ্য করণীয়।

নিষেধ—দিবানিদ্রা একেবারে নিষিদ্ধ।

১০। বহুমূত্র (Diabetes)

আধুনিক চিকিৎসা-জগতে যে কয়েকটি রোগ এখনও মারাত্মক বলে চিহ্নিত তাদের মধ্যে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস অন্যতম। এ একটা জটিলতম রোগ—শরীরের সব অংশে কামড় বসায় এমনকি হৃদপিণ্ডকেও রেহাই দেয় না।

সাধারণতঃ মধ্যবয়েসি ও মেদবহুল ব্যক্তিরাই এ রোগের শিকার হন। অল্প বয়েসে যে এ রোগ হয় না তা নয়। তবে সংখ্যায় নগণ্য এবং হলে বাঁচানো খুবই কঠিন। এ রোগ বংশানুক্রমেও আসতে পারে। জন্ম সময়ে মা কিংবা বাবার যে কোন একজনের বহুমূত্র রোগ থাকলে কালে সন্তানের জীবনেও দেখা দিতে পারে। আর মা-বাবার উভয়ের যদি এ রোগ থাকে তবে বলা যেতে পারে শতকরা ৯৮ ভাগই এ রোগ হবার সম্ভবনা থাকে যদি না সে আজীবন স্বাস্থ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে।

বহুমূত্ররোগ দুই প্রকার—শর্করাযুক্ত বহুমূত্র (Diabetes Mellitus) এবং শর্করাবিহীন বহুমূত্র (Diabetes Insipidus)।

এখন প্রশ্ন হলো ডায়াবেটিস রোগ বলতে কি বোঝায়? সাধারণতঃ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহে প্রতি ১০০ মিলিমিটার রক্তে ৮০ থেকে ১১০ মিলিগ্রাম সুগার থাকে, এর বেশী পরিমাণ যখন কোন মানুষের দেহে চলতে থাকে তখন তাকে ডায়াবেটিস রোগী বলা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে যদি কোন মানুষের দেহে খালি পেটে রক্তের নমুনায় প্রতি ১০০ মিলিমিটার রক্তে ১১০/১২৫ মিলিগ্রাম সুগার এবং শর্করা-জাতীয় খাদ্য খাবার দু'ঘণ্টা পর রক্তের ঐ একই পরিমাণে ১৭০/১৮০ মিলিগ্রাম পাওয়া যায় তবে তাকে নিশ্চিত ডায়াবেটিস রোগী বলা যায়।

আবার ডায়াবেটিস আরো দু'টি ভাগে ভাগ করা যায় ম্যাচিউরড এবং আন-ম্যাচিউরড। ম্যাচিউরড প্রাপ্তবয়স্কদের এবং আনম্যাচিউরড শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একপ্রকার ভাইরাস আক্রমণে শিশুদের অগ্ন্যাশয়ের বিটা-কোষ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় ফলে অগ্ন্যাশয় আর ইনসুলিন হরমোন তৈয়ারি করতে পারে না। এদিকে দেহে ক্রমেই সুগার বাড়তে থাকে—তখন একমাত্র উপায় ঠিক সময়ে পরিমাণ মত নিয়মিত ইন্সুলিন ইনজেকসান, না হলে মৃত্যু অবধারিত।

বহুমূত্ররোগ সংক্রামক নয়, কিন্তু রোগটি অতি মারাত্মক। এ রোগ মানুষের জীবনীশক্তি তিলে তিলে নিঃশেষ করে, মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। এ রোগ

একবার ধরলে সহজে ছাড়ে না। তাছাড়া এ রোগ থাকলে রোগীর দেহে ঘা বা ফোঁড়া হলে অথবা কোথাও কেটে গেলে সহজে সারে না। এমনকি, সামান্য ক্ষতও মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ—এই রোগের প্রধান ও বিশেষ লক্ষণ প্রস্রাবের সঙ্গে চিনি (শর্করা) নির্গত হয়। আক্রান্ত লোক প্রস্রাব করলে, কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে মাছি ও পিঁপড়ে জমতে দেখা যায়। তাছাড়া, ঘন ঘন মূত্রত্যাগ, জলপিপাসা, মুখে মিষ্টি-স্বাদ, মাঝে মাঝে গায়ে চুলকানি দেখা দেওয়া, গায়ের চামড়া শুকনো এবং দাঁত ফ্যাকাসে বা ময়লা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি এই রোগের লক্ষণ। রোগের কঠিন অবস্থায় মাথাধরা, মাথাঘোরা, দুর্বলতাবোধ, কোষ্ঠকাঠিন্য বা কোষ্ঠতারল্য—মূত্রাশয়ে যন্ত্রণা, হাত-পা ঝিন ঝিন করা, চোখের নানা অসুখ, ধমনী ও শিরার অসুখ, শ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যাঘাত, যৌন অক্ষমতা, গর্ভপাত, রেচনতন্ত্রে বিশৃংখলা, চেতনালুপ্তি এমন কি হার্ট-এ্যাটাক পর্যন্ত হতে পারে। দেহে কোন প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না, যে কোন সময় যে কোন রোগ বা জীবাণু আক্রমণ করতে পারে।

রোগের কারণ—এর প্রত্যক্ষ কারণ অগ্ন্যাশয় (প্যাংক্রিয়াস) ও যকৃৎ (লিভার) গ্রন্থির দুর্বলতা। এই গ্রন্থিদ্বয়ের বিপর্যয়ের ফলে বহুমূত্ররোগ হয়। অগ্ন্যাশয়গ্রন্থি দুর্বল হলে, ঠিকমত ইনসুলিন-রস নিঃসরিত হতে পারে না—অথচ দেহে ঐ রসের অভাব ঘটলে, আমাদের গ্রহণকরা খাদ্যবস্তু থেকে যে-গ্লুকোজ বা চিনি (শর্করা) উদ্বৃত্ত হয়, তা যকৃতে সঞ্চিত না হয়ে প্রস্রাবের সঙ্গে দেহ থেকে বের হয়ে যায়। এই গ্লুকোজ বা চিনিই প্রয়োজনমত দগ্ধ হয়ে দেহের তাপ, দেহস্থ পেশী, তন্তু ও স্নায়ুর জীবনীশক্তিকে অটুট রাখে। এ রোগের পরোক্ষ কারণ—অতিভোজন, অধিক শর্করাজাতীয় খাদ্যগ্রহণ, অতিরিক্ত চা, কফি, মাংস, ডিম, ঘি, মিষ্টিগ্রহণ, অধিক মশলাযুক্ত খাদ্যগ্রহণ, অত্যধিক মানসিক চিন্তা, কায়িক পরিশ্রম না করে, শুধু মগজ চালনা, অসংযমী জীবনযাপন প্রভৃতি।

রোগ নিরাময়ের উপায়—বহুমূত্ররোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ামাত্র একদিন সম্পূর্ণ উপবাস করতে হবে। উপবাসকালে যত ইচ্ছা জলপান করা যেতে পারে, তবে একেবারে বেশী নয়। উপবাসের সময় মুখে এক টুকরো আমলকি বা হরিতকি রাখলে জল-পিপাসা কম হবে। সম্পূর্ণ উপবাস সম্ভব না হলে, টকজাতীয় ফল, যেমন—কমলালেবু, আনারস প্রভৃতি খাওয়া যেতে পারে। উপবাসে শতকরা ১০ ভাগ রোগ কমে যাবে। তারপর, খাবারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত, চাল, আটা, সাগু, বার্লি প্রভৃতি শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য ; ডিম, মাংস প্রভৃতি আমিষজাতীয় খাদ্য যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। এসব খাদ্য কিছুদিন বন্ধ রাখাই উচিত। টক দই, ঘোল, নারকেল, পাকা কলা, টমাটো, থোড়, মোচা, ডুমুর, টাট্‌কা শাকসব্‌জি, কাঁচকলা, পেঁপে, ওল প্রভৃতি বহুমূত্র-রোগীদের আদর্শ খাদ্য ও তার পরিমাণ এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়—যা সহজে হজম হয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে সম্পূর্ণ উপবাস করা উচিত।

তাছাড়া, নিম্নলিখিত যোগ-ব্যায়ামগুলি নিয়মিত ও নিয়মমত অভ্যাস করলে বহুমূত্র রোগ নিরাময় হয়ে যায়। তবে যোগ-ব্যায়ামগুলি যতটা সহজে হয়, ততটুকু করা বাঞ্ছনীয়। একদিনে সবগুলি এবং ঠিকমত করতে হবে, এমন মনে করা উচিত নয়। কয়েকদিন অভ্যাসের পর ঠিক হয়ে যাবে।

ভোরে মুখ ধুয়ে ১।২ গ্লাস জল পান করে, পবন-মুক্তাসন, বিপরীতকরণী মুদ্রা, যোগ মুদ্রা, পদ-হস্তাসন করা উচিত। সকালবেলা জলখাবার খাওয়ার আধ-ঘণ্টা পর পশ্চিমোত্থানাসন, অর্ধ-কূর্মাসন, মৎস্যাসন, সর্বাংগাসন করতে হবে। বিকালে জানু-শিরাসন, পদ-হস্তাসন, ধনুরাসন, সর্বাংগাসন ও মৎস্যাসন অভ্যাস করা দরকার। তারপর আধ-ঘণ্টা খোলা জায়গায় ভ্রমণ এবং রাত্রে খাবার পর ১০ মিঃ বজ্রাসন করতে হবে। ইনসুলিন ইনজেকসান নিলে এ রোগ সাময়িকভাবে কমে যায়—তবে ইনজেকসান বন্ধ করলে আবার দেখা দেয়। তাই পরিমিত ও নির্দিষ্ট আহার এবং যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস করলে, এ রোগের হাত থেকে দেহকে দূরে রাখা সম্ভব হতে পারে।

১১। রক্তচাপরোগ (ব্লাড-প্রেসার)

রক্তচাপ দু'রকম হতে পারে। যে-কোন কারণে হৃদ্‌যন্ত্রকে যখন অত্যন্ত পরিশ্রম করে অস্বাভাবিক চাপ দিয়ে রক্তবাহী ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্ত পাঠাতে হয়, তখন এই অস্বাভাবিক রক্তচাপকে রক্তচাপবৃদ্ধি (High Blood-Pressure বা Highper tension) রোগ বলা হয়। আর প্লীহা, যকৃৎ, ফুসফুস্ প্রভৃতি দুর্বলতার জন্য যখন দেহে বিশুদ্ধ রক্তের অভাব হয় এবং ধমনী ও শিরার দুর্বলতায়, যখন সতেজ রক্ত চলাচল করতে পারে না, তখন রক্তের চাপ কমে যায়—এই রক্তচাপ-স্বল্পতাকে বলা হয় স্বল্প-রক্তচাপ (Low Blood-Pressure বা Highpo tension) রোগ। এই দু'টি রক্তচাপ রোগের মধ্যে রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ বেশী মারাত্মক—যে-কোন মুহূর্তে রোগী মারা যায়। রক্তচাপ দুই রকমঃ—১। সিস্টলিক (Systolic), ২। ডায়াস্টলিক (Diastolic)। যখন হৃৎপিণ্ড পাম্প করে রক্ত সমস্ত দেহে ছড়িয়ে দেয় তখন তার চাপ বেশী থাকে—তখন তাকে বলা হয় সিস্টলিক প্রেসার, আবার যখন রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তখন চাপ কম থাকে এবং তাকে বলা হয় ডায়াস্টলিক প্রেসার। সিস্টলিক থেকে ডায়াস্টলিক প্রেসার ৪০-এর মত কম হয় অর্থাৎ যার সিস্টলিক প্রেসার ১২০ তখন তার ডায়াস্টলিক প্রেসার হওয়া উচিত ৮০ (একটু কম-বেশী)।

রক্তচাপবৃদ্ধি রোগের লক্ষণ—রক্তচাপ বৃদ্ধি হ'লে মাথায় যন্ত্রণা হয়, মাঝে মাঝে ঘাড় ব্যথা করে এবং শরীর অস্থির হয় ও কাঁপতে থাকে—মাঝে মাঝে কানের মধ্যে সোঁ সোঁ আওয়াজ হয়। রাগ বেড়ে যায়, চিৎকার বা গণ্ডগোল সহ্য হয় না, অল্পতেই ধৈর্য হারাতে হয়, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না—বাঁদিকে শুতে কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে রোগী জ্ঞান পর্যন্ত হারাতে পারে।

রক্তচাপ বৃদ্ধির কারণ

প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রোটিন, চর্বি ও শর্করা জাতীয় খাদ্যগ্রহণ, দীর্ঘকাল মানসিক চিন্তা বা চাপ, কায়িক শ্রমবিমুখতা এ রোগের বিশেষ কারণ, আমাদের দেহে প্রোটিন সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। আমিষ বা নিরামিষ প্রোটিন জাতীয় অতিরিক্ত খাবার যদি দিনের পর দিন খাওয়া হয়, তবে প্রথমে দেহযন্ত্রগুলি ঐ অতিরিক্ত প্রোটিন দেহ থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু যন্ত্রগুলির শক্তির তো একটা সীমা আছে। অতিরিক্ত পরিশ্রম করে করে একদিন ঐ যন্ত্রগুলি দুর্বল এমনকি অকেজো হয়ে পড়ে—ফলে দেহ থেকে ঐ অতিরিক্ত প্রোটিন আর বের হতে পারে না। প্রোটিন

পচে দেহে অম্লবিষ (Urea) সৃষ্টি করে এবং রক্তে মিশে যায়। ফলে রক্ত অম্লবিষে দূষিত হয়ে যায় এবং দেহ তখন বিশুদ্ধ রক্ত পায় না। শুধু তাই নয় রক্তের ঐ অম্লবিষ ধমনী, শিরা-উপশিরার নমনীয়তা নষ্ট করে দেয়। দেওয়াল শক্ত হয়ে যায় ফলে হৃৎপিণ্ড সহজে দেহে রক্ত আদান-প্রদান করতে পারে না অথবা রক্তে যদি কোলেস্টেরলের মাত্রা খুব বেশী হয় হৃৎপিণ্ডকে তখন অতিরিক্ত পরিশ্রম করে চাপ দিয়ে রক্ত আদান-প্রদান করতে হয়। এই অতিরিক্ত চাপকে রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগ বলা হয়। আর যেহেতু ধমনী, শিরা-উপশিরার নমনীয়তা থাকে না রক্তের অতিরিক্ত চাপের ফলে যে কোন মুহূর্তে এক জায়গায় ছিঁড়ে যেতে পারে এবং এই দুর্ঘটনা যদি বুকে হয়, তবে রোগী বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করবে, গা দিয়ে ঘাম ঝরবে। এই অবস্থাকে বলা হয় হার্ট য়্যাট্যাক (Heart attack) আর এই দুর্ঘটনা যদি মস্তিষ্কে হয় তখন বলা হয় করোনারী বা সেরিব্র্যাল থ্রম্বসিস্ ফলে দেহের আংশিক বা সম্পূর্ণ পক্ষঘাত (Paralysis) অথবা মৃত্যু—কারণ মস্তিষ্ক দেহের স্নায়ুজাল নিয়ন্ত্রণ করে।

আবার দেহে প্রয়োজনাতিরিক্ত চর্বি জমতে থাকলে ঐ চর্বি ধমনী, শিরা-উপশিরার দেওয়ালে জমতে থাকে এবং রক্ত চলাচলের পথ সরু হয়ে যায়। তখন হৃৎপিণ্ডকে অতিরিক্ত চাপ দিয়ে দেহে রক্ত আদান-প্রদান করতে হয় এবং ফল ঐ একই।

নিম্ন বা স্বল্প-রক্তচাপ রোগের লক্ষণ—রক্তচাপ কমে গেলে কানের ভিতর সোঁ সোঁ শব্দ হয়, মাঝে মাঝে মাথা ঘোরে—এমনকি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে রোগী কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। রাত্রে বার বার প্রস্রাবের বেগ হয় ও ঘুম ভেঙে যায়, বাঁ পাশে শুতে কষ্ট হয়, সুনিদ্রা হয় না, কোন কাজে উৎসাহ থাকে না, অল্পতেই ধৈর্য হারাতে হয়।

স্বল্প-রক্তচাপ রোগের কারণ—প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব, প্লীহা, যকৃৎ, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতির দুর্বলতার জন্য দেহে বিশুদ্ধ রক্তের অভাব, অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনা, অতিরিক্ত খাটুনি ও বিশ্রামের অভাব অথবা ন্যূনতম কায়িক পরিশ্রমের অভাব, রক্তবাহী ধমনী ও শিরার দুর্বলতা প্রভৃতি এ রোগের কারণ।

শরীরে যদি অন্য কোন রোগ না থাকে এবং উপরোক্ত লক্ষণগুলি বা কয়েকটি লক্ষণ দেখা দেয়, তবে কালবিলম্ব না করে, রক্তচাপ-নির্ধারক যন্ত্রের সাহায্যে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা রক্তচাপ দেখে নেওয়া অবশ্যই দরকার। কারণ, রোগ জানতে পারলে, তা নিরাময় করা সহজ হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র মতে রক্তের চাপ যদি ১৫৫ মিলিমিটারের বেশী হয়, তাহলে তাকে রক্তচাপবৃদ্ধি-রোগ বলা হয়। আর যদি রক্তের চাপ ১১০ মিলিমিটারের কম হয়, তবে তাকে নিম্ন-রক্তচাপ রোগ বলা হয়; তবে বয়স ও স্বাস্থ্যানুযায়ী কয়েক মিলিমিটার অবশ্যই কম-বেশী হতে পারে।

রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ নিরাময়ের উপায়—প্রয়োজন মত বিশ্রাম না নিয়ে বেশী দৈহিক বা মানসিক শ্রমের কাজ না করা, ক্রোধ সম্বরণ করা, জোরে কথা না বলা, মনে কোন দুঃশ্চিন্তা চেপে না রাখা, উপযুক্ত বিশ্রাম নেওয়া, ক্ষারজাতীয় সহজপাচ্য খাদ্য গ্রহণ করা, বেশী তেল, ঘি মশল্লাযুক্ত খাবার না খাওয়া, ডিমের কুসুম, মাখন, বনস্পতি বা ঐ জাতীয় কোন জিনিষ না খাওয়া, সকাল-সন্ধ্যা মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করা, সপ্তাহে একদিন সম্পূর্ণ উপবাস করা (উপবাসের সময় প্রচুর পরিমাণে জল পান করা বাঞ্ছনীয়), দুশ্চিন্তা দূর ক'রে যতটা সম্ভব মন প্রফুল্ল রাখা ইত্যাদি নিয়মগুলি অবশ্য পালনীয়। রক্তচাপবৃদ্ধি রোগের রোগীর পক্ষে কাঁচা-লবণ খাওয়া নিষিদ্ধ। চিনির পরিবর্তে মধু বা গুড় খাওয়া যেতে পারে। ধূমপান নিষেধ। বিশেষজ্ঞদের মতে সরষের তেল

বা অপরিশোধিত রেপসিড তেল হৃৎপিণ্ডকে জখম করতে পারে। এই সব তেলে এক প্রকার অ্যাসিড আছে যা কিনা আমাদের কনডাকটিং টিস্যুর পরিবর্তন ঘটায় ফলে হৃৎপিণ্ড ব্লক হয়ে যেতে পারে, হৃৎরোগীদের সূর্যমুখী, বাদাম বা নারকেল তেল দিয়ে রান্না করা খাবার খাওয়া উচিত কারণ এই জাতীয় তেলে একপ্রকার অ্যাসিড আছে যা রক্তে অতিরিক্ত কোলেস্টরেল হতে দেয় না।

এছাড়া নিম্নলিখিত আসন ও নিয়মগুলিও পালন করতে হবে। ভোরে উঠে এক বা দু'গ্লাস জল পান এবং প্রাতঃক্রিয়াদির পর জানুশিরাসন, অর্ধ-কূর্মাসন, অর্ধ-চক্রাসন (সহজভাবে যতটুকু হয়), বিপরীতকরণী মুদ্রা অভ্যাস করতে হবে। রোগ প্রশমিত হওয়ার পর, উপরোক্ত আসনের সঙ্গে সর্বাংগাসন এবং মৎস্যাসন করাও বাঞ্ছনীয়।

সন্ধ্যায় পদ-হস্তাসন (সহজভাবে যতটুকু সম্ভব), অর্ধ-কূর্মাসন, পদ্মাসন—দশ মিনিট (পা বদল করে) ও অগ্নিসার ধৌতি করতে হবে। সকাল-সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ মুক্তবাতাসে ভ্রমণ এবং দিনে অন্ততঃ তিন বার স্নান করা দরকার।

নিম্ন রক্তচাপের রোগীদের একই নিয়ম ও আসনাদি মেনে চলতে হবে, তবে আহার ও বিশ্রামের দিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। আহার পরিমিত, সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর হবে।

১২। স্নায়ুরোগ

স্নায়ুরোগ বা স্নায়বিক দুর্বলতা একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগ সংক্রামক নয় বা এ রোগ হলে রোগী সহজে মরেও না—তবু এ রোগ সাংঘাতিক। কারণ, এতে রোগী দিন দিন অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।

রোগের লক্ষণ—স্মরণশক্তিহীন, বুদ্ধিহীন, বিকলাঙ্গ, বলপ্রয়োগে অক্ষম, অতি নগণ্য কারণে ধৈর্যচ্যুতি বা রেগে যাওয়া, মূর্ছা যাওয়া প্রভৃতি অনেক রকম জটিলতা দেখা দিতে পারে। এ রোগ হলে, খুব সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। কারণ, আমাদের দেহ-পরিচালনায় স্নায়ুজাল এক বিশেষ ভূমিকা নিয়ে আছে। একটি মাত্র স্নায়ুর বিপর্যয়ের জন্য দেহের কোন অংশ অকেজো হয়ে যেতে পারে। তাই এ রোগ প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। প্রথম থেকে সতর্ক হলে সহজে এ রোগ নিরাময় হতে পারে।

রোগের কারণ—দীর্ঘদিন বিশ্রামের অভাব, দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রম অনুযায়ী খাদ্য বা বিশ্রামের অভাব, দীর্ঘদিন ও দীর্ঘসময় অতি ব্যায়াম, দীর্ঘদিন রাত্রি-জাগরণ, অসংযমী জীবনযাপন, রক্তাল্পতা বা দেহে বিশুদ্ধ রক্তের অভাব, দীর্ঘদিন দুশ্চিন্তা বা কোন মনের ইচ্ছা জোর করে চেপে রাখা ইত্যাদি এই রোগের কারণ।

রোগ নিরাময়ের উপায়—দেহে স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দিলেই উপরোক্ত কোন্ কারণের জন্য এ রোগ হয়েছে, তা খুঁজে বের করতে হবে। সেই কারণ, বের করতে পারলেই এ রোগ দূর করা সহজ হয়ে যাবে। যেমন, রক্তাল্পতা বা বিশুদ্ধ রক্তের অভাবের জন্য যদি এ রোগ হয়ে থাকে, তবে রোগীকে নিশ্চয় অম্ল, অজীর্ণ বা কোষ্ঠ-কাঠিন্য অথবা তারল্যরোগে ভুগতে দেখা যাবে এবং রোগ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিলেই স্নায়বিক দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে। যদি রক্তাল্পতার জন্য এ রোগ হয়ে থাকে, তবে যাতে দেহে বিশুদ্ধ রক্ত-সঞ্চার হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে পরিমিত, পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য খাদ্যগ্রহণ ও সকালে ঘুম থেকে উঠেই এক বা দু'গ্লাস জল খেয়ে পবন-মুক্তাসন, বিপরীতকরণী মুদ্রা, অর্ধ-কূর্মাসন ও পদ-হস্তাসন অভ্যাস

করতে হবে। সকালে জলখাবার খাওয়ার আধঘণ্টা পরে জানুশিরাসন, অর্ধ-চক্রাসন, সর্বাংগাসন ও মৎস্যাসন করতে হবে। বিকালে সাধ্যানুসারে মুক্তবায়ুতে ভ্রমণ এবং রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্বে দশ মিঃ বজ্রাসন প্রয়োজন। সপ্তাহে একদিন একবেলা সম্পূর্ণ উপবাস করা উচিত। যদি অত্যধিক কায়িক পরিশ্রমের জন্য এ রোগ হয়ে থাকে, তবে পরিমিত ও পুষ্টিকর আহার ও কয়েকদিন পূর্ণ বিশ্রাম নিলে এ রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। স্নায়ুরোগ কিন্তু কোন রোগ নয়, অন্য রোগের সৃষ্ট ফল বলা যেতে পারে। তাই রোগের আদি কারণ দূর হলেই, এ রোগ দূর হবে ।

১৩। কামলারোগ (জণ্ডিস্)

জণ্ডিস্ নিজে কিন্তু কোন রোগ নয়—অন্য সব রোগের একত্রিত ফল।

কামলারোগে আক্রান্ত রোগী যদিও দু'চারদিনে মারা যায় না, তবুও এ একটি সাংঘাতিক রোগ। সময়মত উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য—শেষ-দিকে কোন ডাক্তার-কবিরাজের পক্ষে রোগীকে বাঁচানা শক্ত। তাই রোগীর দেহে রোগের কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেলেই রক্ত পরীক্ষা করে সংগে সংগে নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগের লক্ষণ—কামলারোগে দেহ আক্রান্ত হ'লে, বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য বা কোষ্ঠ-তারল্য, ক্ষুধার অভাব, মুখে জল ওঠা, অবসন্ন-বোধ হওয়া এবং কিছুদিন পরে চোখ ও মূত্র হলুদবর্ণ হওয়া, মলের রং সাদা হওয়া এবং চক্ষুগোলক অস্বাভাবিক হওয়া, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। এ সময়ে যকৃতের আকারও বড় হয়, শক্ত হতে থাকে এবং রোগী ক্রমশঃ রক্তশূন্য হয়ে যায়। এ অবস্থায় রোগীর পেটে ও পায়ে জল জমতে পারে। রোগের এই অবস্থাকে "পাণ্ডুরোগ" বলা হয়। এই পাণ্ডুরোগই একদিন ভীষণাকার ধারণ করে, রোগীর সমস্ত দেহকে হলুদ-বর্ণ করে এবং দেহের সর্বত্র বিশেষভাবে পেটে ও পায়ে অত্যধিক জল জমিয়ে রোগীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। কামলারোগের এই শেষ অবস্থাকে "উদরী" রোগ বলা হয়। রোগী এই অবস্থায় এলে, বাঁচার আশা প্রায়ই থাকে না।

রোগের কারণ—এর উৎস জানতে হ'লে আমাদের পাচনতন্ত্র ও পরিপাকক্রিয়া সম্বন্ধে একটু জ্ঞান থাকা দরকার। এমন অনেক খাদ্য আছে যেগুলো পাকস্থলী জীর্ণ করতে পারে না। এ জাতীয় খাবার অজীর্ণ অবস্থায় গ্রহণী নাড়ীতে (ক্ষুদ্রান্ত্রে) চলে যায় এবং সেখানে যকৃৎ সৃষ্ট পিত্তরস ও অগ্ন্যাশয় (Pancreas) সৃষ্ট জারক রস দ্বারা জীর্ণ হয়। এই পিত্তরস খাদ্যকেও জীর্ণ করে এবং নিজেও জীর্ণ হয়। এই পিত্তরস তীব্র এ্যাসিড এবং কোন কারণে যদি রক্তে মিশতে থাকে তখনই দেহে জণ্ডিসের লক্ষণ প্রকাশ পায়, আজকাল প্রায়ই শুনা যায় জলের জন্য জণ্ডিস্ হচ্ছে—আসলে কিন্তু জলের জন্য সোজাসুজি জণ্ডিস্ হচ্ছে না। বীজাণুযুক্ত দূষিত জল শরীরে প্রবেশ করার ফলে আমাশয়, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ হচ্ছে যার ফলে গোটা বিপাকক্রিয়াকেই উলট-পালট করে দিচ্ছে। অজীর্ণ কোষ্ঠবদ্ধতার ফলে বৃহদান্ত্র মলে ভর্তি হয়ে থাকছে। গ্রহণী নাড়ী ঠিক মত পিত্তরস নিতে পারছে না আর এদিকে যকৃৎ সমানে পিত্তরস সৃষ্টি করে যাচ্ছে এবং যেহেতু গ্রহণী-নাড়ী পিত্তরস পাচ্ছে না যকৃৎ তখন অতিরিক্ত পরিশ্রম করে আরো বেশী পিত্তরস সৃষ্টি করে। এইভাবে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে যকৃৎ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অকেজো ও বড় হতে থাকে। আবার ঐ পিত্তরস ক্ষুদ্রান্ত্রে না গিয়ে রক্তের সংগে মিশে রক্ত পিত্তরসে জর্জরিত করে, রক্তের হিমোগ্লোবিন (Red corpuscle) ধ্বংস করে দেয়। দেহ তখন বিশুদ্ধ রক্ত পায় না, তখন শরীরে জণ্ডিসের

সমস্ত লক্ষণগুলি যেমন চোখের সাদা অংশ হলদে হয়ে যায়, প্রস্রাব হলদে হয়ে যায় এমনকি গায়ের ঘামও হলদে রং ধারণ করে।

রোগ নিরাময়ের উপায়—কামলারোগীদের যতদিন পর্যন্ত চোখ ও প্রস্রাব হলদে থাকবে এবং যকৃৎ স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ফিরে না পাবে, ততদিন আহার ও পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে—পায়খানা ও প্রস্রাব যাতে পরিষ্কার থাকে সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। সকালে উঠেই খালিপেটে এক থেকে দেড় চামচ কাঁচা হলুদের রস আদারস সহ খেতে হবে এবং তার আধঘণ্টা পরে কালমেঘ পাতার রস দু' চামচ পরিমাণ আধকাপ পরিষ্কার চুনের জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে। এক ঘণ্টা পরে দু' চামচ পাথরকুচি পাতার রস একটু লবণ ও মধুসহ খেতে হবে। সন্ধ্যায় একইভাবে কালমেঘের রস ও পাথরকুচির রস খেতে হবে। কাঁচা হলুদের রস প্রথম সপ্তাহে প্রতিদিন খেতে হবে—দ্বিতীয় সপ্তাহে একদিন ছাড়া এবং তৃতীয় সপ্তাহে দু'দিন ছাড়া খেতে হবে। রোগ প্রশমিত হলে সপ্তাহে দুদিন খেলে চলবে। আহার সহজপাচ্য হওয়া উচিত। এসময়ে আখের রস, মিছরীর জল, গ্লুকোজ জল দিনে বেশ কয়েকবার খাওয়া উচিত। কচি শাঁসযুক্ত ডাবের জল বিশেষ উপকারী। কামলারোগীদের চর্বিজাতীয় কোন খাবার, ঘি, মাখন, ছানার তৈরী কোন খাবার, মাংস, ডিম এবং অধিক মশলাযুক্ত খাবার একেবারে নিষিদ্ধ।

এই রোগীদের পক্ষে ওল, মানকচু, পেঁপে, কাঁচকলা, কমলালেবুর রস, আনারস, ঘোল, ছানার জল প্রভৃতি বিশেষভাবে উপকারী। রোগ প্রশমিত হলে পাতলা দুধ, তেলবিহীন মাছের শুক্ত বা ঝোল, সরু চালের ভাত খাওয়া যেতে পারে। এমন সব খাবার খেতে হবে যা সহজে হজম হয়। তাছাড়া কোন সময় ভরপেটে খাওয়া উচিত নয়। দিনে প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া উচিত।

যকৃৎ আকারে বড় থাকলে এবং রোগ প্রবল হলে কোন প্রকার ব্যায়াম বা আসনাদি করা উচিত নয়। শুধু সকালে ও বিকালে কিছুক্ষণ খোলা জায়গায় পায়চারী করা যেতে পারে। রোগ প্রশমিত হলে সকালে প্রাতঃক্রিয়াদির পর সাধ্যানুযায়ী বিপরীতকরণী মুদ্রা, অর্ধ-কূর্মাসন, পশ্চিমোত্থানাসন, জানুশিরাসন এবং কিছুদিন পরে ঐ সঙ্গে প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হবে।

সন্ধ্যায় মৎস্যাসন, সর্বাংগাসন, জানুশিরাসন এবং যতটুকু সম্ভব ধনুরাসন ও ভ্রমণ-প্রাণায়াম আর রাত্রে আহারের পর ১০ মিনিট বজ্রাসন করা উচিত।

শিশুদের কামলারোগ হলে উপরে উল্লেখিত ঔষধগুলি পরিমাণমত দিতে হবে। প্রথম থেকে যত্ন না নিলে শিশুর প্রাণরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

১৪। মাথাধরা রোগ ও সাইনুসাইটিস

মাথাধরা বা শিরঃপীড়া যদিও প্রাণসংশয়কারী রোগ নয়, তবু এ রোগ রোগীকে সম্পূর্ণ অকর্মণ্য করে দিতে পারে। তাছাড়া, এ রোগ কোন কঠিন প্রাণসংশয়কারী রোগের পূর্ব সংকেত।

মাথাধরা রোগ নানা কারণে হতে পারে। তবে এখানে যে-যে প্রকার মাথাধরা সাধারণতঃ দেখা যায়, সেগুলি নিয়ে আলোচনা করছি।

(ক) কফজ মাথাধরা

রোগের লক্ষণ—এ রোগে মাথা ভার হয়—চোখ, মুখ, নাক দিয়ে গরম হাওয়া বের হতে থাকে, মুখে দুর্গন্ধ হয়, মাথা নীচু করলে খুব ব্যথা বোধ হয়।

রোগের কারণ—সর্দি হলে তা ঠিকমত নিঃসৃত না হলে এবং গাঢ় ও দূষিত হয়ে যখন কপালে ও ভ্রূর মধ্যে দেহস্থ বায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায়, তখন এই কফজ মাথাধরা রোগ দেখা দেয়।

রোগ নিরাময়ের উপায়—সকাল-সন্ধ্যায় নাসাপান অর্থাৎ নাক দিয়ে জল টেনে নিয়ে মুখ দিয়ে ফেলে দিতে হবে। সকাল-সন্ধ্যায় কপালভাতি করাও দরকার। স্নানের সময় সাবান দিয়ে ভাল করে মাথা ঘষে মুছে নিয়ে তারপর মাথায় ভালভাবে তেল মেখে আবার জল দিতে হবে। অথবা স্নানের সময় ঈষৎ গরম ও ঠাণ্ডা জল মাথায় দিতে হবে। অর্থাৎ মাথায় একবার গরম জল ও একবার ঠাণ্ডা জল দিতে হবে। দিনে ৪।৫ বার কপালে গরম সেঁক্ অথবা গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে সেঁক্ দেওয়া দরকার। অল্প তালমিছরি, একটি তেজপাতা ও একটি লবঙ্গ এক-কাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে তা গরম ভাতের হাঁড়ির ভিতর কিছুক্ষণ রেখে, ঐ অবস্থায় পান করলে (সম্ভব না হলে গরম করে খেলে) বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

তাছাড়া, নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যায় বিপরীতকরণী মুদ্রা, মৎস্যাসন, সর্বাংগাসন, পদ-হস্তাসন, শীর্ষাসন এবং তিরিশ মিনিট ভ্রমণ-প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হবে।

(খ) পিত্তজ মাথাধরা

রোগের লক্ষণ—এই রোগে কপালে অসহ্য যন্ত্রণা হয় এবং চোখ, মুখ, নাক জ্বালা করে। রাত্রে রোগ প্রশমিত হয়।

রোগের কারণ—রক্ত পিত্তবিষে জর্জরিত হয়ে মাথায় উঠলে, এ রোগ দেখা দেয়। যকৃৎ যখন ঠিকমত কাজ করতে পারে না, তখন পিত্তজ মাথাধরা রোগ হয়।

রোগ নিরাময়ের উপায়—অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি রোগের জন্য যকৃতের কাজের ব্যাঘাত ঘটে। অতএব, আহার ও পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ হতে হবে।

সকালে উঠেই মুখ ধুয়ে খালিপেটে দু' চামচ কাঁচা-হলুদের রস একটু আদার রসসহ খেতে হবে। তারপর একগ্লাস ঈষৎ গরম জল খেয়ে পবন-মুক্তাসন, বিপরীতকরণী মুদ্রা, যোগমুদ্রা, পদ-হস্তাসন ও অর্ধ-চন্দ্রাসন এবং বিকালে খোলা জায়গায় আধঘণ্টা ভ্রমণ-প্রাণায়াম করতে হবে। সকালে খালিপেটে এককাপ ত্রিফলার জল খেলে এ রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। তবে এমন কিছু খাওয়া উচিৎ নয়, যাতে কোষ্ঠকাঠিন্য ও বদহজম হতে পারে।

(গ) রক্তজ মাথাধরা

রোগের লক্ষণ—রক্তজ মাথাধরা রোগ হলে মাঝে মাঝে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হয়। মনে হয়, মাথার মধ্যে পোকা যেন কুরে কুরে খাচ্ছে। এ যন্ত্রণা দিনে একাধিকবার হতে পারে।

রোগের কারণ—অজীর্ণ ও অম্লবিষের জন্য দেহের অধিক রক্ত যখন পাকস্থলী এবং ঐ অঞ্চলে কাজে ব্যস্ত থাকে—মস্তিষ্কে বিষাক্ত রক্ত প্লাবিত হয় অথবা বিশুদ্ধ রক্তের অভাব ঘটে, তখনই রক্তজ শিরঃপীড়া আরম্ভ হয়।

রোগ নিরাময়ের উপায়—অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধতা রোগের বিধিনিষেধ মেনে চললে এ রোগ থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়।

(ঘ) ক্ষয়জ মাথাধরা

রোগের লক্ষণ—ক্ষয়জ শিরঃপীড়ায় রোগীদের সবসময় মাথা ঝিম্ মেরে থাকে, মাঝে মাঝে যন্ত্রণা হয়, দেহ সবসময় অবসন্ন বোধ হয়—কিছু খেতে ইচ্ছা করে না ইত্যাদি।

রোগের কারণ—অতিরিক্ত বীর্যক্ষয়, অস্বাভাবিক জীবনযাপন, স্ত্রী-রোগ এ রোগের কারণ। রক্তের সারভাগ এতে কমে যায়।

রোগ নিরাময়ের উপায়—স্বাভাবিক জীবনযাপন, পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য খাদ্য গ্রহণ, উপযুক্ত বিশ্রাম এবং তৎসহ সর্বাংগাসন, মৎস্যাসন, উষ্ট্রাসন, ধনুরাসন ও গোমুখাসন করা উচিত। রাত্রে ঘুমোবার পূর্বে দশ মিনিট বজ্রাসন করতে হবে।

(ঙ) আধ-কপালে মাথাধরা

রোগের লক্ষণ—এ রোগে কপালে একাংশে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা আরম্ভ হয়—সূর্য যত উপরে ওঠে, ব্যথাও তত বাড়তে থাকে। দুপুরে সূর্যের তেজ যত কমতে থাকে, ব্যথাও তত কমে যায়।

রোগের কারণ—সর্দি শুকিয়ে গেলে এ রোগ হয়।

রোগ নিরাময়ের উপায়—কফজ শিরঃপীড়ার বিধিনিষেধ মেনে চললে, এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

(চ) ক্রিমিজ মাথাধরা

রোগের লক্ষণ—দিন-রাত যে-কোন সময় মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হয়।

রোগের কারণ—অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধতা এ রোগের মূল কারণ। যকৃতের ঠিকমত কাজ না করার জন্য, যখন দেহের রক্ত রোগজীবাণুতে ভর্তি হয়ে যায়—মস্তিষ্ক যখন বিশুদ্ধ রক্ত পায় না, তখনই এ রোগ দেখা দেয়।

রোগ নিরাময়ের উপায়—পিত্তজ ও রক্তজ শিরঃপীড়ার বিধিনিষেধগুলি এ রোগের ক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে।

(ছ) ধাতজ মাথাধরা

রোগের লক্ষণ—যে-কোন সময় মাথার যন্ত্রণা হতে পারে, তবে রাত্রে এই যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়।

রোগের কারণ—কোষ্ঠকাঠিন্য বা কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য যখন দেহস্থ বায়ু বস্তি-প্রদেশে ও তলপেটে ঠিকমত চলাফেরা ক'রে দেহবিষ দেহের বাইরে পাঠাতে পারে না, দেহের সমস্ত বায়ু যখন বিষাক্ত হয়ে যায় এবং মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, তখনই এ রোগ দেখা দেয়।

রোগ নিরাময়ের উপায়—অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধতা রোগের বিধিনিষেধ মেনে চললে এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

মাথাধরা বা শিরঃপীড়া নিজে কোন রোগ নয়, এ রোগ শুধু অন্য রোগের বহিঃপ্রকাশ। তাই এ রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে, রোগের মূল কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই কারণ দূর করার জন্য সচেষ্ট হ'তে হবে।

সাইনুসাইটিস

আমাদের মুখমণ্ডলে চারটি জায়গায় বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা বা গহ্বর রয়েছে—কপালে হাড়ের মধ্যে, নাকের শেষ প্রান্তে, নাকের দু' পাশে এবং চোয়ালে। এ জায়গা-গুলোকে ডাক্তারী-ভাষায় বলা হয় সাইনাস। এই ফাঁকা জায়গাগুলোর প্রয়োজন আছে—এর জন্য মুখের গড়ন ও সৌন্দর্য অনেকটা নির্ভর করে এবং বাইরের কোন আঘাত সরাসরি মগজে লাগতে পারে না। সাইনুসাইটিস অ্যাকিউট হতে পারে আবার অবহেলা করলে ক্রনিক হয়ে যেতে পারে। রোগী খুব বেশীদিন ভুগলে এর থেকে চোখ ও কানের ক্ষতি হতে পারে এমনকি যক্ষ্মা, প্লুরিসি, ব্রঙ্কাইটিস, সাইনাস-থ্রম্বোসিস পর্যন্ত হতে পারে।

রোগের কারণ—সাইনাসে জমা সর্দিতে জীবাণু-সংক্রমণের ফলে প্রদাহ।

রোগের লক্ষণ—সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে যায়, সাইনাসে সর্দি জমতে থাকে। মাথা সব সময় ভারী বোধ হয়, মাথা নিচু করলে মাথায় যন্ত্রণা বেড়ে যায়, কানে তালা লাগা ভাব আসে, খাবারে কোন স্বাদ থাকে না, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হবে এবং শব্দ হতে পারে, দু-তিন দিন পরে সর্দিতে গন্ধ ও হলদে রং এসে যায়। অ্যাকিউট সাইনুসাইটিসে সকালের দিকে মাথার যন্ত্রণা বেড়ে যায় ও সন্ধ্যার দিকে কমে যায় আর ক্রণিক সাইনুসাইটিসে ভোরবেলায় মাথার যন্ত্রণা খুব বেড়ে যায় আর বেলার দিকে কমে যায়—অবশ্য দুটি ক্ষেত্রেই যদি বমি হয়ে যায় তবে যন্ত্রণা সাময়িকভাবে কমে যায়। অ্যাকিউট সাইনুসাইটিসে যন্ত্রণা খুব তীব্র হতে পারে।

নিরাময়ের উপায়—প্রথম দু-তিন দিন দিনে অন্ততঃ ৩/৪ বার নাসাপান (শীত-কালে ঈষদোষ্ণ জলে), সকালে ও বিকালে কপাল ভাতি, দিনে ৩/৪ বার তালমিছরি, ২টি তেজপাতা ও ৪টি কালো গোলমরিচ জলে ভাল করে সিদ্ধ করে ৩/৪ বার খেতে হবে। ২/৩ দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম—খোলা জায়গায় বেড়ানো যেতে পারে, সর্দি ও মাথার যন্ত্রণা কমলে যোগ-ব্যায়াম (২/৩টি সহজ প্রাণায়াম সহ) আরম্ভ করা যেতে পারে। দু-একটি আসন এমন হওয়া দরকার যাতে মাথায় প্রচুর রক্ত চলাচল করতে পারে যেমন—পদ-হস্তাসন, কর্ণ-পিঠাসন, অর্ধ-চক্রাসন, অর্ধ-চন্দ্রাসন, সর্বাংগাসন ইত্যাদি। নাসাপান অভ্যাস রাখলে আবার সাইনুসাইটিস্ হতে পারে না কারণ নাসাপানে সাইনাসে সর্দি জমতে পারে না।

১৫। হাঁপানি বা অ্যাজমা

হাঁপানি রোগ জীবনসংশয়কারী না হলেও এ রোগ কিন্তু তিলে তিলে মানুষের জীবনীশক্তিকে নষ্ট করে দেয়—জীবন দুর্বিষহ করে তোলে।

রোগের লক্ষণ—এ রোগে আক্রান্ত হ'লে রোগীর শ্বাস নিতে ও শ্বাস ছাড়তে (বিশেষভাবে শ্বাস ছাড়তে) কষ্ট হয়, হাঁপ ধরে গলায় একটা সাঁ সাঁ শব্দ হয়। এ রোগ যে-কোন সময় রোগীকে আক্রমণ করতে পারে। তবে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শেষ-রাত্রে এ রোগাক্রমণ ঘটে এবং ঠাণ্ডার দিনে এ রোগ বৃদ্ধি পায়।

রোগের কারণ—কোন কারণে শ্বাসনালীতে শ্লেষা জমলে বা স্নায়ুর দুর্বলতার জন্য শ্বাসনালী ঠিকমত সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হতে না পারলে, হাঁপানি রোগ দেখা দেয়। দীর্ঘদিন দেহে বিশুদ্ধ রক্তের অভাব ঘটলে, ফুস্‌ফুস্ ও স্নায়ুজাল স্বাভাবিক-ভাবে কাজ করতে পারে না। ফলে, শ্বাসনালীও আর প্রয়োজনমত প্রসারিত হতে পারে না। ফলে হাঁপানি রোগ দেখা দেয়। এ রোগ বংশানুক্রমেও হতে দেখা যায়।

মা অথবা বাবার যদি হাঁপানি বা অ্যাজমা থাকে আর যদি দু'জনেরই থাকে তবে সন্তানের এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। জন্ম থেকে বা আঘাতজনিত কারণে দুই নাসারন্ধ্রের মধ্যবর্তী দেওয়াল যদি বেঁকে যায়, নাকের গভীরে বা নাকের দু'-পাশের সাইনাসে যদি দীর্ঘকাল সর্দি জমে থাকে তবে হাঁপানি বা অ্যাজমা আসতে পারে। তাছাড়া অ্যাকিউট বা হঠাৎ হাঁপানি বা অ্যাজমা নানা কারণে হতে পারে। বিশেষভাবে কম বয়সের ছেলে-মেয়েদের যেমন কোন কিছুর জন্য এ্যালার্জি। এই এ্যালার্জি নানা জিনিষ থেকে আসতে পারে, যেমন কোন কিছুর পরাগ বা রেণু, পতঙ্গ, ছত্রাক, ওষুধের প্রতিক্রিয়া, রাসায়নিক-পদার্থ, খাদ্য যেমন ডিম, চিংড়ী মাছ, কাঁকড়া, বেগুন প্রভৃতি। ধোঁয়া বা উত্তেজনা সৃষ্টিকারী গ্যাস, অতিরিক্ত ধূমপান, হঠাৎ আবহাওয়ার গুরুতর তারতম্য, ক্ষমতার বাইরে অতিরিক্ত পরিশ্রম, শ্বাসনালীতে জীবাণুর আক্রমণ (ব্রংকিয়াল অ্যাজমা) অথবা ফুস্‌ফুসে জীবাণুর আক্রমণ (কার্ডিয়াক অ্যাজমা) ইত্যাদি।

রোগ নিরাময়ের উপায়—হাঁপানি বা অ্যাজমা যদি জন্মসূত্রে না হয় তবে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলেই প্রথমে জানতে হবে, রোগের কারণ কি—শ্লেষ্মা, না ফুস্‌ফুস্‌, না স্নায়ুর দুর্বলতা? যদি পুরনো শ্লেষ্মা এ রোগের কারণ হয়, তবে রোজ সকালে খালিপেটে এক তোলা চ্যবনপ্রাশ এক চামচ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে এক গ্লাস পাতলা গরম দুধ খেতে হবে। ১ তোলা তালমিছরি, একটি তেজপাতা ও একটি লবঙ্গ দুকাপ জলে দিয়ে গরম ভাতের বাষ্পে গরম করে দু'বেলা খেলে সমস্ত পুরনো সর্দি উঠে আসবে। হাঁপানির টান বেশী থাকলে, একদিন উপবাস করলে টান প্রশমিত হবে। উপবাসের সময় ঠান্ডা জলের পরিবর্তে ঈষদোষ্ণ গরম জলে লেবুর রস মিশিয়ে অল্প অল্প করে পান করতে হবে।

যদি ফুস্‌ফুস্‌ ও তৎসংলগ্ন স্নায়ুজালের দুর্বলতার জন্য হাঁপানি রোগ হয়, তবে এই দুর্বলতার কারণগুলি দূর করতে হবে। ফুস্‌ফুস্‌ ও স্নায়ুজাল অনেক কারণে দুর্বল হতে পারে। আমরা যে-খাদ্য খাই, তা যদি ঠিকমত হজম না হয় বা ঠিকমত মলমূত্র নিঃসৃত না হয়, তবে আমাদের দেহে বিষাক্ত গ্যাস ও বিষাক্ত এ্যাসিড প্রভৃতি জমে রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে, দেহের অভ্যন্তরস্থ দেহযন্ত্রকে অকেজো করে দিতে আরম্ভ করে। ফলে, ফুস্‌ফুস্‌ এবং স্নায়ুজালও ঠিকমত কাজ করতে পারে না। আর ফুস্‌ফুস্‌ ঠিকমত কাজ না করলে প্রশ্বাসের সঙ্গে দেহস্থ অংগার অম্লগ্যাসও বের হয়ে যেতে পারে না—দেহযন্ত্র আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন দেহে শুধু হাঁপানি রোগ থাকে না—আরও মারাত্মক রোগ আক্রমণ করে।

তাই হাঁপানি-রোগীদের আহার ও পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এমন কোন খাবার খাওয়া উচিত হবে না, যাতে হজমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত আমিষজাতীয়, শর্করাজাতীয় ও চর্বিজাতীয় খাবার না খাওয়াই উচিত। ক্ষারধর্মী খাবার বেশী খাওয়া উচিত। কোন সময় ভরপেট খাওয়া উচিত নয়। রাত্রে ৯টা নাগাদ হালকা কিছু খাওয়া উচিত। কোষ্ঠবদ্ধতা যাতে না আসে, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

তাছাড়া, হাঁপানি-রোগীদের প্রত্যহ সকালে মুখ ধোবার পর এক গ্লাস ঈষদোষ্ণ জল পান করে পবন-মুক্তাসন, বিপরীতকরণী মুদ্রা, যোগমুদ্রা ও পদ-হস্তাসন অভ্যাস করতে হবে। তারপর কিছু খেয়ে আধঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে মৎস্যাসন, সর্বাংগাসন, উষ্ট্রা-সন ও অর্ধচন্দ্রাসন অভ্যাস করা উচিত। রোদ বাড়লে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, পদ্মাসনে বসে অথবা শিরদাঁড়া সোজা করে বসে হাঁ করে যতটা সম্ভব বায়ু আস্তে আস্তে ফুস্-

ফুসে নিয়ে ২ সেঃ থেকে ৫ সেঃ দম বন্ধ করে থাকতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে নাক দিয়ে বায়ু ছাড়তে হবে। এভাবে দশ থেকে পনর মিনিট করতে হবে। বিকেলে রোদের তেজ থাকতে থাকতে একইভাবে প্রক্রিয়াটি দশ-পনর মিনিট অভ্যাস করতে হবে। এই শ্বাস-ব্যায়ামটি হাঁপানি-রোগীদের কোন সময়ই ঠাণ্ডা বাতাসে করা উচিত নয়। বয়স বা অন্য কারণে যদি কেউ আসন করতে না পারেন, তবে খোলা জায়গায় বেশ কিছু সময় পায়চারী করলেও উপকার পেতে পারেন। হাঁপানির টান যদি খুব বেশী থাকে, তবে মাষকলাই ও সরষের তেল গরম করে রাত্রে ঘুমোবার পূর্বে গলায় মালিশ করে গরম গেঞ্জি বা জামা গায়ে দিলে বেশ উপকার পাওয়া যাবে। হাঁপানি-রোগীদের কোন সময় বেশী ঠাণ্ডা জলে স্নান করা ঠিক নয়—রোদে জল রেখে সেই জলে স্নান করলে খুব ভাল উপকার পাওয়া যায়।

এখানে যে কটি আসন, ব্যায়াম, পথ্য ও নিয়ম দেওয়া হলো সেগুলো পালন করলেই এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। রোগ যদি জীবাণু গঠিত হয় তবে ডাক্তারের পরামর্শমত ওষুধ খেয়ে রোগ-জীবাণু ধ্বংস করতেই হবে, নাসারন্ধ্রের দেওয়ালে যদি কোন বাধা থাকে ডাক্তার দ্বারা ঠিক করে নিতে হবে। রোগীর যদি কোন কিছুতে এ্যালার্জি থাকে তবে কিসে? জিনিষটা বের করে সেটা পরিহার করে চলতে হবে—না হলে কোন যোগ-ব্যায়াম এবং আনুষঙ্গিকে কোন কাজ হবে না।

১৬। ঋতু রোগ

আমাদের মত গরম দেশে সাধারণতঃ তের-চোদ্দ বছর বয়সের সুস্থ-সবল মেয়েদের প্রথম ঋতু প্রকাশ পায় এবং এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে ঋতু প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর প্রতি আটাশ দিন অন্তর ঋতুস্রাব হয়। তবে সন্তান ধারণকালে স্রাব বন্ধ থাকে। নারী-দেহে এইভাবে প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ বছর পর্যন্ত ঋতু বর্তমান থাকে। তবে স্বাস্থ্যানু-যায়ী এই বয়স-সীমা কমবেশী হতে পারে।

ঋতু রোগ

ঋতু রোগ বেশ কয়েক রকম হতে পারে—যেমন ঋতুকালে বিলম্ব, ঋতু চলাকালে বিলম্ব, অতিরজঃ, স্বল্পরজঃ, রজঃরোধ, অনিয়মিত ঋতু, বাধক বেদনা ইত্যাদি। রোগের কারণ ও লক্ষণ বিভিন্ন হলেও ঋতুঘটিত যেকোন রোগকে ঋতু রোগ বলা হয়। এবার রোগের কারণ, লক্ষণাদি ও প্রতিকার নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্।

ঋতুকালে বিলম্ব—গ্রীষ্ম প্রধান দেশে সাধারণত ১২/১৩ বছরের সুস্থ মেয়েদের দেহে ইস্ট্রোজেন হর্মোনের প্রভাবে যৌবন আগমনের সূচনা হয় এবং ক্রমে তা পরি-পূর্ণতা লাভ করে—কিন্তু নানা কারণে এই যৌবনের আগমন বিলম্ব ঘটতে পারে যেমন ঃ—
(১) স্ত্রী হরমোনের অভাব। এই হরমোন নিয়ন্ত্রিত হয় পিটুইটারি ও এড্রেন্যাল গ্রন্থির দ্বারা—যদি মেয়েদের ডিম্বাশয়ে এই হরমোন ঠিকমত না আসে গ্রন্থিদ্বয়ের যে কোন একটি ঠিকমত কাজ না করে তবে ডিম্বোকোষ বা ডিম্বো ঠিক গঠিত হতে পারে না—ফলে বয়স হলেও মেয়েদের দেহে যৌবনের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

(২) পুষ্টির অভাব ও রক্তশূন্যতা।

(৩) জন্মগত দোষ।

(৪) প্রথম ডিম্বো গঠনের সময় যদি কোন অঘটন ঘটে।

লক্ষণ—দেহে কৈশোর ভাব না এসে বাল্য ভাবই থেকে যায়, দেহ কৃশ ও রক্তশূন্য,

হয়ে যায়, মেজাজ খিট্‌খিটে হয়, বিনা কারণে রোগী রেগে যায়, মাঝে মাঝে মাথা ভারী বোধ হয় ও মাথায় যন্ত্রণা হয়। হীনমন্যতা ভাব আসে ; সব সময় মনে হয় অন্যরা তাকে নিয়ে আলোচনা করছে ইত্যাদি।

নিরাময়ের উপায়—হজমশক্তি অনুযায়ী পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। মাছের ঝোল, মাংসের সুপ, মেটে, ডিম সিদ্ধ, বাদাম, কাজুবাদাম, ভিজানো অঙ্কুর গজানো ছোলা, বীট, গাজর, টমাটো, কপি, ডাঁটা, সজিনাডাঁটা ও ফুল, ঢ্যাঁড়স, সিম, বরবটি, চালকুমড়া, উচ্ছে, করলা, ছানা, দই প্রভৃতি বিশেষ উপকারী—সঙ্গে সকালে বা সন্ধ্যায় কয়েকটি খালি হাতে ব্যায়াম ও যোগ-ব্যায়াম। ভ্রমণ প্রাণায়াম, সহজ প্রাণায়াম, পদ-হস্তাসন, জানুশিরাসন, পশ্চিমোত্থানাসন, অর্ধ-চক্রাসন, চক্রাসন, ধনুরাসন, উষ্ট্রাসন, অর্ধ-কূর্মাসন প্রভৃতি। এক দিনে ৪/৫টি আসন অভ্যাস করলেই যথেষ্ট, দরকার হলে ডাক্তারের পরামর্শ মত হর্মোন চিকিৎসা অবশ্যই নিতে হবে।

ঋতু চলাকালে বিলম্ব—ঋতু একবার প্রতিষ্ঠিত হলে তা ঠিক ২৮ দিন অন্তর অন্তর আশা করা যেতে পারে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ৩০/৩৫ বা ৪০ দিনের পর হতে দেখা যায়।

লক্ষণ—এ রোগের বিশেষ লক্ষণ ঋতু দেরীতে আরম্ভ হলেও স্রাব পরিমাণে বেশী হয় বা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। স্তনে ও তলপেটে ব্যথা হয়, ঊরু ভারী হয়। দেহ অবসন্ন বোধ হয়, সব সময় ক্লান্ত ভাব থাকে, শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। দেহ কৃশ বা স্থূল হতে পারে। আনুষঙ্গিক আরো উপসর্গ আসতে পারে যেমন, মাথাধরা বা ঘোরা, খাবারে অরুচি, পেটের গোলমাল, গা ম্যাজম্যাজ, বমি ভাব, রক্তশূন্যতা ইত্যাদি।

কারণ ও নিরাময়—পূর্বানুরূপ।

অতিরজঃ ও স্বল্পরজঃ—দু'টিই জটিল রোগ এবং মারাত্মক হতে পারে।

রোগের কারণ—প্রথম ঋতুকালে বিলম্ব, ডিম্বোকোষ, জরায়ু বা যোনীর দেওয়ালে টিউমার, ক্যানসার বা ঐ জাতীয় কোন রোগ, ডিম্বোনালী বা কোষে প্রদাহ, হর্মোন নিঃসরণে বাধা, অত্যধিক মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তা ইত্যাদি।

রোগের লক্ষণ—স্বাভাবিক থেকে অধিক বা অল্প স্রাব, গা ম্যাজম্যাজ করা, অবসন্নতা ও অলসতা, তলপেটে, কোমরে ও পিঠে ব্যথা, খাবারে অরুচি, পেটের গোলমাল, খিট্‌খিটে মেজাজ, বিনা কারণে রাগ, শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে, দৃষ্টিশক্তি কমতে পারে, কানে কম শুনতে পারে, হাত-পা ঠাণ্ডা হতে পারে, শীত শীত লাগতে পারে, নিঃসৃত রক্তের মধ্যে কালচে দলা পাকানো রক্ত থাকে। রোগী কখনো স্থূল কখনো কৃশ হয়ে যায় এবং সবচেয়ে কুলক্ষণ রোগী রুগ্ন ও দুর্বল হয়ে আসতে থাকে কারণ অতিরজঃতে দেহ রক্তশূন্য হয়ে পড়ে এবং স্বল্পরজঃতে ঐ রক্ত পচে দেহের সমস্ত রক্তকে বিষাক্ত করে দেয়। সময়ে রোগমুক্তি না হলে ক্রনিক হিস্টিরিয়া হতে পারে এবং রোগী দুর্বল থাকায় যে কোন রকম দুর্ঘটনা হতে পারে।

নিরাময়—অতিরজঃ ও স্বল্পরজঃ রোগে কালবিলম্ব না করে পূর্বানুরূপ অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্য প্রয়োজন। টিউমার, ক্যানসার বা ঐ জাতীয় কোন জটিলতা না থাকলে পূর্বানুরূপ যোগ-ব্যায়ামে ও খাদ্য নীতি মেনে চললে আপনা থেকে ঠিক হয়ে যায়। ব্যথা অসহ্য হলে গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে ও হট্ ব্যাগ দিয়ে সেঁক দিলে সাময়িকভাবে ব্যথা কমে যায়, স্রাব খুব বেশী হতে থাকলে তলপেটে মাঝে মাঝে বরফ দিতে হবে।

অলিগোমেনোরিয়া (থেমে থেমে ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব)—যাদের ঋতুকালে স্বল্প-

স্রাব হয় এবং ব্যথা থাকে তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অলিগোমেনোরিয়া থাকে তবে অনেক ক্ষেত্রে ব্যথা নাও থাকতে পারে।

রোগের লক্ষণ—ঋতু যথা সময়ে হয়তো শুরু হয় তবে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে আসে এবং বেশ কয়েকদিন চলে। ঋতুকাল ৮/১০ দিনও হতে পারে, নানা কারণে এ রোগ হতে পারে। অনেক সময় দীর্ঘদিন চললেও ঋতু পরিষ্কার হয় না, তলপেটে ব্যথা নাও থাকতে পারে, রক্ত শূন্যতা দেখা দিতে পারে, রোগী কৃশ ও দুর্বল হতে পারে, মাথা ঝিমঝিম করে, সব সময় ক্লান্তি বোধ হয়, খাবারে অরুচি, খিটখিটে মেজাজ, সব কিছু অসহ্য লাগে, একা থাকতে ভালো লাগে ইত্যাদি। গর্ভ অবস্থায় এ রোগ দেখা দিতে পারে।

রোগের কারণ—হর্মোনের অভাব বা নিঃসরণে বিশৃঙ্খলা, জরায়ু বা ডিম্বোকোষে অন্য কোন কারণে প্রদাহ, সিফিলিস ও গনোরিয়া জাতীয় রোগের আক্রমণ, জরায়ু বা ডিম্বোকোষের জন্মগত দোষত্রুটি, অপুষ্টি ও দেহে রক্তশূন্যতা প্রভৃতি।

নিরাময়—বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অবশ্য প্রয়োজন। কারণটি জেনে সেইমত ব্যবস্থা নিতে হবে। কোন জটিলতা না থাকলে খাদ্য নীতি মেনে চললে এবং কিছু নির্দিষ্ট যোগ-ব্যায়ামে ভালো হয়ে যায়। এমন ২/৩টি আসন করা দরকার যাতে পেটে ও তলপেটে চাপ লাগে যেমন পশ্চিমোত্থানাসন, পদহস্তাসন, অর্ধ-কূর্মাসন, অর্ধ-চক্রাসন, অর্ধ-চন্দ্রাসন প্রভৃতি।

মেট্রোরেজিয়া—(জরায়ু থেকে অসময়ে বেশী রক্তপাত)।

রোগের লক্ষণ—ঋতুচক্রের দুই ঋতুর মাঝে হঠাৎ রক্তস্রাব শুরু হয় এবং ২/১ দিন প্রচুর রক্তপাত হয়।

আনুষঙ্গিক লক্ষণ—বেশী রক্তপাতে রোগী রক্তশূন্য ও দুর্বল হয়ে পড়ে, বুক ধড়ফড় করে, মাথা ব্যথা করে ও ঘোরে, রক্ত চাপ কমে যায়, দেহ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, পা ফুলতে পারে। রোগী কৃশ বা স্থূলাঙ্গী হয়ে যেতে পারে, পেটে নানা ধরনের গোলমাল দেখা দেয়, কাজে অনিচ্ছা, সব বিষয়ে প্রবল বিরক্তি, খিটখিটে মেজাজ প্রভৃতি।

রোগের কারণ—দেখা যাক কি কি কারণে এ রোগ আসতে পারে—স্ত্রী হর্মোন নিঃসরণে বিশৃঙ্খলা, বিশেষ করে যদি বেশী নিঃসরণ হয়, কোনভাবে তলপেটে খুব জোর চাপ, ধাক্কা বা আঘাত লাগা, যদি পূর্ব প্রসবের সময় গর্ভে ফুলের টুকরো থেকে যায়, যদি জরায়ু বা ডিম্বোকোষ কোন কারণে রোগগ্রস্ত বা দুর্বল হয়ে যায় ইত্যাদি। নানা কারণে এরোগ হতে পারে। কারণ যাই হোক না কেন রোগটি যে মারাত্মক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কারণ অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে রক্তের চাপ কমে গিয়ে যে কোন মুহূর্তে অঘটন ঘটাতে পারে।

নিরাময়—রোগের কারণ অবশ্য জানতে হবে এবং সেই মত চিকিৎসা করতে হবে তারপর পূর্ব আলোচিত কিছু যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস রাখলে আর স্বাস্থ্য নীতি মেনে চললে শরীর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

বাধক-বেদনা

রোগের লক্ষণ—ঋতু প্রকাশের কয়েকদিন অথবা কয়েক ঘণ্টা পূর্ব থেকে তলপেটে অসহ্য ব্যথা আরম্ভ হয়। ব্যথা মাঝে মাঝে কম হয় আবার বেড়ে যায়। অনেকের

এ ব্যথা উরু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ঋতুকালে প্রথম বা দ্বিতীয় দিনে উপযুক্ত পরিমাণে রক্তস্রাবের পর এ ব্যথার উপশম হয়।

রোগের কারণ—শ্রমবিমুখতা, অতৃপ্ত কামনা-বাসনা, অসংযমী জীবন-যাপন, আলো-বাতাস বর্জিত গৃহবন্দী জীবন, সুষম খাদ্যের অভাব প্রভৃতি এ রোগের কারণ। এইসব কারণে রোগিণীদের প্রায় কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, মাথাধরা প্রভৃতি রোগে ভুগতে দেখা যায় এবং দীর্ঘদিন পরে রোগিণীর উদর ও বস্তিপ্রদেশের দেহযন্ত্রগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। জরায়ু, ডিম্বকোষ, ডিম্ববাহীনালী প্রভৃতি রুগ্ন হয়ে পড়ে। রুগ্ন জরায়ু, ঝিল্লী ও ডিম্ববাহীনালী যখন রক্তের চাপ সহ্য করতে পারে না, তখনই এই বাধক-বেদনা আরম্ভ হয়।

রোগ নিরাময়ের উপায়—অন্যান্য ঋতুরোগের অনুরূপ—তবে অত্যধিক ব্যথা আরম্ভ হলে, নরম তোয়ালে গরম জলে ভিজিয়ে নিংড়ে নিয়ে তলপেটে দিলে কিংবা হট্-ব্যাগে গরম জল রেখে অথবা বোতলে গরম জল ভরে তলপেটে রাখলে আরাম পাওয়া যায়। এ সময় ঠাণ্ডা জল না খেয়ে, ঈষৎ উষ্ণ জলে পাতি বা কাগজি লেবুর রস লবণ মিশিয়ে খেলে বিশেষ উপকার হয়। সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন কোষ্ঠবদ্ধতা না আসে। বাধক-বেদনার রোগিণীদের পক্ষে পাকা রসালো ফল বিশেষ উপকারী। যথাসম্ভব অতৃপ্ত কামনা-বাসনা মন থেকে দূর করে ফেলা কর্তব্য।

অনিয়মিত ঋতু—স্রাব সাধারণতঃ ২৮ দিন অন্তর হয় এবং ৪/৫ দিন থাকে। নানা কারণে এই স্রাব এগিয়ে আসতে পারে বা পিছিয়ে যেতে পারে।

কারণ—যোনাঙ্গের গঠনের গোলমাল, অনিয়মিত হর্মোন নিঃসরণ, দেহে পুষ্টির অভাব, ডিম্বোকোষ বা জরায়ুর রোগ বা যে কোন ধরনের গোলমাল এবং বিশেষ কারণে রক্তশূন্যতা।

রোগের লক্ষণ—কখনো ৫০/৬০ দিন স্রাব হয় না আবার হয়তো ১৫ দিন পরে হতে পারে, ১৫/২০ দিন বন্ধ থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব হতে পারে আবার হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, কখনো রক্তের রং কালচে থাকে—রক্তে কালচে দানা দেখা যায়, তলপেটে ব্যথা থাকে এবং অরুচি আসে।

নিরাময়ের উপায়—প্রোটিনযুক্ত খাবার বেশী খেতে হবে, শাক-সব্জি বেশী খেতে হবে, পায়খানা পরিষ্কার রাখতে হবে। প্রয়োজনীয় ব্যায়াম ও যোগাসন করতে হবে এবং উপযুক্ত বিশ্রাম। এ রোগে কোন ওষুধের দরকার হয় না যদি না কোন বীজাণু-ঘটিত যেমন সিফিলিস, গনোরিয়া রোগের প্রতিক্রিয়া হয়।

ঋতুকাল বিলম্ব—সাধারণত ঋতুস্রাব ২৮ দিনে হয়। এই সময় যখন ৩৫/৪০ দিনে যায় তখন তাকে ঋতুবিলম্ব বলা যেতে পারে।

রোগের কারণ—দেহে হর্মোন অথবা রক্তের অভাব, অপরিণত জরায়ু বা ডিম্বাশয় ও তার অসুস্থতা।

রোগের লক্ষণ—রক্তশূন্যতা, অপুষ্ট দেহ, মাথাভার, মাথাধরা, মাথার যন্ত্রণা, তলপেটে ব্যথা হতে পারে ; গা ম্যাজম্যাজ করে এবং খুব ক্লান্তবোধ হয়, কখনো ঋতু দেরিতে হলেও বেশি অথবা একটু হয়েই বন্ধ হয়ে যায়। অনেক সময় স্তনে ব্যথা হয় এবং উরুতে ভার বোধ হয়। দীর্ঘদিন এ রোগে ভুগলে শ্বাসকষ্টও দেখা দিতে পারে।

নিরাময়ের উপায়—প্রোটিন জাতীয় খাদ্য, সবুজ শাক-সব্জি, প্রয়োজনীয় ব্যায়াম ও যোগাসন, বিশ্রাম। এ রোগে কোন ওষুধ দরকার হয় না। বেশীক্ষণ জলেভেজা ও ঠাণ্ডা লাগানো নিষেধ।

রজঃরোধ বা রজঃবন্ধ—রজঃস্রাব শুরু হয়, কিন্তু শেষ না হয়ে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ—হর্মোন নিঃসরণে বাধা, রক্তশূন্যতা ও অপুষ্টি, কোন কারণে জরায়ু বা যৌনাঙ্গে আঘাত বা চাপ, শোক, দুঃখ, উদ্বেগ, ভয় প্রভৃতি তবে গর্ভ সঞ্চার প্রথম কারণ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ—রোগীর চেহারায় রক্তশূন্যতা ও ফ্যাকাসে ভাব আসে মাথাব্যথা, মাথা-ধরা, তলপেটে ব্যথা দেখা দেয়, গা বমি, পেটভার, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়, রোগী কৃশ অথবা মোটা হয়ে যায়। বেশী দিন এভাবে থাকলে রক্তের রং কালচে হয়ে যায়, অনেক সময় রজঃ আবার আরম্ভ হয়।

নিরাময়ের উপায়—এ রোগে কোন ওষুধের প্রয়োজন হয় না, প্রোটিনযুক্ত খাবার, বিশ্রাম আর এমন কতকগুলো ব্যায়াম ও যোগাসন বেছে নিতে হবে যাতে বস্তিঃপ্রদেশ ব্যায়াম ও আসনের সময় রক্তে প্লাবিত হয়।

শ্বেতপ্রদর—শ্বেতপ্রদর যদিও ঋতু রোগ নয় তবুও ঋতুমতী মেয়েদের এটি একটি মারাত্মক রোগ। বেশী দিন হলে জরায়ু বা ডিম্বাশয়ে ক্যানসার বা টিউমার হতে পারে।

রোগের কারণ—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, বার বার গর্ভপাত। কোন ওষুধের প্রতিক্রিয়া, জরায়ুর প্রদাহ, গনোরিয়া বা সিফিলিস, জননতন্ত্রে বীজাণু আক্রমণ প্রভৃতি।

রোগের লক্ষণ—ঋতু বন্ধের পর সাদা স্রাব আরম্ভ হয় এবং চলতে থাকে। মাঝে মাঝে বন্ধ হয় আবার আরম্ভ হয়, মাঝে মাঝে রক্তমিশ্রিত লাল্‌চে স্রাব হয়, মাথাব্যথা, মাথা-ঘোরা আসতে পারে, পেটের গোলমাল হয়—কখনো পাতলা পায়খানা কখনো কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। রোগী দিন দিন কৃশ ও দুর্বল হতে থাকে আবার অনেক সময় দেখা যায় রোগী দুর্বল, কিন্তু মোটা হতে থাকে। আহারে অরুচি, চোখের কোণে কালি, রক্ত-শূন্যতা, ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া, মুখে মেচেতা বা কালো কালো দাগ, হাঁটু ও কোমরে ব্যথা, হাত-পা ফুলে যেতে পারে, বাত দেখা দিতে পারে, মাথার চুল পড়ে যেতে পারে, পায়ে মাঝে মাঝে ঝি ঝি ধরা, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, অনিদ্রা, অনিয়মিত মাসিক, ঘাড়ে যন্ত্রণা, মাঝে মাঝে বুক ধড়ফড় করা, খুঁত খুঁতে স্বভাব, খিট খিটে মেজাজ, ঝগড়া-প্রবণতা, অল্পতে রেগে যাওয়া, জরায়ুতে জ্বালা, প্রস্রাব দ্বারে চুলকানো ও জ্বালা, হতাশা, আত্ম-বিশ্বাস হারানো, হিস্টিরিয়া প্রভৃতি। এভাবে বেশী দিন চললে জরায়ুতে বা ডিম্বাশয়ে টিউমার ও ক্যানসার হতে পারে।

নিরাময়ের উপায়—অনেক সময় লজ্জায় রোগী কাউকে বলতে পারে না—গোপন রেখে দেয় কিন্তু এটি একটি মারাত্মক রোগ। আমি আগেই বলেছি টিউমার বা ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে এমনকি স্থূলাঙ্গী মেয়েরা দুর্বলতার জন্য হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারে। রোগীর লক্ষণ প্রকাশ পেলেই চিকিৎসকের কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে রোগের কারণ দেখতে হবে—বীজাণুঘটিত না অন্য কোন কারণ এবং সেই মত ব্যবস্থা নিতে হবে। বীজাণু-ঘটিত হলে বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দুজনকে পরীক্ষা করতে হবে। যোনি-দেশ পরিষ্কার রাখতে হবে। ঈষদোষ্ণ জলে ডেটল বা ঐ জাতীয় কিছু দিয়ে দিনে অন্ততঃ দুই বার ডুস নিতে হবে। বিধিনিষেধ ঋতু রোগের অনুরূপ ব্যায়াম ও আসন পূর্বানুরূপ।

১৭। মেনোপজ বা রজঃ নিবৃত্তি

মেয়েদের জীবনে যৌবন আরম্ভের সময় যেমন দু'এক বছর দেহ মনে পরি-বর্তন আসে তেমনি যৌবনান্তেও দু'এক বছর পরিবর্তন আসে। দুটি সময়ই মেয়েদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মত গরম দেশে মেনস্ট্রুয়েশন (পিরিয়ড) যেমন কম বয়সে শুরু হয় তেমনি কম বয়সে বন্ধ হয়ে যায়। একে চিকিৎসা-ভাষায় বলা হয়

মেনোপজ আর বাংলা ভাষায় বলা হয় রজঃনিবৃত্তি। আমাদের দেশের মেয়েদের মোটামুটি ৪০ বছর থেকে যে কোন সময় ঋতু বন্ধ হয়ে যেতে পারে—অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। এমনও দেখা গেছে ৫০ বছর পরেও ঠিকমত পিরিয়ড হয়ে যাচ্ছে। আবার ৪০ বছর না হতেই মেনোপজের লক্ষণ দেখা যায়—অনেকটা নির্ভর করে স্বাস্থ্য, আবহাওয়া ও পরিবেশের উপর। মেনোপজের দু'-এক বছর আগে থেকে এবং পরে দু'-এক বছর মেয়েদের জীবনে বহু রকমের শারীরিক ও মানসিক জটিলতা দেখা দেয়। মেয়েরা যদি জীবের শারীরবৃত্তীয় ধর্ম মনে করে এটা মেনে নিতে পারে তবে শারীরিক সবটুকু না হলেও মানসিক জটিলতা বা কষ্ট থেকে রেহাই পেতে পারে। আরম্ভ হলেই তার শেষ আছে—এই সত্যটা মেনে নিলেই আর মনে কোন কষ্ট থাকবে না।

সমস্যা ও জটিলতার লক্ষণ—প্রথম পর্বে হঠাৎ কান-মাথা গরম হয়ে যাওয়া, মাথার যন্ত্রণা, মাথার মধ্যে মনে হয় যেন আগুন জ্বলছে, সঙ্গে সঙ্গে ঘামও দেখা দিতে পারে, কানে সোঁ সোঁ আওয়াজ, হাত-পা ঝিম ঝিম করা, কোমরে-পিঠে ব্যথা, চলতে ফিরতে গেলে বা বসা অবস্থায় হঠাৎ উঠতে গেলে পায়ের হাড়ে ব্যথা, আহারে অরুচি, হজমে গোলমাল, কোষ্ঠকাঠিন্য বা তারল্য, পিরিয়ড বন্ধ হওয়ার পরে হঠাৎ দুই-তিন মাস পরে কম বা বেশী স্রাব, এমন কি পাঁচ-ছয় মাস পরেও স্রাব হতে পারে (এ অবস্থায় স্রাব খুব বেশী হলে এবং দীর্ঘ সময় স্থায়ী হলে স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে রক্ত বন্ধ করার দরকার) দ্বিতীয় পর্বে দেহের চামড়ায় টান টান ভাব চলে গিয়ে ছোট ছোট ভাঁজ পড়তে আরম্ভ করে অবশ্য বেশ কিছুদিন পরে, মাথার চুল পড়ে পাতলা হয়ে যেতে পারে, চেহারায় একটা রুক্ষ ভাব এসে যেতে পারে ইত্যাদি। যে সমস্ত মহিলারা মেনোপজের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে না তাদের বহু মানসিক জটিলতা দেখা দেয় যেমন—জীবনে হতাশা, চাওয়া-পাওয়া মনে হয় শেষ হয়ে গেল, হীনমন্যতা সবাই যেন মনে হয় করুণার বা অবহেলার চোখে দেখছে, রুক্ষ মেজাজ, অল্পেতে রেগে যাওয়া, কোন কিছুতে মন বসে না, ক্লান্তি ও অবসাদ, যৌবনবতী কোন মেয়ে দেখলেই রেগে যাওয়া বা নানা খুঁত ধরা ইত্যাদি।

কারণ—মেয়েদের জীবনে কমবেশী ৪০ বছর পার হলেই স্ত্রী-হর্মোনইস্ট্রোজেন নিঃসরণ কম হতে থাকে, কয়েক বছর পরে একেবারেই প্রায় বন্ধ হয়ে আবার পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ঐ সময় গোনাডোট্রপিন নামক এক প্রকার হরমোন নিঃসরণ বাড়তে থাকে ফলে মেনোপজ বা রজঃনিবৃত্তি।

সমাধানের উপায়—বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই এ ঘটনা যে একদিন আসবে সেজন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে, চিন্তা বাস্তবমুখী রাখতে হবে। নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম চর্বিহীন সহজপাচ্য প্রোটিনযুক্ত খাবার খেতে হবে, এমন কোন খাবার খাওয়া উচিত নয়, যাতে হজমে গোলমাল, কোষ্ঠকাঠিন্য বা তারল্য আসতে পারে। মাঝে মাঝে বেশ কয়েকদিন ভোরে খালি পেটে ত্রিফলার জল খাওয়া অভ্যাস করতে হবে। ত্রিফলার জল খাওয়ার আধ ঘণ্টা পর চা, বিস্কুট খাওয়া যেতে পারে। বহু মহিলা এ সময় মোটা হতে থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে, মনকে হালকা ও প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করতে হবে। নিজেকে সব সময় কাজের মধ্যে রাখলে ভালো হয়। সকাল বা বিকালে প্রয়োজন মত যোগাসন করতে হবে—আসনের ভিতর এমন দু' তিনটি আসন থাকার দরকার যাতে তলপেট, বস্তিপ্রদেশ ও কোমরে বেশ চাপ পড়ে। রাত্রে বিছানায় যাওয়ার পূর্বে ১০ মিঃ বজ্রাসন করলে রাত্রে ভালো ঘুম হবে। যদি মাথায় যন্ত্রণা বা অন্য কোন উপসর্গ থাকে তবে সকাল ও বিকালে আধঘণ্টা শবাসন বা সিদ্ধাসন, পদ্মাসন প্রভৃতি করলে দু'-তিন দিনেই উপকার পাওয়া যাবে।

১৮। ক্ষুধামান্দ্য

ক্ষুধামান্দ্য কোন রোগ নয়—শারীরিক বা মানসিক কারণে বা রোগের উপসর্গ মাত্র। অথচ আজকাল বাচ্চা থেকে বুড়ো-বুড়ী, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে অনেকেই এর শিকার। শহরে একটু খোঁজ করলে দেখা যাবে প্রতি দশ জনের মধ্যে চার-পাঁচ জনে এ-অসুখে ভুগছে।

কারণ—আমি আগেই বলেছি ক্ষুধামান্দ্য কোন রোগ নয়—এক বা একাধিক রোগের উপসর্গ। নানা কারণে এ-উপসর্গ দেখা দিতে পারে যেমন—অনিয়মিত খাওয়া, দীর্ঘদিন বেশি তেল, ঘি, মশলাযুক্ত গুরুপাক খাবারের ফলে বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য বা তারল্য। দীর্ঘদিন অতিরিক্ত মদ্যপান, দোক্তা, পান-মশলা, সুপারি প্রভৃতিতে আসক্তি, অতিরিক্ত ধূমপান, গ্যাসট্রাইটিস আলসার বা অন্য কোন কারণে পাকস্থলীতে বা অন্ত্রে প্রদাহ, খাদ্যনালীতে প্রদাহ, টনসিলে প্রদাহ, জিভে বা মুখের মধ্যে ক্ষত বা ঘা, দীর্ঘদিন এক-টানা অনিদ্রা, মানসিক হতাশা, ক্লান্তি-অবসাদ, দুশ্চিন্তা, দীর্ঘদিন ভয়-ভীতি, কোন কিছু মনে দীর্ঘদিন চেপে রাখা, খাবার জায়গায় নোংরা পরিবেশ বা পরিবেশন ব্যবস্থায় অরুচি, দীর্ঘদিন আমাশয় বা বদহজমের জন্য কতকগুলো ওষুধ সেবন, গর্ভবতী মেয়েদের প্রথম দু'একমাস খাবারে অরুচি, যৌবন আরম্ভে অনেক মেয়েরা স্লিম থাকার জন্য কম খাওয়ার অভ্যাস—কালে সেই অভ্যাস ক্ষুধামান্দ্য ডেকে আনতে পারে তেমনি মেয়েদের মেনোপজের সময় নানা কারণে ক্ষুধামান্দ্য আসতে পারে তাহলে দেখা যাচ্ছে বহু কারণে এ উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

নিরাময়ের উপায়—আজকাল বাজারে একশ'র উপর হজমের ওষুধ বের হয়েছে। অন্যান্য কয়েকটি উপাদানের সঙ্গে কিছু মাত্রা এ্যালকোহল মিশিয়ে দিলেই হজমের ওষুধ হয়ে গেল এবং তাতে হয়তো সাময়িক কিছু উপকারও পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু সে তো সাময়িক। আসল কারণ খুঁজে বের করতে না পারলে উপসর্গ দূর হবে না। এর জন্য প্রায়ই কোন ওষুধের দরকার হয় না। স্বাস্থ্য-বিধি মেনে চললে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এমনিই উপসর্গ চলে যায়। সকালে খালি পেটে চিরতার জল হজমশক্তি বৃদ্ধি করে, তরকারিতে বা খাবারে সবুজলংকা (কাঁচালংকা) ব্যবহার করতে হবে আর বয়স ও উপসর্গ অনুযায়ী কয়েকটি আসন বেছে নিয়মিত করতে হবে। আসনগুলি এমন হওয়া উচিত যাতে পেট, তলপেট বা বস্তি-প্রদেশে ভালো ব্যায়াম হয়, এবং দু' একটি আসন এমন হবে যাতে ঐ অঞ্চল বিপরীতমুখী হয় যেমন—কর্ণ-পিঠাসন, সর্বাংগাসন, বিপরীত-করণী মুদ্রা ইত্যাদি।

১৯। রক্তাল্পতা ও অ্যানিমিয়া

যদিও অ্যানিমিয়ার বাংলা অর্থ রক্তাল্পতা—মানেটা বোধহয় সঠিক নয়। হঠাৎ যদি কোন দুর্ঘটনায় দেহ থেকে প্রচুর রক্ত বের হয়ে যায় অথবা কোন অস্ত্রোপচারের সময় দেহ থেকে বেশ কয়েক বোতল রক্ত বের হয়ে যায় তবে দেহে সেই সময় রক্তাল্পতা দেখা দেয়, আবার কোন মহিলার যদি বেশ কয়েকবার অতিরজঃ হয় তখন তার দেহে রক্তাল্পতা আসে কিন্তু এর কোন ক্ষেত্রে অ্যানিমিয়া বলতে যা বোঝায় তা নয়। অ্যানিমিয়া ছাড়াই দেহে রক্তাল্পতা আসতে পারে। আবার হয়তো কারো দেহে মোট রক্তের পরিমাণ স্বাভাবিক আছে তবুও সে অ্যানিমিয়ায় ভুগছে, এ ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যানিমিয়া আছে কিন্তু রক্তল্পতা নেই—আছে বিশুদ্ধ রক্তের অভাব। এই পার্থক্য জানতে হলে দেহের গঠন ও খাদ্যের উপাদান (এই বই-এ দেহের গঠন ও খাদ্যের উপাদান দ্রষ্টব্য) একটু জ্ঞান থাকা দরকার এবং এই জানার উপর অ্যানিমিয়া নিরাময়ের অনেকটা নির্ভর করে।

আমাদের রক্তে নানা রকম কণিকার মধ্যে লোহিত কণিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—এই লোহিত কণিকা তৈরি হয় হিমোগ্লোবিন থেকে, লোহিত কণিকা ফুস্‌ফুস্‌ থেকে অক্সিজেন নিয়ে রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়—ফলে রক্ত বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধ রক্ত সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়ে আবার সমস্ত দেহ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বিষ এই লোহিত কণিকা ফুস্‌ফুসে নিয়ে এসে দেহ থেকে বের করে দেয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে লোহিত কণিকার দেহের এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটি করতে হয়। এখন যদি কোন কারণে দেহে লোহিত কণিকা অথবা হিমোগ্লোবিনের অথবা উভয়ের অভাব দেখা দেয় অথবা লোহিত কণিকার আকৃতি-প্রকৃতিগত ত্রুটি দেখা দেয় তবেই দেহে বিশুদ্ধ রক্তের অভাবে অ্যানিমিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে অ্যানিমিয়া মানেই রক্তাল্পতা নয়—বলা যায় বিশুদ্ধ-রক্তাল্পতা।

কারণ—অ্যানিমিয়ার প্রত্যক্ষ কারণ প্লীহা-যকৃতের দুর্বলতার ফলে অক্ষমতা আর দেহ থেকে অধিক বা নিয়মিত রক্তক্ষরণ। পরোক্ষ কারণ—বদহজমের ফলে নানা রকম পেটের অসুখ। প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব ফলে অপুষ্টি, রক্তে অম্লবিষ ও অন্যান্য বিষের আধিক্য ফলে হিমোগ্লোবিন ও লোহিত কণিকার অভাব, কোন কারণে পাকস্থলী বা অন্ত্রের ক্ষতে রক্তক্ষরণ, মেয়েদের অতিরজঃ, গর্ভাবস্থায় পুষ্টির অভাব বিশেষভাবে লৌহ গঠিত খাদ্যের অভাব, অনিয়মিত মাসিক, পুনঃ পুনঃ সন্তান ধারণ ইত্যাদি, দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, নিউমোনিয়া, জন্ডিস্‌ প্রভৃতি রোগ ভোগের পর অ্যানিমিয়া আসতে পারে।

লক্ষণ—অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশ কিছুদিন রোগ ভোগের পর অ্যানিমিয়ার লক্ষণগুলি বাইরে প্রকাশ পায়। গুরুতর অবস্থায় না পেঁছানো পর্যন্ত খুব বেশী অসুবিধা বা উপসর্গ নাও দেখা দিতে পারে—কর্ম-দক্ষতায় অসুবিধা হলেও কাজ চালিয়ে যেতে পারে। উল্লেখযোগ্য উপসর্গের মধ্যে সামান্য পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট হওয়া, বুক ধড়পড় করা, হজমে গোলমাল, অরুচি, অক্ষুধা, গায়ের চামড়ায় রুক্ষতা, চোখের পাতার ভিতরের অংশ ফ্যাকাশে, জিভের রং সাদা ও উপরে ময়লা পরদা, মেয়েদের ঋতুরোগ ও পুরুষের যৌনশীলতা প্রভৃতি।

নিরাময়ের উপায়—অ্যানিমিয়া নিজে কোন রোগ নয়—অন্য এক বা একাধিক রোগের পরিণতি বা ফল। আগেই বলেছি রক্তের মূল উপাদান তিনটি—লৌহ, ফোলিক এ্যাসিড্‌ ও ভিটামিন বি-১২। দেহে এর একটি বা দু'টির অভাবে রক্তে হিমোগ্লোবিনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ফলে লোহিত কণিকার সংখ্যা অথবা তার গুণগত মান কমে যায়, তখন দেহে আর শুদ্ধ-অশুদ্ধ পদার্থের আদান-প্রদান ঠিকমত হয় না। অ্যানিমিয়া নিরাময়ে কোন ওষুধের প্রায় দরকার হয় না—কারণটা বের করে সেই মত ব্যবস্থা নিলেই ভালো হয়ে যায়। খাবারের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। সুষম খাবার অথচ সহজ-পাচ্য হওয়া চাই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় দেহে লৌহের অভাবে অ্যানিমিয়া, আমরা দৈনন্দিন জীবনে যা খাই তাতেই লৌহের অভাব পূর্ণ হওয়া উচিত কিন্তু এমন কতকগুলি খাদ্য আমরা খাই যা থেকে দেহ সবটুকু লৌহ কাজে লাগাতে পারে না যেমন—চালের তৈরি খাবার ও শাক-সবজি। চাল ও শাক-সবজিতে অক্সালেট ও ফাইটেট নামক দুটি পদার্থ আছে যা অন্ত্রে খাদ্যের লৌহ অংশ চুষে নিতে বাধা দেয়। লৌহ সমৃদ্ধ খাদ্য—গম, ঢেঁকিছাঁটা চাল, বজরা, জোয়ার, লেট্যুস, পেঁয়াজ, মুলা (লৌহ সমৃদ্ধ খাদ্য তালিকা দ্রষ্টব্য), মাছ, মাংস, ডিমের কুসুম প্রভৃতি। স্বাস্থ্য-নীতি মেনে চললে ও কিছুদিন বিশ্রাম নিলে অ্যানিমিয়া এমনিই ঠিক হয়ে যায়।

২০। বাতরোগ

বাতরোগ যদিও জীবনসংশয়কারী ও সংক্রামক নয়, তবুও এ রোগ ভীষণ কষ্ট-দায়ক। মানুষকে এ রোগ অকর্মণ্য করে দেয়—এমন কি, শয্যাশায়ী করে দিতে পারে। বাতরোগ দেহের বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করতে পারে। এ রোগ যখন মাংসপেশী আক্রমণ করে, তখন তাকে বলা হয় পেশীবাত (Mascular Rheumatism), আবার যখন অস্থিসন্ধিস্থলে আক্রমণ করে, তখন সন্ধিবাত (Gout) এবং কটিদেশে আক্রমণ করলে তাকে কটিবাত (Lumbago Rheumatism) বলে। বাতের জন্য দেহে জ্বর দেখা দিলে, তাকে বাতজ্বর (Acute Rheumatism) বলা হয়।

রোগের লক্ষণ—হাত-পা কামড়ানো, পিঠে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, পায়ে ব্যথা, দেহের গাঁটে গাঁটে (সন্ধিস্থলে) ব্যথা ও ফুলে ওঠা, হাত-পা কাঁপা বা কিছুসময় অবশ হয়ে থাকা এ রোগের লক্ষণ। এমন কি এই রোগ দেহে বেশীদিন থাকলে দেহের যে-কোন অংশ সম্পূর্ণ অবশ হয়ে যেতে পারে।

রোগের কারণ—এ রোগের প্রত্যক্ষ কারণ হলো, দেহ-অভ্যন্তরস্থ বায়ু দূষিত হয়ে, যখন কর্মক্ষমতা হারায়, তখন ঐ নিস্তেজ বায়ু দেহ থেকে অম্লবিষ, ইউরিক, ইউরিয়া প্রভৃতি বিষ মল, মূত্র ও ঘামের মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দিতে পারে না।

ক্ষারধর্মী রক্তই দেহের পুষ্টি যোগায়। রক্তের মধ্যে কিছুটা অম্লরস (Acid) থাকে। কিন্তু রক্ত যদি কোন কারণে অম্লধর্মী অর্থাৎ রক্তে যদি অম্ল প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়ে যায় তখন ঐ রক্ত আর বিশুদ্ধ থাকে না। রক্তের ক্ষারভাগ (Alkali) কম হয়ে যাওয়ায় রক্ত নিস্তেজ হয়ে পড়ে, পুষ্টি দিয়ে দেহকে সুস্থ সবল রাখতে পারে না ফলে দেহযন্ত্রগুলি আর ঠিক মত কাজ করতে পারে না। রক্তের ভিতর থেকে প্রয়োজনাতিরিক্ত অম্লরস ছেঁকে বের করে দেওয়ার দায়িত্ব মূত্রগ্রন্থির (Kidney), যকৃৎ মূত্রগ্রন্থিকে একাজে সাহায্য করে। মূত্রগ্রন্থি অম্লরসকে রক্ত থেকে বের করে দিলে বায়ু সেই অম্লরসকে মল, মূত্র, ঘামের মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দেয়, কিন্তু দেহ যন্ত্রগুলি যখন অম্লবিষে জর্জরিত হয়ে ঠিক মত কাজ করতে পারে না তখন বায়ুও নিস্তেজ হয়ে আসে এবং সঞ্চিত অম্লবিষ (ইউরিক, ইউরিয়া প্রভৃতি এ্যাসিড্) আর দেহ থেকে বের করে দিতে পারে না। অম্লবিষ যখন কোমরে, পায়ে বা দেহের যে কোন সন্ধিস্থলে জমতে আরম্ভ করে সেইখানে বাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বলাবাহুল্য, অধিক পরিমাণে অম্লধর্মী খাদ্যগ্রহণ, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, শ্রম-বিমুখতা, উপযুক্ত ব্যায়ামের অভাব, অসংযম জীবনযাপন, অত্যধিক চা-কফি পান ইত্যাদি এ রোগের পরোক্ষ কারণ। এ রোগ দেহে স্থান পরিবর্তন করতে পারে।

রোগ নিরাময়ের উপায়—যে-কোন প্রকার বাতরোগের লক্ষণ দেহে প্রকাশ পেলেই, আহার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। চর্বিজাতীয়, আমিষজাতীয় ও শর্করাজাতীয়, যেমন—তেল, ঘি, ডিম, মাছ, মাংস, ভাত, রুটি—যতটা সম্ভব কমিয়ে দিতে হবে। ক্ষারধর্মী খাদ্য, যেমন—শাকসব্জী, ফলমূল, দুধ, ঘোল প্রভৃতি খেতে হবে। একবারে অধিক ভোজন বা অক্ষুধায় খাওয়া বন্ধ করতে হবে। এ রোগের লক্ষণ দেহে দেখা দিলেই দরকার হলে একদিন, দুদিন সম্পূর্ণ উপবাস করতে পারলে, এ রোগের বেশ কিছুটা উপশম হবে। তাছাড়া—অমাবস্যা, পূর্ণিমায় সম্পূর্ণ উপবাস দিতে হবে। উপবাসের সময় প্রচুর পরিমাণে জল পান করা উচিত। যদি সম্পূর্ণ উপবাস সম্ভব না হয়, তবে একবেলা কিছু ফলমূল, ঘোল, ছানার জল, ডাবের জল

প্রভৃতি খাওয়া যেতে পারে। স্নানের পূর্বে গায়ে সরষের তেল মেখে কিছুক্ষণ রোদে স্নান করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে মাথায় যেন রোদ না লাগে। সকাল-সন্ধ্যায় ভ্রমণ ও শারীরিক শ্রমযুক্ত কাজ বাতরোগীদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। খুব ঠান্ডা জলে স্নান করলে বা দেহে কোন প্রকার ঠান্ডা প্রবেশ করলে বাতরোগ বৃদ্ধি পায়। রোগের যন্ত্রণা বা ব্যথা খুব বেশী হলে, আক্রান্ত স্থানে গরম সেঁক্, সরষের তেল গরম করে মালিশ বা লবণ জলের সেঁক্ দিলে সাময়িক-ভাবে বেশ উপকার পাওয়া যায়। আক্রান্ত স্থানে গরম কাপড় জড়িয়ে রাখলেও বেশ আরাম পাওয়া যাবে। কিন্তু এই সাময়িক আরাম রোগের চিকিৎসা নয়। তাই দেহের অপ্রয়োজনীয় অম্লবিষ ইউরিক এ্যাসিড প্রভৃতি আর যাতে না বাড়তে পারে, দেহ থেকে যাতে তা ঠিকমত বের হয়ে যেতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ যতদিন পর্যন্ত এই সব দেহে জমে থাকবে বা রক্ত এই সব বিষে জর্জরিত থাকবে, ততদিন বাতরোগ নিরাময় হবে না। তাছাড়া, রোগাক্রমের স্থানানুযায়ী আসন করতে হবে। বাত-রোগীদের পক্ষে অর্ধ-কূর্মাসন, জানুশিরাসন, পশ্চিমোত্থানাসন, ধনুরাসন, উষ্ট্রাসন, পদ-হস্তাসন, অর্ধ-চক্রাসন, ভূজংগাসন, বজ্রাসন প্রভৃতি আসন বিশেষ উপকারী। তবে রোগীর বয়স ও সামর্থ্যানুযায়ী আসন নির্বাচন করতে হবে। বজ্রাসন অবশ্য করণীয়। পূর্ণ-আহারের পর দশ মিনিট বজ্রাসন করলে দেহের নিম্নাংশে বাত থাকতে পারে না। বয়স যাঁদের খুব বেশী—যাঁদের পক্ষে কোন আসন করা সম্ভব নয়—তাঁরা সকাল-সন্ধ্যায় খোলা জায়গায় সাধ্যমত পায়চারী করলে উপকার পেতে পারেন। রসুনের দু' তিনটি কোয়া একটু সেঁকে খাবারের সঙ্গে খেলে বাতরোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বেতোজ্বর

রিউম্যাটিক ফিবার বা বেতোজ্বর একটি জীবন সংশয়কারী মারাত্মক রোগ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে কম বয়সী বা বয়ঃসন্ধিক্ষণে ছেলেমেয়েদের এ রোগ হয়। প্রথমেই ঠিকমত চিকিৎসা না হলে রোগীর হৃৎপিণ্ডে, স্নায়ুতে ও হাড়ের সন্ধিস্থলে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। রোগের উপসর্গ দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ মত রোগ-জীবাণু ধ্বংস করতেই হবে। রোগের অ্যাকিউট অবস্থায় যোগ-ব্যায়ামের আশ্রয় নিলে কোন উপকার পাওয়া যাবে না। প্রথমে ডাক্তারের পরামর্শ মত এ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে রোগ-জীবাণু ধ্বংস করে, সুস্থ হয়ে তারপর আস্তে আস্তে বয়সানুযায়ী যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস করতে হবে।

রোগের কারণ—প্রত্যক্ষ কারণ দেহে একজাতীয় জীবাণুর সংক্রমণ আর পরোক্ষ কারণ অপুষ্টি এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস।

রোগের লক্ষণ—কিছু রোগী জ্বর শুরু হবার বেশ কিছুদিন আগে থেকে মাঝে মাঝে একটানা গলা ব্যথায় ভুগতে থাকে। কনুই, গোড়ালি, হাঁটু বা অন্য কোন বড় সন্ধিস্থল হঠাৎ ফুলে ওঠে, তীব্র ব্যথা বা যন্ত্রণা হয় এবং সংগে জ্বর। দু-একদিন পরে দেখা গেলো আক্রান্ত সন্ধিস্থলের ব্যথা, যন্ত্রণা ও ফুলো কমে গেছে কিন্তু অন্য একটি সন্ধিস্থল একইভাবে আক্রান্ত হয়েছে, এক সময়ে একাধিক সন্ধিস্থল সাধারণতঃ আক্রান্ত হয় না। কয়েকদিন জ্বরের পর হাতে-পায়ে, পিঠে মেরু-দণ্ডের দু'পাশে চামড়ার নিচে ছোট ছোট গুটি দেখা দিতে পারে। রোগ-জীবাণু স্নায়ু আক্রমণ করলে দেহের যে কোন জায়গায় চামড়ার নিচে মাঝে মাঝে কাঁপতে দেখা যায়, হৃৎপিণ্ডে আক্রমণ করলে বুকে মৃদু যন্ত্রণা হয়। হৃৎপিণ্ডের ভালভে ক্ষতের সৃষ্টি

করতে পারে। রোগ-জীবাণু বেশীদিন হৃৎপিণ্ডে বসবাস করলে হৃৎপিণ্ডের ভালভের টিস্যুর সমূহ ক্ষতি করতে পারে—এমন কি ভালভ অকেজো করে দিতে পারে। হৃদ্-রোগাক্রান্ত রোগীদের ভিতর দেখা গেছে বেশীর ভাগ রোগী এ রোগের শিকার।

নিরাময়ের উপায়—সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিশ্রাম তবে সম্ভব হলে খোলা জায়গায় পায়চারী করা যেতে পারে, কোনভাবে ঠাণ্ডা না লাগে। আক্রান্ত জায়গায় নুনের পুঁটুলি করে অথবা গরম নুন জলে তোয়ালে ভিজিয়ে নিংড়িয়ে সেঁক্ দিতে হবে। পুষ্টিকর এবং সহজপাচ্য খাবার। রোগী সুস্থ হলে আস্তে আস্তে যোগ-ব্যায়াম আরম্ভ করতে হবে। আহারের বিধিনিষেধ মেনে চললে যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস রাখলে পুনরায় রোগাক্রমের সম্ভাবনা থাকে না।

২১। জ্বর

জ্বর কোন রোগ নয়। দেহে রোগ বীজাণু প্রবেশের ফল স্বরূপ একটি প্রতিক্রিয়া মাত্র। জ্বর হলেই বুঝতে হবে দেহের প্রতিরক্ষা বাহিনীর পরাজয় এবং রোগ-বীজাণুর জয়—তাই অবিলম্বে জ্বরের কারণ অবশ্য বের করা প্রয়োজন। দেহের তাপ কমাবার জন্য এন্টিপেরিয়েটিক ওষুধ আছে, তবে ঠিক জ্বরের চিকিৎসা নয়। প্রথমে দেখতে হবে জ্বর হ'লো কেন ? এবং সেই মত ব্যবস্থা নিতে হবে। চিকিৎসক নিজে কতকগুলি লক্ষণ দেখে নিতে পারেন যেমন—চোখ-মুখ লাল, জিভের ওপরে সাদা ময়লা বা পরদা, বুকে ঘড়্ঘড়্ বা ঘস্ঘস্ আওয়াজ, নাড়ীর গতিতে বিশৃঙ্খলা বা অনিয়ম ইত্যাদি। আবার কতকগুলো লক্ষণ রোগীর নিজে বলতে হবে যেমন গলায় ব্যথা, গা-হাত-পায়ে, সব জায়গায় ব্যথা, শুধু কোমরে বা দেহের সন্ধিস্থলে ব্যথা, বুকে বা বুকের ডানদিকে বা বাঁদিকে ব্যথা, বমিভাব, খেতে ইচ্ছে করে কিনা, খিদে আছে কিনা, জ্বর যখন না থাকে, তখন দেহে ঠাণ্ডা বা গরম বোধ, মাথাধরা বা মাথায় যন্ত্রণা ইত্যাদি। তবে যে শিশু কথা বলতে পারে না সেখানে চিকিৎসকেই সব কিছু বুঝে নিতে হবে।

তাছাড়া জীবাণু-ঘটিত জ্বর ছাড়াও দেহের তাপ বাড়তে পারে যেমন অন্ত্রে কোন ঘা হলে, এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ হলে, বিষাক্ত কোন কীট-পতঙ্গ কামড়ালে, দেহে কোন জায়গায় প্রচণ্ড আঘাত লাগলে, রৌদ্রে ঘোরবার পর বা বহুক্ষণ গরমে থাকার পর, কোন কোন ইন্জেক্সান নিলে, কোন খাবার বা ওষুধের বিষক্রিয়া, হঠাৎ শোক, উত্তেজনা, রক্তপাত প্রভৃতি নানা কারণে দেহের তাপ বাড়তে পারে। এ জ্বরে ভয়ের কোন কারণ নেই। তাপ সাধারণত ১০১ ডিগ্রির বেশী ওঠে না, এ সময় হালকা খাবার ও বিশ্রাম নিলে দু-তিন দিনের মধ্যে শরীর ঠিক হয়ে যায় তবে লক্ষ্য রাখতে হবে এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেহে কোন বীজাণু না প্রবেশ করতে পারে।

এ জাতীয় জ্বরের লক্ষণ—দেহের তাপ বৃদ্ধি পায়, জ্বর বেশীক্ষণ থাকে না, জ্বর ছাড়ার সময় গায়ে ঘাম দেখা দিতে পারে, কোষ্ঠবদ্ধতা আসতে পারে, জ্বরের সময় দেহ বা চোখ জ্বালা করতে পারে, নাড়ী ও শ্বাসের গতি বেড়ে যেতে পারে। প্রস্রাব কমে যেতে পারে বা প্রস্রাবের রং লাল হতে পারে এবং এক্ষেত্রে জল বেশী খাওয়ার প্রয়োজন। যদি প্রয়োজন হয় তবে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ভিটামিন C ট্যাবলেটের সঙ্গে এ্যালকাসল্ জাতীয় ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। তাপ কমাবার জন্য নানাবিধ ওষুধ বাজারে পাওয়া যায় যেমন নোভালজিন্, আলট্রাজিন্, ক্রোসিন, কোডোপাইরিন, কোসাভিল তবে এসব ওষুধ ব্যবহার করার পূর্বে ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্য প্রয়োজন

কারণ দেহের লক্ষণাদি পরীক্ষা করে একমাত্র তিনিই বলতে পারবেন কোন ওষুধটা সেই রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং কতটা পরিমাণ। তবে এসব জ্বরে ঠিকমত হালকা পথ্য ও বিশ্রাম পেলে এমনিতেই সেরে যায়।

বীজাণুঘটিত জ্বর—ইন্ফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড্, ডিপথিরিয়া, হাম, বসন্ত, বিশেষ ধরনের সর্দি-কাশি, মেনেনজাইটিস্, ডেংগু, নিউমোনিয়া, সিফিলিস, গনোরিয়া, এডস্ প্রভৃতি।

এই সব রোগ-বীজাণু দেহে প্রত্যক্ষভাবে আসতে পারে যেমন সিফিলিস, গনোরিয়া, এডস্-এর বীজাণু প্রত্যক্ষভাবে দেহে প্রবেশ করে আবার মেনেনজাইটিস, কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, ডিপ্থিরিয়া, হাম, বসন্ত প্রভৃতির রোগ-বীজাণু, জল, বাতাস, রোগীর ব্যবহৃত থালা-গেলাস, কার্পাডস্, কাপড়, মশা-মাছি প্রভৃতির মাধ্যমে, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদি বা ইন্জেক্সানের সুচের মাধ্যমে প্রভৃতি নানাভাবে পরোক্ষভাবে দেহে আসতে পারে এবং আসলেই যে দেহ সংগে সংগে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই যেমন শিশু বা কিশোর দেহে ডিপথিরিয়া বীজাণু প্রবেশ করলে ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যে, হাম ও বসন্তের বীজাণু প্রবেশ করলে ৮ থেকে ১০ দিনের মধ্যে আবার সিফিলিস্, গনোরিয়া, এডস্, ধনুষ্টংকার-এর বীজাণু প্রবেশ করলে ১০ দিন থেকে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে—সব কিছু নির্ভর করে দেহের প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপর এবং এমনও হতে পারে দেহরক্ষা বাহিনীর প্রতি-আক্রমণে রোগ-বীজাণু সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, সে ক্ষেত্রে রোগাক্রমণ নাও হতে পারে। এখন দেখা যাক জ্বরে সাধারণত কি কি লক্ষণ দেখা দিলে তাকে কি ধরনের জ্বর বলা হয়—

১। লালাগ্রন্থি ফুলে উঠলে এবং তাপ বৃদ্ধি পেলে তাকে মামস্ জ্বর বলা হয়। শিশুরাই এ রোগে বেশী আক্রান্ত হয়।

২। ত্বকের উপরে ছোট ছোট ফুসকুড়ি অথচ কোন ব্যথা নেই সঙ্গে সর্দিও আছে তাকে হামজ্বর বলা হয়। শিশুদের এ রোগ বেশী হয়।

৩। কোমরে, দেহে প্রচণ্ড ব্যথা, জ্বর জ্বর ভাব ঐ সময় দেহে জলভর্তি গুটি ফুসকুড়ি দেখা দিলে বুঝতে হবে বসন্ত (Pox)।

৪। দেহের গ্রন্থি যদি ফুলে ওঠে এবং সংগে ব্যথা ও তাপ বৃদ্ধি পেতে থাকলে প্লেগ বুঝতে হবে।

৫। ত্বকে কিছুটা লাল ভাব আছে অথচ কোন ফুসকুড়ি বা ব্যথা নেই শুধু দেহে তাপ কিছুটা বেড়েছে, মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে বুঝতে হবে দেহের কোন জায়গায় বিষাক্ত পোকা-মাকড় কামড়েছে এবং সে জায়গায় কিছুটা নীল হয়ে গেছে।

৬। বেশী রৌদ্রে ঘোরবার জন্য বা অত্যন্ত গরম জায়গায় বেশীক্ষণ কাজ করার জন্য হঠাৎ যদি দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাকে বলা হয় সান্ স্ট্রোক বা হিট্ স্ট্রোক।

৭। ডান কুঁচকিতে ব্যথা এবং সঙ্গে জ্বর দেখা দিলে এ্যাপেণ্ডিসাইটিসের লক্ষণ।

৮। দেহের গাঁটে গাঁটে ব্যথা, বুকে ব্যথা এবং ঘড়ঘড়্ শব্দ প্রভৃতি লক্ষণগুলি দেখা দিলে রিউম্যাটিক বা বাতজ্বর বুঝতে হবে।

৯। গলার গ্রন্থিতে ব্যথা, গলনালীতে সাদা পরদা, শ্বাসকষ্ট, কোন কিছু গিলতে কষ্ট লক্ষণগুলি দেখা দিলে বুঝতে হবে ডিপথিরিয়া।

১০। বুকে ব্যথা, কাশি, ফুসফুসে প্রদাহ, রোজ সন্ধ্যায় জ্বর, ভোরে জ্বর থাকে না লক্ষণগুলি বুঝতে হবে যক্ষা।

১১। বুকে ঘড়ঘড় শব্দ, সর্দি-কাশি এবং বুকে ব্যথা সংগে জ্বর থাকলে বুঝতে হবে ব্রংকাইটিস্ অথবা নিউমোনিয়া।

১২। দেহে প্রচণ্ড ব্যথা, প্রবল জ্বর উঠা-নামা করছে একে বলা হয় ডেংগু জ্বর।

১৩। একদিন অন্তর অথবা নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেকদিন প্রবল জ্বর এবং জ্বর আসার পূর্বে দেহে প্রচণ্ড শীত বোধ এ সব লক্ষণ দেখা দিলে বুঝতে হবে ম্যালেরিয়া না হয় কালাজ্বর।

১৪। রোজ জ্বর হয়, ম্যালেরিয়ায় রোজ ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। তাপ ওঠা-নামা, জ্বর বাড়তে থাকে, জিভের ওপরে সাদা পরদা পড়ে ও জিভের অগ্রভাগ লাল হলে এবং ৮ থেকে ৯ দিনের মধ্যে জ্বর উপশম না হলে বুঝতে হবে প্যারাটাইফয়েড অথবা টাইফয়েড।

১৫। পূর্ব-ক্ষতের জন্য জ্বরসহ দেহ বেঁকে যাচ্ছে, খিচুনি আসছে, দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে এসব লক্ষণ দেখা দিলে বুঝতে হবে টিটেনাস বা ধনুষ্টঙ্কার।

১৬। ত্বকে লালচে ভাব, গলায়, ঘাড়ে ব্যথা, ভুল বকা, বমি অথবা বমি বমি ভাব, মাথা সামনে-পিছনে কোনদিকে বাঁকানো যায় না, ঘাড় শক্ত, হাঁটুও বাকানো যায় না, সঙ্গে প্রবল জ্বর এসব লক্ষণ দেখা দিলে বুঝতে হবে মেনিনজাইটিস্।

১৭। দেহের কোন অংশ বা শিরা ফুললে সংগে জ্বর ফাইলেরিয়া রোগের লক্ষণ।

১৮। বারে বারে প্রস্রাব এবং প্রস্রাবের পরিমাণ কম, মূত্রনালীতে যন্ত্রণা সংগে অল্প বা বেশী জ্বর থাকলে বুঝতে হবে গল ব্ল্যাডারে বা পথে কোথাও পাথর (Stone) সৃষ্টি হয়েছে।

১৯। প্রচণ্ড রোদে ঘুরলে, খুব বেশী জলে ভিজলে, ঠাণ্ডা লাগলে যে সর্দি কাশি সহ জ্বর হয় তাকে সাধারণ জ্বর বলে। হালকা খাবার ও বিশ্রাম নিলে এমনিই ঠিক হয়ে যায় কিন্তু এই জ্বর যখন ব্যাপকহারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং মারাত্মক হয়ে পড়ে তখন আর সাধারণ জ্বর বলে না—বলে ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং এর বীজাণু অতি অল্প সময়ে বহু লোককে রোগাক্রান্ত করতে পারে এমন কি ঠিক সময়ে ব্যবস্থা না নিলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। এরকম দেহের লক্ষণাদি দেখে রোগ জানা সম্ভব—তবে ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্য প্রয়োজন যেমন ঠিক রোগ নির্ণয় করতে হলে মল, ইউরিন, ব্লাড পরীক্ষা করা দরকার তার পূর্বে ডাক্তারকে সম্ভাব্য ওষুধ দিয়ে পরীক্ষা করে যেতে হবে—লাগতেও পারে আবার নাও লাগতে পারে। এখন দেখা যাক যোগ-ব্যায়াম এসব ক্ষেত্রে কিভাবে সাহায্য করতে পারে? হ্যাঁ সাহায্য করতে পারে বীজাণু দ্বারা রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে ও বীজাণুমুক্ত হওয়ার পরে। যোগ-ব্যায়াম অভ্যাসে আপনার দেহ যদি সুস্থ ও সবল থাকে তবে কোন রোগবীজাণু আপনাকে সহজে রোগাক্রান্ত হতে দেবে না কারণ রুগ্ন-দুর্বল দেহ সহজে রোগ-বীজাণুর শিকার হয়। দেহ বীজাণু দ্বারা রোগাক্রান্ত হলে যোগ-ব্যায়ামের আর কিছু করার থাকে না। আমি আগেই বলেছি তখন বাইরের সাহায্য যেমন ওষুধ নিতেই হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত দেহ বীজাণুমুক্ত হয়। দেহ বীজাণুমুক্ত হলে তখন যোগ-ব্যায়াম আপনাকে সাহায্য করতে পারে। সুখাসন, শবাসন, ভ্রমণ প্রাণায়াম, সহজ প্রাণায়াম, সাধ্যমত কিছু খালি হাতে ব্যায়াম আপনাকে সুস্থ হতে সাহায্য করবে।

এখন কয়েকটি বিশেষ ধরনের জ্বর নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

ডেঙ্গু জ্বর—এ জ্বরে সব দেশে, সব ঋতুতে এবং সব বয়েসের লোকদের রোগাক্রান্ত হতে দেখা যায়। এরোগের প্রধান বাহন মশা অবশ্য সুযোগ পেলে মাছিও সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

রোগটি ভীষণ সংক্রামক। যেহেতু মশা ও মাছি সাধারণত এ রোগের ভাইরাস বহন করে সেইজন্য রোগীকে মশারীর ভিতর রাখা বাঞ্ছনীয়। শিশু ও দুর্বল ব্যক্তিদের রোগী থেকে দূরে রাখতে হবে এবং রোগীর ব্যবহৃত সব কিছুই আলাদা থাকা উচিত।

রোগের কারণ—ডেঙ্গু নামক এক জাতীয় ভাইরাস।

রোগের লক্ষণ—যদি সুযোগ পায় ভাইরাস দেহে প্রবেশ করেই বংশ বৃদ্ধি করতে আরম্ভ করে। এভাবে ৪/৫ দিন চলে তারপর রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে তবে রোগ কতটা তীব্র ও মারাত্মক হবে তা নির্ভর করে রোগীর শারীরিক ক্ষমতার উপর। রোগী যদি দুর্বল ও ক্ষীণদেহী হয় তবে রোগের পক্ষে তো সোনায়-সোহাগা। রোগ সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক হয়ে ওঠে। প্রথম ২/৩ দিন প্রবল জ্বর হয়। সারা দেহে গ্রন্থিতে ব্যথা হয়, কোমরেও প্রচণ্ড ব্যথা হয়। সারা দেহে ব্যথা এত তীব্র হয় যে রোগী ছটফট করে—এমন কি যন্ত্রণায় কেঁদে ফেলে। এই জন্যে এ জ্বরের আর এক নাম হাড়ভাঙ্গা জ্বর। জ্বরের প্রকোপ বেশী হলে মাথায় ব্যথা তীব্র হয়। জ্বর ২/৩ দিন পর কমে যায় অথবা ছেড়ে যায় কিন্তু ২/১ দিন পর আবার হয় জ্বরের তাপ ১০১ থেকে ১০৫ ডিগ্রী পর্যন্ত হতে পারে। রোগীর বমি বমি ভাব থাকে অথবা বমি হয়। দ্বিতীয়বার জ্বরের সময় মুখে, হাত-পা ও বুকে একপ্রকার চর্মরোগ দেখা দেয়। দেহের যে কোন জায়গায় গ্রন্থি বিশেষ করে গলার গ্রন্থি ফুলে উঠতে পারে এবং খুব ব্যথা হয়। জ্বরের তীব্র প্রকোপের সময় শিশু ও দুর্বল রোগীদের আক্ষেপ ও প্রলাপ, আচ্ছন্ন ভাব আসতে পারে এবং দুর্বল রোগীর মৃত্যু হতে পারে। আবার জ্বর যখন ছেড়ে যায় তখন তাপমাত্রা এত কমে যায় এবং রোগী এত আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে ঐ অবস্থায় রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

নিরাময়ের উপায়—রোগীর শরীরে উপরের লক্ষণগুলোর কিছু কিছু প্রকাশ পেলেই কালবিলম্ব না করে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে এবং রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি দেখা যায় ডেঙ্গু জ্বর তবে রোগীকে ভাইরাস মুক্ত করার জন্য ওষুধ খেতে হবে। পথ্য অন্যান্য জ্বরের অনুরূপ। যারা যোগ-ব্যায়ামের মাধ্যমে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা অটুট রাখে তাদের কোন রোগ-বীজাণু বা ভাইরাস এসে সহজে কাবু করতে পারে না।

ইনফ্লুয়েঞ্জা

বহু আগে ইতালীর লোকেরা মনে করতো যে এরোগ নক্ষত্রদের প্রতিক্রিয়ার ফলে পৃথিবীতে আসে—তাই ইতালীর ভাষানুযায়ী এ রোগের নাম ইনফ্লুয়েঞ্জা। এ রোগের ইতিহাসে দেখা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই এই রহস্যময় এবং মারাত্মক রোগে দশ লক্ষেরও বেশী লোক মারা যায়। এ রোগ বহুবার পৃথিবীর নানা অংশে মহামারী রূপে দেখা দিয়েছে। এ জ্বর যখন প্রথম এশিয়ায় দেখা দেয় তখন বলা হত এশিয়াটিক জ্বর। আগে কেউ জানতো না এরোগ ভাইরাস থেকে আসে। টিকা বা ভ্যাকসিন দিয়ে এরোগ সব ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করা যায় না—কারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস বহু রকমের আছে, তাদের চরিত্র আলাদা আবার একই ভাইরাস চরিত্র পালটাতে পারে।

ইনফ্লুয়েঞ্জাকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—১। সংক্রামক—অতি অল্প সময়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ২। আশেপাশে কিছুটা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ৩। অতি অল্প সময়ে রোগাক্রমণ ঘটে।

রোগের কারণ—ভাইরাস।

রোগের লক্ষণ—শরীরে অস্বস্তি বোধ, অক্ষুধা, সারা গায়ে বিশেষ করে কোমরে ব্যথা বমি বমি ভাব, মাথায় ব্যথা, যন্ত্রণা ও তারপর জ্বর। ঐ অবস্থায় চোখ লাল হয় এবং জল পড়তে থাকে। সর্দি-কাশি দেখা দিতে পারে, শ্বাসনালীতে প্রদাহ হতে পারে এবং নাড়ীর গতি দ্রুত হয়।

নিরাময়ের উপায়—কথায় আছে ইনফ্লুয়েঞ্জা চিকিৎসা করলে ৭ দিন লাগে আর না করলে এক সপ্তাহ লাগে। সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা আপনা থেকে সেরে যায় কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে। এ সময় অন্য ইনফেকসান হতে পারে। যেমন নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, ল্যারিঞ্জাইটিস প্রভৃতি। তাহলে রোগীর জীবন সংশয় দেখা দেয়, তাই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত যাতে রোগ অন্যদিকে ঘুরতে না পারে। রোগীকে আলাদা ঘরে রাখতে হবে, কারণ এ রোগ ভীষণ ছোঁয়াচে। আমি আগেই বলেছি যোগ-ব্যায়ামের মাধ্যমে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঠিক রাখতে পারলে এসব জীবাণু বা ভাইরাস সহজে রোগাক্রমণ ঘটাতে পারে না। **দেহ জীবাণুমুক্ত এবং একটু সুস্থ হলে আস্তে আস্তে যোগ-ব্যায়াম আরম্ভ করা যেতে পারে।**

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া জ্বর বিদেশ থেকে ভারতে এসেছে। এটি এক বহু প্রাচীন জ্বর। এ জ্বরের ইতিহাসে দেখা যায় বহু বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকার লোক আবিষ্কার করে যে সিনকোনা জাতীয় গাছের পাতা ও ডাল সিদ্ধ করে খেলে এ জ্বর থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যার ফলে আসে কুইনাইন। পরবর্তীকালে ভারতে এই কলকাতাতেই এক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী প্রথম আবিষ্কার করেন যে এনোফিলিস স্ত্রী জাতীয় মশা ম্যালেরিয়া বীজাণুর বাহক। প্রতিষেধক ব্যবস্থার ফলে ভারতে এরোগ প্রায় নির্মূল হয়ে গিয়েছিল কিন্তু অবহেলার ফলে অবার দেখা দিয়েছে। বহু ধরনের এনোফিলিস আক্রমণকারীদের মধ্যে ৬ জাতীয় আমাদের এখানে দেখা যায়—৫টি পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে এবং ১টি পাহাড়ী অঞ্চলে।

রোগের কারণ—ম্যালেরিয়ার বীজাণু যাকে বলা হয় প্রোটোজোয়া বা ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট। এরা ৫ ধরনের ম্যালেরিয়া জ্বর সৃষ্টি করতে পারে। ১। দিনে এক-বার জ্বর আসে ও ছাড়ে। ২। একদিন অন্তর জ্বর আসে ও ছাড়ে, মাঝে একদিন জ্বর থাকে না। ৩। দু দিন অন্তর জ্বর আসে ও ছাড়ে। ৪। সপ্তাহে একদিন জ্বর আসে ও ছাড়ে এবং ৫। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় জ্বর আসে ও ছাড়ে। এনোফিলিস স্ত্রী জাতীয় মশার দেহে এই বীজাণু ৫ থেকে ১৫ দিনের ভিতর পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং সে মশা কোন লোককে কামড়ালে তার দেহেও ৫ থেকে ১৫ দিনের ভিতর রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। বীজাণু যকৃৎ-এ আশ্রয় নেয় এবং বংশ বৃদ্ধি করতে থাকে। তারপর যখন রক্তে বের হয়ে আসে তখন শরীরে জ্বরের লক্ষণ দেখা দেয়।

ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ—প্রথমে সারা দেহে শীত শীত করে আর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। রোগী এত কাঁপতে থাকে যে সারা লেপ-কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেও কাঁপুনি বন্ধ হয় না, রোগী প্রলাপ বকতে থাকে এবং জ্বর বেড়েই চলে যতক্ষণ না পূর্ণ তাপমাত্রায় পৌঁছায়। তাপ ৩ থেকে ৫ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠতে পারে এবং তখন কাঁপুনি বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ণ জ্বর অবস্থায় রোগী গায়ে কিছু রাখতে চায় না—গা জ্বালা করে। কিছু সময় রোগী ঐ অবস্থায় থাকে তখন রোগীর মাথা দপ

দপ করে। বার বার জল খেতে চায়, বমি বা পিত্তবমি হতে পারে। জ্বর ছাড়ার সময় রোগী ভীষণ ঘামতে থাকে। বার বার গা মুছে দিতে হয়। জ্বর ছেড়ে গেলে রোগী ভীষণ অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং নির্জীবের মত শুয়ে থাকে।

সময়মত চিকিৎসা না আরম্ভ করলে রোগী দিনে দিনে ফ্যাকাসে হয়ে যায় কারণ বীজাণু রক্তের লোহিত কণিকা ধ্বংস করে দেয়, রক্তের হিমোগ্লোবিন নষ্ট করে দেয়। দীর্ঘদিন রোগে ভুগলে যকৃৎ বড় হয়ে যায়, প্লীহা বড় হয়ে যায়—প্লীহা প্রথমে বড় অবস্থায় নরম পরে শক্ত হয়ে যায় তখন রোগীকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ে, যকৃৎ খারাপ হয়ে যাওয়ায় জন্ডিস্ আসতে পারে। প্রস্রাব ঘন ও ঘোলাটে হয়ে যায় কিড্‌নীর প্রদাহ দেখা দিতে পারে। পা ফুলতে পারে। পায়খানা পাতলা ও বার বার হতে পারে ফলে দেহে প্রয়োজনীয় জল ও লবণের ঘাটতি দেখা দেয়। দেহে রক্ত কমে যাওয়ায় মেয়েদের ঋতুকালে রক্ত কমে যায়—বন্ধ হয়ে যেতেও পারে, গর্ভবতী মেয়েদের রক্ত শূন্যতার জন্য গর্ভপাত হতে পারে, দিন দিন দেহ অবসাদগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুদিন এগিয়ে আসতে থাকে।

নিরাময়ের উপায়—রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলেই একটুও দেরী না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে রক্ত পরীক্ষা করতে হবে—দেখতে হবে কোন জাতীয় ম্যালেরিয়া এবং সেইমত ওষুধ খেয়ে দেহ বীজাণুমুক্ত করতে হবে। সাধারণ জ্বরের ওষুধে হয়তো জ্বর কমতে পারে। কিন্তু ম্যালেরিয়া বীজাণু মরে না, একমাত্র ডাক্তারই বলতে পারবেন কোন ওষুধ, কত পরিমাণে, কত দিন খেতে হবে।

পথ্য—অন্যান্য জ্বরের অনুরূপ। জ্বর ছেড়ে গেলে খোলা জায়গায় সকাল-বিকাল যতক্ষণ সহজভাবে পারা যায় গভীরভাবে শ্বাস নিতে হবে এবং ছাড়তে হবে কারণ এসময় রক্তে অক্সিজেনের খুব অভাব দেখা দেয়।

পাশাপাশি বা একসঙ্গে যারা থাকে তাদের ডাক্তারের পরামর্শ মত ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ বড়ি প্রতি সপ্তাহে নিতে হবে।

নিউমোনিয়া

চিকিৎসকদের মতে আমাদের দেশে পাঁচ বছরের কম বয়েসের শিশুরাই—বিশেষ করে যারা সাধারণত কম ওজন নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, পনেরো থেকে কুড়ি শতাংশ প্রায় এ রোগের শিকার হয়—বয়স্কদের এ রোগ হয় না এমন নয় তবে তুলনায় কম। হাম জ্বরে যে সব শিশু মারা যায় তাদের বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই নিউমোনিয়া—ফুস্‌ফুসে প্রদাহ মৃত্যুর কারণ।

রোগের কারণ—জীবাণু, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ফুস্‌ফুসে আক্রমণ। আমাদের শ্বাসনালীর প্রবেশ মুখে যে বাগ্‌যন্ত্র (ল্যারিংস) আছে সে অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করে—সহজে কোন জীবাণু-ভাইরাস দেহে প্রবেশ করতে দেয় না, আর ঢুকে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে কাশির দ্বারা ঐ সব বীজাণু বাইরে বের করে দিতে চেষ্টা করে. কিন্তু কোন কারণে বাগ্‌যন্ত্র বা শ্বাসনালী যদি দুর্বল থাকে তবে জীবাণু, ভাইরাস প্রভৃতি সহজে ফুস্‌ফুসে গিয়ে বাসা বাঁধতে পারে। অসুস্থ ব্যক্তির কফের সূক্ষ্মকণা বাতাসে ভেসে এসে শ্বাসনালীর মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তির ফুস্‌ফুসে চলে যেতে পারে। যারা মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার না রাখে তাদের মুখে ময়লার সঙ্গে ঐ সব জীবাণু, ভাইরাস বাসা বেঁধে ওৎ পেতে বসে থাকে এবং সুযোগ পেলেই ফুস্‌ফুসে চলে যায়। দেহে যদি ফোঁড়া বা কার্বংকল হয় তার জীবাণু রক্তের মাধ্যমে সরাসরি ফুস্‌ফুসে

পেঁছতে পারে। দেখা যাচ্ছে নানা কারণে শরীরে নিউমোনিয়ার আক্রমণ আসতে পারে।

রোগের লক্ষণ—সমস্ত শরীরে এবং মাথায় ব্যথা, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, বুক ব্যথা করে. নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, জিভের ডগা, আঙুলের ডগা, ঠোঁট নীলচে হয়ে যেতে পারে—তাপমাত্রা চার-পাঁচ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। প্রথমে কাশিতে কিছুই থাকে না, পরে হলদে কফ এমন কি রক্তপুঁজও বের হতে থাকে, কারণ জীবাণুর আক্রমণে তখন ফুস্‌ফুস্‌ ও শ্বাসনালীতে ঘা বা ক্ষত দেখা দেয়। বুকে জল জমতে পারে। শিশুদের অনেক ক্ষেত্রে খিঁচুনি বা দমবন্ধ আরম্ভ হয়।

নিরাময় ও সাবধানতা—শিশুদের ক্ষেত্রে মায়েরা বেশ কিছু উপসর্গ লক্ষ করতে পারে। যেমন খাবারে অরুচি, ঘুমোতে চায় না, মাঝে মাঝে পেট ফুলে উঠতে পারে, বমি হয়, বার বার পায়খানা হয় ইত্যাদি। বাচ্চাদের যদি ট্রিপল অ্যান্টিজেন ইনজেকশন দেওয়া না থাকে তবে কালবিলম্ব না করে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত কারণ শিশুদের শরীরে রোগ খুব অল্প সময়ে জটিল হতে দেখা যায়। রোগীর শরীরে যেন কোনরকমে ঠান্ডা না লাগে এবং সহজপাচ্য পথ্যের ও জলের অভাব না ঘটে। শিশুদের নিউমোনিয়া রোগের জন্য মায়েরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দায়ী, মায়েরা যদি ব্যায়ামের মাধ্যমে নিজেদের সুস্থ রাখেন তবে শিশুরা কম ওজন ও স্বাস্থ্য নিয়ে পৃথিবীতে আসে না। আর একটা বিশেষ কারণ শিশুদের মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত রাখা।

কালাজ্বর

এ জ্বরে দেহের বর্ণাভা কালো হয়ে যায় তাই একে বলা হয় কালাজ্বর, বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ ও পাহাড়ী অঞ্চলে এ রোগ দেখা যায়।

রোগের কারণ—মশা-মাছির চেয়েও ক্ষুদ্র একপ্রকার কীটের বা পোকার কামড়ে এ রোগ সৃষ্টি হয়। এই ক্ষুদ্র পোকাকে বলা হয় স্যান্ডফ্লাই। অসুস্থ ব্যক্তির দেহ এই পোকার মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। কালা-জ্বরের বীজাণু দেহে প্রথমে প্লীহা, যকৃৎ ও কোষে বাসা বেঁধে বংশ বৃদ্ধি করে—পরে রক্তের মাধ্যমে সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সময়মত চিকিৎসা না হলে দেহে নানা জটিলতা দেখা দেয় এবং রুগীর মৃত্যু এগিয়ে আসে।

রোগের লক্ষণ—জ্বর সুরু হওয়ার পূর্বে শরীর অবসন্ন বোধহয়, জ্বর ১০২° ডিগ্রী থেকে ১০৩/৪° ডিগ্রী উঠতে পারে এবং ৯৯° ডিগ্রীতে নেমে আসে। দিনে ২/৩ বার জ্বর আসে ও যায়, জ্বরে জিভ পরিষ্কার থাকে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় কিন্তু হজম শক্তি কমতে থাকে। প্লীহা-যকৃৎ বড় ও শক্ত হতে থাকে এবং টিপলে ব্যথা লাগে। গায়ের রং কালো হয়ে আসতে থাকে, দেহ রক্তহীন ও চর্মসার হয়ে যায়। পেটের গন্ডগোল থাকে, রক্তবমি হতে পারে, খুস্‌খুসে কাশি থাকে, চামড়ায় ফুসকুড়ি বা ঘা হতে পারে, দাঁত ও মাড়ী থেকে রক্ত পড়তে পারে—দাঁত পড়ে যেতেও পারে, চুল পড়ে যায়। কিছুদিন জ্বরে ভুগলে ফুস্‌ফুস্‌ আক্রান্ত হয় এবং রোগীর শেষদিন এগিয়ে আসতে থাকে। এ সময় রোগীর হাত-পা ফুলতে থাকে।

নিরাময় ও সাবধানতা—যদিও খিদে খুব বেশী হয় কিন্তু বেশী খেতে নেই, খাবার সহজপাচ্য হওয়া চাই, জল ফুটিয়ে ঠান্ডা করে কাগজি বা পাতিলেবুর রস মিশিয়ে বারে

বারে খেতে হবে। রোগীকে মশা-মাছি থেকে দূরে রাখতে হবে। প্রথমে ডাক্তারের পরামর্শমত রোগীকে বীজাণুমুক্ত করতে হবে।

আমি আগেই বলেছি ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীর সবল ও সুস্থ রাখলে এ বীজাণু দেহে প্রবেশ করলেও রোগাক্রান্ত করতে পারে না।

মেনিনজাইটিস জ্বর

যে কয়েকটি মারাত্মক জীবন সংশয়কারী রোগ আছে মেনিনজাইটিস জ্বর তার মধ্যে অন্যতম। কখনো কখনো ব্যাপকভাবে শহর ও শহরতলীতে যেখানে বাতাসে ধোঁয়া বেশী ও বিশুদ্ধ বাতাসের অভাব, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় খুব অল্প সময়ে রোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং সব ঋতুতে এ রোগ হতে পারে। রোগটি এত দ্রুত দেহে ক্রিয়া করে যে রোগের লক্ষণ দেহে প্রকাশ পেলে সঙ্গে সঙ্গে যদি চিকিৎসা না হয় তবে রোগীর মৃত্যু অবধারিত।

রোগের কারণ—মেনিঙ্গোকক্কাস নামক এক জাতীয় বীজাণু খাদ্যনালী বা শ্বাস-নালী যে কোন পথে দেহে প্রবেশ করে রক্তে মেশে এবং বংশ বৃদ্ধি করে তারপর মস্তিষ্কের ও মেরুদণ্ডের বাইরের আবরণ (ঝিল্লী) আক্রমণ করে—যার ফলে ঐ সব অঞ্চলে জল জমতে আরম্ভ করে এবং প্রদাহ আরম্ভ হয়।

লক্ষণ—বীজাণু দেহে বাসা বাঁধলেই জ্বর আরম্ভ হয়ে তাপ বেশী উঠতে পারে, ফুসফুস আক্রান্ত হতে পারে, জ্বর ছেড়ে আবার জ্বর হতে পারে, মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা বা ব্যথা সুরু হয়, বমি না হলেও বমি ভাব থাকে। কোন কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। চামড়ায় ছোট ছোট লাল স্পট্ দেখা দিতে পারে। দেহের তাপমাত্রা দুই থেকে পাঁচ ডিগ্রী হতে পারে। বেশী তাপ বাড়লে রোগী প্রলাপ বকে ও মাঝে মাঝে চমকে ওঠে, অনেক সময় মাংসপেশীতে টান ধরে, তড়কা হয়, দেহ বেঁকে যেতে পারে, এ সময় দেহের যে কোন জায়গায় ধমনী, শিরা-উপশিরা ছিঁড়ে গিয়ে রোগী মারা যায়, এ রোগের বিশেষ লক্ষণ হলো ঘাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা ও যন্ত্রণা, ঘাড় বাঁকানো যায় না, কোমর ও হাঁটুর সন্ধিস্থলের ঠিক একই অবস্থা হয়—বাঁকানো যায় না, শক্ত হয়ে যায়, রোগীর অচৈতন্য ও কমার ভাব আসে, রক্তের চাপ খুব বৃদ্ধি পেলে রোগীর হার্টফেল হতে পারে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে কালবিলম্ব না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং সেইমত রোগীকে রাখতে হবে।

নিরাময় ও সাবধানতা—রোগীকে পৃথক ঘরে রাখতে হবে—শিশুদের সহজে এ রোগ আক্রমণ করতে পারে, জোর করে ঘাড়, হাত-পা বাঁকানো চলবে না, তাপ খুব বেশী হলে মাথায় জলপটি বা আইসব্যাগ দিতে হবে, বারে বারে অল্প পরিমাণে পথ্য ও জল দিতে হবে—দেহের জলের যেন অভাব না হয়। পথ্য অন্যান্য জ্বরের মত। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কোন রকম কঠিন ব্যায়াম করা ঠিক না। সকাল-সন্ধ্যায় সহজ প্রাণায়াম খুব ভালো কাজ করে।

২২। হুপিংকাশি

গ্রীষ্ম-প্রধান গরীব দেশে এ রোগের আক্রমণ বেশী হয়। এই কাশির আক্রমণে দশ থেকে পনেরো শতাংশ শিশু এক বছরের মধ্যে মারা যায়। অপুষ্টিজনিত ভগ্নস্বাস্থ্য শিশুরাই এ রোগের শিকার। পারটুসিস্ নামক এক প্রকার জীবাণুর আক্রমণে এ রোগ হয়।

কারণ—শিশুদের অপুষ্টিজনিত রোগ বা ভগ্নস্বাস্থ্যে পারটুসিস্ জীবাণুর আক্রমণ।

লক্ষণ—রোগের প্রথমদিকে শিশুর নাকের প্রদাহজনিত জ্বালা, নাক দিয়ে জল পড়া, চোখ লাল, অল্প অল্প কাশি—এই সামান্য উপসর্গে ভোগার পর সাত দিনের মধ্যে শুরু হয় "হুপিং কাশি"। বাচ্চার হঠাৎ দমফাটা ভীষণ কাশি আরম্ভ হয়, কাশতে কাশতে শেষে বমি হয়—হয় তো বমিতে শেষের দিকে শুধু একটু জলীয় পদার্থ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না—দীর্ঘ নিশ্বাসের পর কাশি বন্ধ হয়ে যায়—শিশু নির্জীব, অবসন্ন হয়ে পড়ে। দিনে-রাতে ৫০-৬০ বার এ কাশি হতে পারে। কাশির দাপটে ও খিঁচুনিতে রোগীর ধমনী, শিরা-উপশিরা ছিঁড়ে গিয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে। রোগী দুর্বল হয়ে গেলে শেষের দিকে বুকে ঘড় ঘড় শব্দ হয়, হামের মত অপুষ্টিজনিত উপসর্গ আরও বৃদ্ধি পায়। শিশুর স্বাস্থ্যানুযায়ী কাশির তীব্রতা আস্তে আস্তে কমে তবে সুস্থ হতে বেশ সময় নেয়।

নিরাময় ও সাবধানতা—শিশুর অভিভাবকদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকা উচিত। রোগীর কাছ থেকে অন্য শিশুদের দূরে রাখতে হবে—কারণ রোগটি ভীষণ ছোঁয়াচে। রোগীর বুকে ও গলায় কোনরকম ঠাণ্ডা না লাগে—সহজপাচ্য তরল পথ্য ও জলের অভাব না হয়। এই প্রসঙ্গে মায়েদের ও ভাবী মায়েদের বিশেষ করে মনে রাখা দরকার শিশুর জন্মের ছয় সপ্তাহ বয়স থেকে পাঁচ-ছয় সপ্তাহ অন্তর অন্তর পর পর তিনটি ট্রিপল অ্যান্টিজেন ইনজেক্শন দিতে হবে এবং এক থেকে দেড় বছর বয়সের মধ্যে আর একটা বুস্টার ইনজেক্শন দিতে হবে। এই প্রতিরোধ ইনজেক্শনে শিশুর দেহে শুধু ডিপথেরিয়া-টিটেনাস রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে না সঙ্গে হুপিং কাশিরও। মায়েরা ব্যায়ামের মাধ্যমে নিজেকে সুস্থ রেখে শিশুকে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

যে শিশু কোন সংক্রামক রোগে ভুগছে, একজিমা জাতীয় কোন রোগে ভুগছে বা শিশু ষ্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ খাচ্ছে বা কোন স্নায়ুজনিত কোন রোগে ভুগছে এমন শিশুদের রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত এই অ্যান্টিজেন টীকা দেওয়া হয় না।

২৩। মূর্ছা, হিস্টিরিয়া, মৃগী ও সন্ন্যাস রোগ

মূর্ছা ঠিক রোগ নয়। মনের দুর্বলতা অথবা দেহের নানা রোগের বহিঃপ্রকাশ বলা যেতে পারে।

রোগের কারণ—স্নায়বিক দুর্বলতা (যেমন অনেকক্ষণ চেয়ারে বসে থেকে হঠাৎ উঠতে গেলে মাথা ঘুরে পড়ে মূর্ছা), হঠাৎ প্রচণ্ড মানসিক আঘাত (যেমন অতি প্রিয় জনের মৃত্যু সংবাদ অথবা এমন কোন সংবাদ যা তার জীবন-মরণ সমস্যা), হৃদরোগ, মৃগীরোগ, হিষ্টিরিয়া, সন্ন্যাসরোগ, দেহ থেকে প্রচুর রক্তপাত, প্রচণ্ড গরম (যা রোগীর পক্ষে অসহ্য), দেহে বিষাক্ত পদার্থের প্রবেশ ইত্যাদি আবার এমনও কোমল ও দুর্বল চিত্তের লোক আছে যারা পশু-পাখী কাটার রক্ত, মানবদেহে অস্ত্রোপচারের রক্ত দেখলেই মূর্ছা যায়। এজাতীয় মূর্ছা এমন কিছু নয় স্মেলিং সল্ট, এ্যামিল নাইট্রেট, ভিকস্-ভেপোরাস জাতীয় কিছু নাকে লাগিয়ে দিলে বা ব্লটিং পেপার অথবা শুকনো হলুদ পোড়া ধোঁয়া নাকে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসে। চোখে-মুখে, কপালে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিলেও ভাল কাজ হয়। স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য মূর্ছা গেলে মাথায় কিছু না দিয়ে পায়ের দিকটা একটু উঁচু করে শুয়ে দিলে অল্পক্ষণের মধ্যে

মাথায় রক্ত এসে যাবে এবং রোগীও জ্ঞান ফিরে পাবে। হিস্টিরিয়া-জনিত মূর্ছাও এমন কিছু নয়—একটু পরেই ঠিক হয়ে যায়। মৃগীরোগ-জনিত মূর্ছা আপতঃ জীবন সংশয়কারী নয় যদি না রোগী আগুনে বা জলে পড়ে যায়—লক্ষ্য রাখতে হবে দাঁতের মাঝে যেন জিব না থাকে। কিন্তু প্রচন্ড মানসিক আঘাত, হৃদরোগ বা সন্ন্যাস রোগ-জনিত মূর্ছা মারাত্মক এবং জীবন সংশয়কারী। করোনারী বা সেলিব্র্যাল থ্রম্বোসিস হতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মৃত্যু হতে পারে—হারানো জ্ঞান আর ফিরে আসে না। অথবা রোগীর আংশিক বা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত হতে পারে।

হিস্টিরিয়া—হিস্টিরিয়া কোন দৈহিক রোগ নয়—মানসিক রোগ বা উপসর্গ বলা যেতে পারে।

রোগের কারণ—প্রত্যক্ষ কারণ কঠিন স্নায়বিক ও মানসিক দুর্বলতা। পরোক্ষ কারণ—অতৃপ্ত কামনা-বাসনা, মনের দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা দীর্ঘকাল চেপে রাখা, দীর্ঘদিন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, জীবনে হতাশা প্রভৃতি নানা কারণে হিস্টিরিয়া হতে পারে। ১৯/২০ বছর থেকে ৩৫ বছরের অবিবাহিতা বা বিধবা মহিলাদের এরোগ বেশী দেখা যায়। ছেলেদেরও হতে পারে তবে সংখ্যায় খুব কম। মেয়েদের হিস্টিরিয়া-জনিত মূর্ছার সময় একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে তারা যখন একা থাকে তখন এ উপসর্গ দেখা দেয় না—তার এ রোগ দেখা দেয় তাদের সান্নিধ্যে যাদের কাছ থেকে সে প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, মায়ামমতা, সহানুভূতি বিশেষভাবে আশা করে। তাদের উপস্থিতি সত্বেও যখন সে তার আকাঙ্ক্ষিত ব্যবহারটি না পায় তখন তার ক্ষুব্ধ মন আরো ক্ষুব্ধ হতে থাকে শেষে জ্ঞান হারায় ও মূর্ছা যায়। এই অচৈতন্য অবস্থাতেও কিন্তু রোগী সম্পূর্ণ জ্ঞান হারায় না—তার প্রিয়জনেরা তার প্রতি কতটা মনযোগ দিচ্ছে সম্পূর্ণ না পারলেও অনেকটা সে বুঝতে পারে। কোন মেয়ে যদি তার ভালোবাসার পাত্রকে না পায় এবং অন্য লোকের সঙ্গে তার বিয়ে হয় তবে তার বিয়ের কিছুদিনের মধ্যে এরোগ দেখা দিতে পারে।

রোগের লক্ষণ—মূর্ছা যাবার আগে রোগীর মানসিক বিকার দেখা দেয়—হাসে, কাঁদে, নানা অঙ্গভঙ্গি করে, গান গায়, অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে, নিজের চুল ছিঁড়তে থাকে এমন কি দেওয়ালে বা দরজায় মাথা খুঁটতে দেখা যায়। মূর্ছা যাবার পর দেহে খিঁচুনি আরম্ভ হয়, হাত-পা ছুঁড়তে থাকে, হাতের তালু বন্ধ করে রাখে, মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ হতে পারে। হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্ত মেয়েদের মাসিক ও পেটের গন্ডগোল থাকবেই।

মূর্ছা অবস্থায় হাত-পা ছোঁড়ার সময় যাতে চোট না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, স্মেলিং সল্ট বা ঐ জাতীয় কিছু নাকে দিলে, অথবা ব্লটিং পেপার বা শুকনো হলুদ পোড়া ধোঁয়া নাকের কাছে ধরলে রোগী অল্প সময়ে জ্ঞান ফিরে পায়, রোগীর চোখ, মুখ, কপাল, হাত-পা ঠান্ডা জল দিয়ে বারে বারে মুছে দিতে হবে।

রোগ নিরাময়ের উপায়—অভিভাবক বা আত্মীয়স্বজনদের রোগের কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং সেইমত ব্যবস্থা নিতে হবে। যাঁরা কর্মব্যস্ত জীবনযাপন করে তাদের মধ্যে প্রায়ই এ উপসর্গ দেখা যায় না। অলস-জীবন হিস্টিরিয়ার বিচরণভূমি, কি কারণে রোগী স্নায়বিক দুর্বল সে কারণ দূর করতে হবে কারণ বিশুদ্ধ রক্ত যদি দেহ পায় আর স্নায়ুজাল যদি সবল ও সতেজ থাকে তবে এ রোগ সহজে তার কাছে আসতে পারে না। রোগীর প্রতি সবার সহানুভূতিশীল হতে হবে এবং যে কোন কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে এবং রোগীর কয়েকটি যোগ-ব্যায়াম যেমন পদ-হস্তাসন, অর্ধ-চক্রাসন হলাসন, জানুশিরাসন, চক্রাসন, অর্ধ-কূর্মাসন, সর্বাংগাসন প্রভৃতি যাতে পেট

ও বস্তিপ্রদেশের ভাল ব্যায়াম হয়—সঙ্গে সহজপাচ্য খাবার খেতে হবে যাতে পেটের গণ্ডগোল না থাকে।

মৃগী রোগ—এ রোগ আপাত জীবন সংশয়ী হলেও (আমি আগেই বলেছি যদি রোগী আগুনে, জলে না পড়ে বা মাথায় প্রচণ্ড চোট না পায়) দীর্ঘদিন পরে কিন্তু রোগী অবসাদগ্রস্ত হয়ে, দেহে জড়ত্ব এসে যায় এবং আরো নানা জটিলতা দেখা দেয়। রোগের লক্ষণ দেখা দিলেই সতর্ক হলে এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, বিশুদ্ধ রক্তের অভাবে আমাদের হৃৎপিণ্ড, রক্তবাহী ধমনী, শিরা-উপশিরা যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারায়, একমাত্র তখনই এ রোগ আমাদের দেহে আসার সুযোগ পায়। সংবেদিয় (Afferent or Sensory Nerve) স্নায়ু এবং চেষ্টিয় (Efferent or Motor Nerve) স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্ক আমাদের দেহ পরিচালনা করে অর্থাৎ দেহের কোথায় কি হচ্ছে, কি দরকার সব খবর আদান-প্রদান করে। যে কোন কারণে মস্তিষ্কে যদি বিশুদ্ধ রক্তের প্রচণ্ড অভাব ঘটে তখনই এ রোগ দেখা দিতে পারে। তাহলে দেখতে হবে যাতে দেহে বিশুদ্ধ রক্তের অভাব না হয়, অর্থাৎ পাচনতন্ত্র ও পরিপাক-ক্রিয়া, রেচনতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র এবং রক্ত-সংবহনতন্ত্র সুস্থ, সবল এবং কর্মক্ষম রাখতে হবে এবং তার একমাত্র পথ হচ্ছে প্রয়োজনমত কয়েকটি যোগ-ব্যায়াম অভ্যাস রাখা, কারণ অন্য কোন ব্যায়ামে দেহ-অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলির ঠিকমত ব্যায়াম হয় না।

রোগের লক্ষণ—রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে মূর্ছা যায় কিন্তু তার আগে সে বুঝতে পারে, তখন আর নিরাপদ স্থানে সাবধান হবার সুযোগ থাকে না। অজ্ঞান হওয়ার আগে রোগীর মাথা ঘোরে, কানে শব্দ হয়, গা কাঁপতে থাকে, মাথা ঝিম ঝিম করে, অনেক সময় মনে হয় গায়ে ছুঁচ ফুটছে, কোন কিছু পেট থেকে উপরে উঠে দম বন্ধ করে দিচ্ছে, রোগী অজ্ঞান হবার পর হাতের আঙ্গুল বা হাত বেঁকে যায়, ঘাড় শক্ত হয়ে যায়, মুখ প্রথমে ফ্যাকাসে তারপর লাল হয়ে যায়। হাত-পা ছুঁড়তে থাকে, ঠাণ্ডা ঘাম হতে থাকে, মুখ দিয়ে গাঁজলা ওঠে, দাঁতে দাঁত লেগে যায়, এবং চোখ উপর দিকে উঠে যায় প্রভৃতি। এ রোগ প্রথম প্রথম সহজভাবে আসে যেমন রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয় না। মুখের বিকৃতি কিছুটা হয়, খিচুনি হয় না কেবল কাজ ও কথা বলা কিছুক্ষণ বন্ধ হয়ে রোগী আধা-অচৈতন্য অবস্থায় থাকে। আবার দেখা গেছে সব কিছু ঠিক আছে কেবল দেহের বিভিন্ন জায়গায় খিচুঁনি হচ্ছে। মৃগীরোগ থেকে সতর্ক হলে মুক্তি পাওয়া যায় কিন্তু সন্ন্যাস রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া প্রায় অসম্ভব—মৃত্যু অথবা আংশিক বা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত। মৃগীরোগে যেমন খিচুঁনি হয় সন্ন্যাস রোগে তা হয় না, সন্ন্যাস রোগে প্রচণ্ড রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, শিরা ধমনী ছিঁড়ে যায়। রক্তক্ষরণ হয়ে মৃত্যু। অজ্ঞান হলে আর জ্ঞান ফেরে না—আর ফিরলেও সঙ্গে থাকে আংশিক অথবা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত।

আংশিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলে চিকিৎসা সম্ভব যদি উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ পাওয়া যায়। আক্রান্ত স্থানে ম্যাসেজ এবং মৃদু ব্যায়াম। আইয়োডেক্স ও ইউথেরা দিয়ে ম্যাসেজ নিলে ভাল কাজ হয়। ম্যাসেজের আধ-ঘণ্টা পরে রোগীকে ঠাণ্ডা ও গরম জলে কমপ্রেস্ করতে হবে। রোগীকে সহজপাচ্য খাবার দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে রোগীর হজমশক্তি ঠিক আছে কিনা এবং পায়খানা পরিষ্কার হয় কিনা। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ভিটামিন B. Complex, Beplex Forte, Beco-Sules, Neurobia জাতীয় ওষুধ অবশ্যই নিতে হবে। কোন ওষুধ, কতটা, কতদিন নিতে হবে একমাত্র ডাক্তারের পক্ষে বলা সম্ভব। তবে ম্যাসেজ বা মালিশ অবশ্য প্রয়োজন।

২৪। পক্ষাঘাত

সম্পূর্ণ শরীর বা শরীরের কোন অংশ যখন অনুভূতিহীন এবং অবশ হয়ে যায় তখন পক্ষাঘাত বলা হয়।

পক্ষাঘাত নানা ধরনের হতে পারে যেমন মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত এতে চোখ, মুখ, জিহ্বা, নাক প্রভৃতি জায়গা অনুভূতিহীন বা অবশ হয়ে যায়। মুখ একদিকে বেঁকে যেতে পারে। দেহের উপরাংশ অথবা নিম্নাংশ অনুভূতিহীন বা অবশ হয়ে যেতে পারে। হাত, পা, পিঠ, মেরুদণ্ড যে কোন জায়গায় পক্ষাঘাত হতে পারে, আবার সম্পূর্ণ দেহ হয়তো পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। বেশী বয়সে সাধারণত এ ধরনের পক্ষাঘাত হয়। শিশুদেরও পক্ষাঘাত হতে পারে।

কারণ—সম্পূর্ণ দেহের অথবা দেহের অংশবিশেষ অঞ্চলের স্নায়ুজাল অকেজো হয়ে যায়। আমাদের দেহের গতি, অনুভূতি প্রভৃতি কাজগুলি মস্তিষ্ক পরিচালনা করে স্নায়ুজালের মাধ্যমে। যদি দেহের সব অঞ্চলে বা কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে ঐ স্নায়ুজাল অকেজো হয়ে যায় তবে দেহের সর্বত্র বা অঞ্চল বিশেষ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়। আবার পক্ষাঘাত দেহে বীজাণু-ভাইরাস থেকে হতে পারে—এ ধরনের পক্ষাঘাত মারাত্মক, একবার যদি বীজাণু বা ভাইরাস হৃদযন্ত্র আক্রমণ করতে পারে তবে রোগীর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। আমার জানা দু'টি ক্ষেত্রে ভাইরাসজনিত পক্ষাঘাত আমি দেখেছি ভারতের প্রথম শ্রেণীর হাসপাতালে নিয়ে রোগীদের কোন উপকার হয়নি। বছরের পর বছর বিছানায় পড়ে রয়েছে। তাই পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পেলেই ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানো অবশ্য দরকার—দেখতে হবে কোন ধরনের পক্ষাঘাত। দেরী হলেই রোগ নাগালের বাইরে চলে যাবে—তখন আর চিকিৎসকের কিছু করার থাকে না।

স্নায়বিক পক্ষাঘাত নিরাময়ের উপায় আমি সন্ন্যাস রোগে আলোচনা করেছি।

২৫। বসন্ত

বসন্ত রোগ সাধারণতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—১। জল বসন্ত (Chicken Pox), ২। গুটি বসন্ত (Small Pox)।

জল বসন্ত একপ্রকার ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হয়। শীতকালের শেষের দিকে এবং বসন্তকালে এ রোগ দেখা দেয়। রোগটি এত ছোঁয়াচে যে প্রায় এপিডেমিক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। জল বসন্ত যদিও মারাত্মক নয়, তবে ভীষণ কষ্টদায়ক এবং বিরক্তিকর।

জল বসন্ত আবার দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—সাধারণ এবং জটিল। সাধারণ জল বসন্তের আগে গায়ে ব্যথা হয় এবং ১০০/১০১ ডিগ্রি মত জ্বর হয়, গুটি বের হয়ে গেলে জ্বর থাকে না। গুটি বেশী বের হয় না এবং গুটিগুলি জলে ভর্তি থাকে। ২/৩ দিন পর গুটি শুকোতে আবার একটু জ্বর আসতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে গুটি যেন গলে না যায়—গলে গেলে ঘা ও যন্ত্রণা হয়। ৭/৮ দিনে গুটি শুকিয়ে খোসা পড়ে যায় এবং ক্রমে দাগ মিলিয়ে যায়। জল বসন্তের জটিল অবস্থার লক্ষণ—গুটি বের হওয়ার আগে কোমরে, গাঁটে গাঁটে কম-বেশী দেহের সব জায়গায় ব্যথা হয়। তারপর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর সুরু হয় এবং জ্বর ৪/৫ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠতে পারে। গুটি সম্পূর্ণ বের না হওয়া পর্যন্ত জ্বর কমে না, ভাইরাস যদি মস্তিষ্কে আক্রমণ করে তবে রোগী জ্বরের সময় প্রলাপ বকে অথবা নিস্তেজ আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকে। ২/৩ দিনের মধ্যে সারা গায়ে গুটি বের হয়, গুটিগুলি আকারে একটু বড় এবং উপরের দিক

সরু হয়, জলে ভর্তি হয়ে যায়। ভাইরাস যদি ফুস্‌ফুসে আক্রমণ করতে পারে তবে বুকে নানা জটিলতা দেখা দেয়। লক্ষ্য রাখতে হবে কোন গুটি যেন গলে না যায়। গলে গেলে ভীষণ যন্ত্রণা ও ব্যথা এবং ঘা হয়। ৩/৪ দিন পর থেকে গুটি শুকোতে আরম্ভ করে ৮/১০ দিনের মধ্যে গুটি শুকিয়ে খোসা পড়ে যায় ক্রমে দাগও মিলে যায়। গুটি শুকানোর সময় আবার জ্বর আসতে পারে।

গুটি বসন্ত (Small Pox)—এ জাতীয় বসন্ত ভীষণ ছোঁয়াচে এবং মারাত্মক। অল্প সময়ের মধ্যে এপিডেমিক আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং শত শত লোকের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। গো-বসন্তের সঙ্গে এর মিল আছে—তাই আক্রান্ত গরু থেকে বীজ এনে টীকা দেওয়া হয়। নিয়মিত টীকা নিলে এরোগ থেকে দূরে থাকা যায়। এ জাতীয় বসন্তের ভাইরাস এত সূক্ষ্ম যে সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় না এমন কি ফিল্‌টার পেপারের ভিতর দিয়েও গলে যেতে পারে। গুটি বসন্ত ও শীতের শেষে বসন্তকালে দেখা যায়। এর ভাইরাস দেহে প্রবেশ করার পর বেশ কয়েকদিন বংশ বিস্তার করে, তবে ১২ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। এ জাতীয় বসন্তও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—তার ভিতর মারাত্মক হচ্ছে যুক্ত-বসন্ত এবং চাপা (Suppressed) বসন্ত। গুটি বের হওয়ার আগে মাথা ধরে, চোখ-মুখ লালচে হয়, দেহের প্রায় সব জায়গায় প্রচণ্ড ব্যথা হয় তারপর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আরম্ভ হয়, জ্বরের সঙ্গে কাশিও থাকতে পারে। গলায় ব্যথা হয়। জ্বর ১০২ ডিগ্রী থেকে ১০৫ ডিগ্রী পর্যন্ত ওঠে। ভাইরাস যদি মগজ আক্রমণ করতে পারে তবে রোগী প্রলাপ বকে অথবা আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকে এমন কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধও থাকে না। তারপর ২/৩ দিন পর গুটি বের হতে সুরু করে। প্রথমে মুখে হাত-পায়ের নিচের অংশে তারপর দেহের সব জায়গায়। গুটি যদি চোখের ভিতর বের হয় তবে চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অপারেশন করেও চোখকে বাঁচানো সম্ভব নাও হতে পারে। ১০ থেকে ১৫ ঘণ্টার মধ্যে সব গুটি বের হয়ে যায় তখন জ্বর আস্তে অস্তে বন্ধ হয়ে যায়। এ জাতীয় বসন্তের গুটিগুলি প্রথমে জলভরা মত দেখালেও কিন্তু ভিতরে জল থাকে না। হাত দিলেই মনে হবে শক্ত—ভিতরে জল নেই। গুটির উপরটা চাপা ও টোল খাওয়া। গুটি ওঠার ২/৩ দিন পর গুটিগুলি পাকতে সুরু করে এবং ভিতরে পুঁজ হয় এবং পুঁজের দূষিত অংশের কিছুটা রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে পারে তখন দেহে নানা জটিলতা দেখা দেয়—রোগী মারাও যেতে পারে। কোন জটিলতা না দেখা দিলে ৩/৪ দিনের মধ্যে শুকোতে আরম্ভ করে এবং এ সময় আবার জ্বর হতে পারে। ৩ সপ্তাহের মধ্যে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে এবং গুটির খোসা পড়ে যায়, কিন্তু গর্ত ও দাগ থেকে যায়। প্রায়ই দেখা যায় এ দাগ ও গর্ত আজীবন থাকে। এখন যুক্ত এবং চাপা গুটি বসন্ত সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। এজাতীয় গুটি বেশ কয়েকটি একসঙ্গে যুক্ত থাকে এবং গুটি পেকে ওঠার পূর্বে ঐ সব জায়গা ফুলে ওঠে। লাল হয়, প্রচণ্ড যন্ত্রণা এবং জ্বর হয়—শেষে ঐ সব জায়গায় ঘা হয়। এসময়ে রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

চাপা (Suppressed) গুটি বসন্তের গুটি ত্বকের উপরে বেশী বের হয় না। ত্বকের নিচে কাজ আরম্ভ হয়। দেহের প্রায় সব যন্ত্র এবং ত্বকের নিচে ভাইরাস আক্রমণে রক্ত ঝরতে আরম্ভ করে, চোখ, মুখ, কান, মূত্রনালী এবং মলদ্বার থেকে রক্ত বের হতে পারে। রক্তে অত্যধিক বিষক্রিয়ার ফলে রোগীর হার্টফেল করতে পারে। এক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সব গুটি যাতে বের হয়ে আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জাতীয় বসন্ত প্রায় জীবনে দুবার হয় না। গুটি লক্ষ্য করলে এবং শরীরের লক্ষণাদি দেখলে জল-বসন্ত ও গুটি বসন্তের পার্থক্য বুঝা যায়।

জল বসন্ত—গুটি দেহের সব জায়গায় হতে পারে তবে মুখে-হাতে-পায়ে কম দেখা যায়, গুটিতে জল ভর্তি থাকে, কম জ্বর হয় এবং গুটি বের হলে জ্বর চলে যায়, ঘা হয় না তবে গুটি গলে গেলে ঘা, যন্ত্রণা ও ব্যথা হয়। ৮/৯ দিন গুটি শুকিয়ে যায় এবং খোসা পড়ে যায়। কিছুদিন পর কোন দাগ থাকে না। অন্য কোন জটিলতা না থাকলে জল বসন্ত মারাত্মক বা জীবন-সংশয় রোগ নয়।

গুটি বসন্ত—পাছায়, হাত-পায়ের নিচের অংশে এবং মুখে বেশী গুটি দেখা দেয়। গুটির মধ্যে জল থাকে না, হাত দিলে শক্ত মনে হবে। গুটির মুখটা সরু, চ্যাপটা এবং টোল খাওয়া থাকবে, গুটি বের হওয়ার পূর্বে প্রচণ্ড গায়ে ব্যথা, গলা ব্যথা, মাথাধরা প্রভৃতি উপসর্গ সহ কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসবে এবং জ্বর ৪/৫ ডিগ্রীও উঠতে পারে। গুটিতে পুঁজ হয়, এবং গুটি শুকিয়ে খোসা পড়ে গেলে গর্ত ও দাগ থেকে যায়, সহজে মিলিয়ে যায় না—এমন কি আজীবন থাকতে পারে। গুটি বসন্ত মারাত্মক ও জীবন সংশয়কারী। আরোগ্য হতে ৩ সপ্তাহ অথবা তার বেশী সময় লাগতে পারে।

একটা বিষয় জেনে রাখা উচিত ওষুধ খেয়ে বা অন্য কোনভাবে গুটি ওঠা বন্ধ করে দেওয়া ঠিক নয়—দিলে ফল মারাত্মক।

বসন্ত রোগে কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে—রোগীকে আলাদা ঘরে মশারির মধ্যে রাখতে হবে। বিছানার উপর কলাপাতা বিছিয়ে, নিমপাতা ছড়িয়ে দিলে ভালো হয়—যদি সম্ভব না হয় তবে অয়েল ক্লথের উপর রোগীকে রাখতে হবে, ঘষা লেগে যেন গুটি গলে না যায়, দুর্বল-অসুস্থ লোক বা শিশু রোগীর ধারে-কাছে না আসে। রোগীর জামা-কাপড়, বিছানার চাদর, বালিশের কভার রোজ সোডা দিয়ে ফুটিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। গুটি সম্পূর্ণ না উঠলে সামান্য গরম জলে নরম তোয়ালে ভিজিয়ে দিনে ২/৩ বার স্পঞ্জ করতে হবে। ঘরের মেঝে দুবেলা ফিনাইল বা লাইজল দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। ব্লিচিং পাউডার না দেওয়াই উচিত—রোগীর ক্ষতি হতে পারে, রোজ দু'বেলা উচ্ছে বা করোলা বা কাঁচ নিমপাতার রস চা চামচের ৫/৬ চামচ দিতে হবে, খাবার হালকা এবং সহজপাচ্য হওয়া চাই—কোন রকমে অজীর্ণ-কোষ্ঠকাঠিন্য না আসে। গুটির খোসা ওঠার সময় সাবধান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন—খোসা ভাইরাসে ভর্তি থাকে। শিশি-বোতলে ছিপি দিয়ে রাখলে ভালো হয়। রোগমুক্ত হওয়ার পর রোগীর জামা-কাপড়, গুটির খোসা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যদি প্রবল জ্বর হয় তবে মাথায় আইস ব্যাগ দিতে হবে এবং ঠাণ্ডা জলে নরম তোয়ালে ভিজিয়ে স্পঞ্জ করতে হবে। জ্বর অবস্থায় গরম পাতলা দুধ, গ্লুকোজ, মিষ্টি ফলের রস এবং প্রটিনেক্স জাতীয় কিছু পথ্য দিতে হবে। জ্বর ছেড়ে গেলে হাফ-বয়েল ডিম বা ডিমের পোচ, চর্বিহীন মাংসের সুপ, ভাত, কাঁচ মাছের ঝোল, ডাল, তরকারি দেওয়া যেতে পারে। একটু শরীরে শক্তি আসলে সুখাসন, শবাসন এবং ভ্রমণ-প্রাণায়াম করতে হবে। পরে অন্য সব প্রয়োজনানুযায়ী আসন।

২৬। প্লেগ

প্লেগ মারাত্মক এবং সংক্রামক রোগ। রোগ এত সংক্রামক যে কয়েকদিনের মধ্যে একটি শহর বা গ্রাম উজাড় করে দিতে পারে। এ রোগ ইঁদুর থেকে আসে, ইঁদুরের গায়ে এক প্রকার কীট বা পোকা হয় এবং প্রথমে ইঁদুরে মহামারী আরম্ভ হয়। ঐ পোকা বা কীট আক্রান্ত বা মরা ইঁদুরের রক্ত খেয়ে মানুষকে কামড়ায় তখন মানুষ আক্রান্ত হয় এবং এভাবে মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়। এ কীট মেঝে বা মাটিতে থাকে তাই মানুষের পায়ে আক্রমণ করার সুযোগ পায়। চিকিৎসকরা সংক্রামিত এলাকায় প্রত্যেককে মোজা পরে থাকার পরামর্শ দেন।

রোগীর লক্ষণাদি ভালভাবে লক্ষ করলে প্লেগ-রোগ কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করা যায়। যেমন, আন্ত্রিক প্লেগ—এতে বীজাণু পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদ্রান্ত্র প্রভৃতি অন্ত্রগুলি ক্ষত-বিক্ষত করে—ফলে রক্তবমি, পেটে প্রচণ্ড ব্যথা, মূত্রনালী ও মলদ্বারে রক্তস্রাব হয়। এই সব উপসর্গগুলি দেখা দিলে রোগী প্রায়ই বাঁচে না।

নিউমোনিয়া জাতীয় প্লেগ—এ জাতীয় বীজাণু ফুস্‌ফুস্‌ আক্রমণ করে—রক্তবমি হয়, ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া দেখা দেয়। রোগী প্রায় বাঁচে না।

সেপটিক্‌ প্লেগ—এ জাতীয় প্লেগ রক্তে মিশে রক্তের লোহিতকণিকা, শ্বেতকণিকা প্রভৃতি যাবতীয় সারবস্তু নষ্ট করে দেয়, রক্তে পচন ধরে—ফলে সব দেহযন্ত্র বিকল হয়ে যায়, রোগীর মৃত্যু হয়।

গুটি জাতীয় প্লেগ—এ জাতীয় দেহে স্ফোটক বা গুটি বের হয় বিশেষ করে যে সব জায়গায় গ্রন্থি আছে, প্রবল জ্বর হয়। গ্রন্থি ফুলে ওঠে, গুটিগুলি পেকে ফোঁড়া হয়, ফোঁড়াগুলি পেকে যদি পুঁজ বের হয়ে যায় এবং সঙ্গে জ্বর কমে যায় তবে সুলক্ষণ—রোগী বেঁচে যায়।

সংক্রামিত এলাকায় কারো দেহে উপরোক্ত যে কোন একটি লক্ষণ প্রকাশ পেলে বা সন্দেহ হলে একটুও দেরি না করে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত কারণ প্লেগ, বসন্ত, কলেরা, ডিপথিরিয়া আজকাল আর দুরারোগ্য রোগ নয়, সময়ে ধরা পড়লে চিকিৎসা সম্ভব। তবে প্রায়ই দেখা যায় রোগীকে যখন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তখন বেশ দেরী হয়ে গেছে, ইংরাজিতে যাকে বলা হয় "ইট ইজ টু লেট"। ডাক্তারের আর প্রায় কিছু করার থাকে না। এরোগ ভীষণ মারাত্মক এবং সংক্রামক। তাই রোগীকে হস্‌পিটালে রাখাই যুক্তিযুক্ত।

প্লেগ রোগী শুশ্রূষাকারীদের অবশ্যই প্লেগ ভ্যাকসিন নিয়ে রাখা উচিত। তাছাড়া সংক্রামিত এলাকায় প্রত্যেকের এই ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত।

বীজাণুনাশক ব্যবস্থাসহ রোগীকে পৃথক ঘরে রাখতে হবে। ঘর দু'বেলা ফিনাইল বা লাইজল দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। ব্লিচিং পাউডার ঘরের মধ্যে ব্যবহার না করা উচিত কারণ রোগীর ক্ষতি হতে পারে। রোগীর কাপড়-চোপড় সোডা দিয়ে ভাল করে পরিষ্কার করে ব্যবহার করতে হবে এবং শেষে সব কাপড়-চোপড়, বিছানাদি পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

রোগাবস্থায় হালকা অথচ বলকারক পথ্য দিয়ে রোগমুক্ত হলে সহজপাচ্য হালকা কচি মাছের ঝোল-ভাত, ডাল, তরকারী, চর্বিহীন মাংসের বা ভেজিটেবল সুপ দেওয়া যেতে পারে।

টক, টকজাতীয় ফল, দই একেবারে নিষিদ্ধ।

২৭। চুলকানি, খোস্‌-পাঁচড়া

আমরা অনেকেই মনে করি চুলকানি, খোস্‌-পাঁচড়া চর্মরোগ, কিন্তু তা নয় দেহের অভ্যন্তরের রোগের বহিঃপ্রকাশ, ভুল হতেই পারে, কারণ এরোগ ত্বকের উপরেই দেখা যায়। আমাদের ঠিক ত্বকের নিচে এক প্রকার রঞ্জক পদার্থ আছে। এই রঞ্জক পদার্থ পিত্ত থেকে আসে। এই রঞ্জক পদার্থ ত্বকের রং নিয়ন্ত্রিত করে এবং ত্বককে রক্ষা করে। অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি যে কোন কারণে যখন রক্ত দূষিত হয়ে যায় তখন পিত্ত-রসও তার কর্মক্ষমতা ঠিক রাখতে পারে না। আর এই সুযোগে যদি কোন রোগ-বীজাণু দেহে প্রবেশ করে বংশ বৃদ্ধি আরম্ভ করে তখন এই রোগ আসার সম্ভবনা দেখা দেয়। আমাদের দেহে অতন্দ্র প্রহরী রয়েছে শ্বেতকণিকা সেনাবাহিনী। তারা ঝাঁপিয়ে

পড়ে রোগ-বীজাণু ধ্বংস করতে। শ্বেতকণিকাবাহিনী যদি যুদ্ধে জয়লাভ করে তবে যে রোগের বীজাণু দেহে প্রবেশ করেছিল সে রোগ দেহ আক্রমণ করতে পারবে না কিন্তু যুদ্ধে উভয়পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হয় তাদের দেহগুলি যাবে কোথায়? এই সব মৃতদেহ রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে জমা হয় এবং চুলকানি, খোস্-পাঁচড়া, ফোঁড়ার মাধ্যমে দূষিত রক্ত পুঁজ আকারে দেহ থেকে বের হয়ে যায়।

রোগের কারণ—আমি আগেই আলোচনা করেছি অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লবিষ প্রভৃতি কারণে রক্ত যখন তার বিশুদ্ধতা-কর্মক্ষমতা হারায় একমাত্র তখনই রোগ-বীজাণু দেহে বাসা বেঁধে বংশবৃদ্ধি করার সুযোগ পায়। বিশুদ্ধ রক্তের অভাব এ রোগের মূল কারণ। অনেকেই আমরা মনে করি অপরিচ্ছন্ন থাকলে, ত্বকের উপর ময়লা জমলে চুলকানি, খোস্-পাঁচড়া হয়—হতে পারে তবে বাড়াবাড়ি কিছু হয় না। ত্বকের ওপরে ময়লা জমার জন্য লোমকূপ বন্ধ হয়ে যায় দেহের দূষিত পদার্থ ঘামের মাধ্যমে দেহ থেকে বের হতে পারে না সেজন্য গরম দেশে দেহে চুলকানি, খোস্-পাঁচড়া কিছুদিনের জন্য হতে পারে এবং তা অল্পতেই সেরে যায়। অপরিচ্ছন্ন ময়লা ত্বকই যদি কারণ হতো তবে কাশ্মীর, সিমলার অধিকাংশ লোকের তো বারোমাসই এসব রোগে ভুগতে হতো—রোগটা যখন ঠাণ্ডার দিনে বেশী দেখা দেয়, সেখানকার সাধারণ গরীব লোকেরা তো সাত দিনে একদিন দেহ পরিষ্কার করার সুযোগ পায় না।

রোগের লক্ষণ—চুলকানি, খোস্-পাঁচড়া বছরের যে কোন সময়ে হতে পারে তবে পাঁচড়া শীতকালেই বেশী হয়। চুলকানি নানা ধরনের হতে পারে যেমন প্রথমে ছোট ছোট ফুসকুড়ির মত হয়—খুব চুলকায়, চুলকালে খুব আরাম লাগে। এ ধরনের চুলকানি দু'এক দিন থাকে তারপর আপনা থেকে সেরে যায়। কিছুদিন শুধু একটু কালো দাগ থাকে, এক ধরনের ফুসকুড়ি হয় তা চুলকালে অল্প রস বের হয়, পুঁজও হতে পারে, এবং পরে পাঁচড়া আকারেও আসতে পারে। এ ধরনের চুলকানি সাধারণত হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে, দেহের সন্ধিস্থল এবং পায়ের দিকে বেশী হয়। পিঠে প্রায়ই হয় না। আর এক ধরনের ফুসকুড়ি বা খোস্ হয় যেগুলো পাঁচড়ার পূর্ব-লক্ষণ, আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে, কোমরে, উরুতে এবং পায়ের আঙ্গুলে পর্যন্ত যে কোন জায়গায় হতে পারে, তবে দেহের উপরাংশে, পিঠে প্রায় হয় না। জায়গাটায় প্রথম কয়েকটি ফুসকুড়ি বের হয়, লাল, গরম ও ব্যথা হয় এবং পরে পেকে গিয়ে পুঁজ-রক্ত বের হয়—বেশী হলে জ্বরও হতে পারে, ঘা বেশ কিছুদিন থাকে। চুলকানি, খোস্-পাঁচড়া জীবন সংশয়কারী নয়, তবে বেদনাদায়ক ও বিরক্তিজনক, আবার এক-রকম চুলকানি আছে যেগুলো সারা দেহে হঠাৎ আবির্ভাব হয় এবং কিছুক্ষণ পরেই চলে যায়। অনেকেরই ডিম, বেগুন, চিংড়ী মাছ খেলেই সারা দেহ চুলকাতে আরম্ভ করে এবং চাকা চাকা লাল দাগ হয়ে যায় কিছুক্ষণ পরে আর থাকে না। এ ধরনের চুলকানি বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন খাবার থেকে হতে পারে এমনকি দই থেকেও। তাঁদের পিত্তগ্রন্থি এ ধরনের এক বা একাধিক খাবার সহ্য করতে পারে না। একে এ্যালার্জিও বলা যেতে পারে। আর ঘামাচি? গায়ে গরমকালে সুস্থ শরীরে কম-বেশী ঘামাচি না হওয়াই আশ্চর্য।

নিরাময়ের উপায়—সকালে বিছানা থেকে উঠেই এক বা দু' গেলাস পাতি বা কাগুজি লেবুর রস-সহ জল পান করতে হবে। কিছুক্ষণ পরে হেলেঞ্চা পাতার রস চা চামচের চার চামচ, কাঁচা হলুদের রস তিন চামচ, আদার রস এক চামচ, কচি নিমপাতা, উচ্ছে বা করলার রস তিন চামচ খেতে হবে। তারপর আধঘণ্টা পরে সাধারণ খাবার—কিন্তু এমন কিছু খাওয়া উচিত নয় যাতে হজমে বিঘ্ন ঘটায়।

হেলেঞ্চা পাতার রস এবং অন্য সব রস শিশুদের বা কিশোর-কিশোরীদের বয়সানুযায়ী দিতে হবে—তবে একটু কমবেশী হলে কোন ক্ষতি নেই। এমন কোন খাবার যেমন অধিক ঝাল-মশলাযুক্ত খাবার, অধিক তেল-ঘিযুক্ত খাবার খাওয়া ঠিক হবে না যাতে অজীর্ণ-কোষ্ঠকাঠিন্য আসতে পারে। খাবার একটি পদ তিতো-শুক্তো হওয়া চাই। স্নানের সময় ভালো নিম-সাবান অথবা কার্বলিক সাবান ব্যবহার করা উচিত। নিম-গাছের ছাল বা নিমপাতা জলে ভাল করে সিদ্ধ করে একটি পাত্রে ঢেকে রেখে দিনে পাঁচ-ছয়বার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে ক্ষতস্থানে যেন বাইরের ধুলাবালি না জমতে পারে। ওষুধ খেয়ে বা কোন মলম লাগিয়ে ঘা শুকিয়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ দূষিত রক্ত-পুঁজ দেহের ভিতরে থেকে যাবে এবং আবার হবে।

২৮। হার্ট ডিজিজ ও সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস্

আগেকার দিনে হার্টের রোগ বয়স্ক ধনী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রায় সীমাবদ্ধ ছিল —কিন্তু আজকাল ধনী-দরিদ্র, যুবক-যুবতী প্রায় সব শ্রেণীর লোক এর শিকার হচ্ছে— অবশ্য যারা বিলাসবহুল অসংযমী জীবনযাপন করে, যারা প্রায় মানসিক চাপের মধ্যে থাকে তাদের প্রতি এরোগের নজরটা বেশী। আগে তরুণীদের মধ্যে এরোগ ছিল না, কারণ তরুণী মহিলাদের দেহে যে হর্মোন উৎপন্ন হয় তা করোনারী ধমনীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই হর্মোন করোনারী ধমনীকে সুস্থ ও সক্রিয় রাখে কিন্তু আজকাল যে সব তরুণীরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ ওষুধ বা ট্যাবলেট খায় তাদের দেহের হর্মোনের কাজ নিউট্রালাইজ হয়ে যায়—রক্তে কোলসটেরল (Cholesterol)-এর ভাগ বৃদ্ধি পায় ফলে নানা রকম হার্টের ট্রাবল দেখা দেয়। হৃদরোগ নানা ধরনের হতে পারে, তার মধ্যে নিম্নলিখিত রোগগুলি প্রায়ই দেখা যায়—(১) ইসকিমিক হার্টডিজিজ, (২) রিউ-ম্যাটিক হার্ট, (৩) দুর্বল হার্ট (হৃদশূল), (৪) জন্মগত দোষত্রুটি।

কারণ—ইসকিমিক হার্টডিজিজ করোনারী ধমনীজনিত রোগ। রক্ত সংবহনতন্ত্র-এ আমরা জানি যে হৃৎপিণ্ড নামে ক্ষুদ্র যন্ত্রটি দিনে প্রায় সাত হাজার লিটার রক্ত পাম্প করে ধমনী, শিরা ও উপশিরার মাধ্যমে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয় আবার দূষিত রক্ত একই-ভাবে টেনে নিয়ে আসে। যদি কোন কারণে হৃৎপিণ্ডের পেশী বা তার চারপাশের স্নায়ুজাল বা ধমনী, শিরা ও উপশিরা স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে তখনই ঘটে অঘটন। দেহে যদি অতিরিক্ত চর্বি জমে তবে করোনারী ধমনীর ও শিরার দেওয়ালে চর্বি জমে রক্ত চলার পথে বাধার সৃষ্টি হয়। রক্তে কোলসটেরল বেশী হলেও বাধার সৃষ্টি হয়, আবার রক্ত যদি দীর্ঘদিন অম্লবিষে দূষিত হয়ে থাকে তবে ধমনী, শিরা-উপশিরার দেওয়াল সঙ্কোচন, প্রসারণ ক্ষমতা হারিয়ে শক্ত হয়ে যায় এবং এসব ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রকে অতিক্রিয় হয়ে দেহের সর্বত্র রক্ত আদান-প্রদান করতে হয়—ফলে রক্তচাপও বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘদিন হৃৎপিণ্ড বিশুদ্ধ রক্ত না পাওয়ায় তার পেশীর সঙ্কোচন-প্রসারণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং ঠিকমত কাজ করতে পারে না। এ সময় করোনারী ধমনী ও শিরার মধ্যে যে কোন জায়গায় সাময়িকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে রক্ত বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা চাপে ধমনী-শিরা ছিঁড়ে যেতে পারে এবং তখনই হয় হার্ট এ্যাটাক বা স্ট্রোক্। কি কি কারণে এ অবস্থা হয় আমি 'উচ্চ রক্তচাপ'-এ আলোচনা করেছি। যেমন চর্বি ও বেশী মশলাযুক্ত খাদ্য বেশী খাওয়া, দ্রুত ও ব্যস্ত জীবন, মানসিক চাপ, শরীর বেশী মোটা হওয়া, কায়িক পরিশ্রমের অভাব, অধিক ধূমপান ও মাদকদ্রব্য গ্রহণ, ডায়বেটিস রোগ ইত্যাদি। আজকাল পঞ্চাশ বছর পার হওয়ার পর এটি একটি সাধারণ রোগ বলা যেতে পারে। অবশ্য যারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে তারা এ রোগ থেকে রেহাই পায়।

রোগের লক্ষণ—এতে হঠাৎ বুকের বাঁদিকে, মাঝে বা ডানদিকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাঁদিকে প্রচণ্ড ব্যথা আরম্ভ হয়—দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে, ব্যথা কাঁধ ও হাত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে। ব্যথা বেশীক্ষণ থাকলে প্রচুর ঘাম হয়। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসতে থাকে এবং ঝিমিয়ে পড়ে। কঠিন স্ট্রোক হলে রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়।

হৃদশূল—এ একটি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক রোগ। সবসময় থাকে না। এ রোগ যাদের আছে তারা বেশী পরিশ্রম করলে, হঠাৎ কোন মানসিক চাপ বা আঘাত পেলে এ রোগ দেখা দেয়। এই আক্রমণ কয়েক সেকেণ্ড থেকে কয়েক মিনিট পর্যন্ত থাকতে পারে। বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যায়।

কারণ—হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা। যদি কোন কারণে হৃদপিণ্ডের পেশী ও চারপাশের স্নায়ুজাল ঠিকমত কাজ না করে তবেই এ রোগ দেখা দেয়।

লক্ষণ—বেশী পরিশ্রম করলে, হঠাৎ মানসিক আঘাত বা চাপ পড়লে বুকের বাঁ-দিকে প্রচণ্ড ব্যথা সুরু হয়। বিশ্রামের সময় এ রোগ আসে না। ব্যথা বুকের বাঁ-দিক থেকে কাঁধ ও পিঠ অবধি ছড়িয়ে পড়ে। ব্যথা শুরু হলে রোগী নিশ্চল হয়ে যায়। অনেকের বাঁদিকে মাথা ব্যথা করে, গা বমি বমি করে, ব্যথা খুব বেশী হলে রোগী ছটফট করে। রোগ বৃদ্ধির ফলে অনেক সময় হার্টস্ট্রোক হয়ে রোগী মারা যায়—মৃদু আক্রমণ হলে বিশ্রামে ঠিক হয়ে যায়। চিকিৎসকের পরামর্শে আজকাল রোগী এক-প্রকার ট্যাবলেট কাছে রাখে—আক্রমণ হলে জিভের নিচে রাখার পরামর্শ দেন এবং রোগী তখনকার মত আরাম বোধ করে।

রিউম্যাটিক হার্ট—রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ হয় রিউম্যাটিক ফিবার থেকে। এ জ্বরে গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয় এবং বেশ কিছুদিন জ্বরে ভুগলে হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ—যে কোন সময়ে সাময়িকভাবে হার্টের কাজ বন্ধ হয়ে যায় বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব হয়। আজকাল চিকিৎসকরা কৃত্রিম হার্ট (Pace Maker) বসিয়ে রোগীকে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখেন—তব নির্দিষ্ট সময়ে এই কৃত্রিম হার্ট পালটাতে হয়।

সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস্

থ্রম্বোসিস্ কথাটার মানেই হলো রক্ত জমাট বাঁধা। মস্তিষ্কে ধমনীর ও শিরার সরু সরু শিরাজালকের মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধার নাম হলো সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস্—আর হৃদপিণ্ডের আশেপাশে ধমনীর মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে বলা হয় করোনারী থ্রম্বোসিস্। দু'টি অবস্থাই জীবন সংশয়কারী। আমি পূর্বে আলোচনা করেছি কি কি অবস্থায় রক্ত জমাট বাঁধতে পারে বা চলাচলে বাধা পেতে পারে।

সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস্ প্রায় হয় রক্তচাপ বৃদ্ধির ফলে, আবার রক্তবাহী ধমনীর অত্যধিক সংকোচনের ফলেও হতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রেও সেই রক্তচাপ বৃদ্ধি। আবার রক্তচাপ যদি অত্যধিক কমে যায় তবে মস্তিষ্কে ঠিকমত রক্ত পেঁছায় না। রোগীর মাথা ঘোরে, অবসন্ন বোধ হয়। এ অবস্থায় খুব একটা চিন্তার কারণ থাকে না—চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যায়—রক্তচাপ বাড়িয়ে দেওয়া যায় কিন্তু চিন্তার কারণ তখনই আসে যখন মস্তিষ্কে কোন সরু শিরা বা জালক রক্তচাপে ছিঁড়ে গিয়ে রক্তক্ষরণ আরম্ভ হয় এবং তখনকার মত চিকিৎসকের প্রায় কিছুই করার থাকে না। রোগী সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যায়। যদি রোগীর নাক-মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে, তবে সেটা সুলক্ষণ—রোগীর বাঁচার সম্ভাবনা থাকে তবে প্রায় ক্ষেত্রে আংশিক বা সম্পূর্ণ পক্ষা-ঘাত নিয়ে। করোনারী থ্রম্বোসিসে রোগীকে অল্প বা কিছুক্ষণ কষ্ট ভোগ করতে হয়

পরে রোগী হয়তো অজ্ঞান হয়ে যায় কিন্তু সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে রোগী সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যায় কোন কষ্ট ভোগ করতে হয় না। হয়তো আক্রমণের আগে মাথা ঝিম ঝিম করে, মাথা ঘোরে বা অবসন্ন বোধ হয়, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হলে রক্ত কোনভাবে বন্ধ করা উচিত নয়—রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রেখে শুধু বাইরের রক্ত মুছে দিতে হবে। রোগীর জ্ঞান ফিরলে চিকিৎসকের নির্দেশ মত তরল খাদ্য দিতে হবে—বিশ্রামের কোন ব্যাঘাত না হয়।

করোনারী থ্রম্বোসিস্ হোক আর সেরিব্রল থ্রম্বোসিস্ হোক দু'টি রোগই জীবন সংশয়কারী। অতএব রোগীর শরীরের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। ঘি, মশলা বা গুরুপাক খাবার বা চর্বিযুক্ত খাবার, ধূমপান বা তামাকজাত যে কোন জিনিষ সেবন একেবারে নিষেধ। সরষের তেল, বনস্পতি, ডিমের কুসুম রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ায়—রান্নায় সূর্যমুখী বা বাদাম তেল ব্যবহার করা উচিত। সমীক্ষায় দেখা গেছে ভারতের যে সব জায়গায় সরষের তেল বা বনস্পতি ব্যবহার করা হয়, সেখানে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। হার্টের রোগীর খাবার পরিমাণ অবশ্যই কম থাকা উচিত। কাঁচা লবণ খাওয়া নিষেধ। খাবার সহজপাচ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

হৃদরোগীদের পক্ষে খুব সকালে প্রাতঃভ্রমণের সঙ্গে কয়েকটি সহজ প্রাণায়াম, সকালে-বিকালে বয়স ও সামর্থানুযায়ী কয়েকটি সহজ আসন অভ্যাস রাখলে এবং খাদ্য ও স্বাস্থ্যনীতি মেনে চললে পুনঃ রোগাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। অবশ্য "Prevention is better than cure."—প্রবাদটি মনে রাখা উচিত নয় কি?

২৯। সিরোসিস অফ লিভার

মানব দেহে যতগুলো প্রাণ-সংশয়কারী রোগ হতে পারে সিরোসিস অফ লিভার তার মধ্যে অন্যতম। প্রথম থেকে চিকিৎসা না হলে মৃত্যু অনিবার্য—কারণ শেষের দিকে রোগ চিকিৎসকের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।

নামেই বলে দিচ্ছে রোগটা লিভার বা যকৃতের। আমাদের দেহে এমন কতকগুলো গ্রন্থি আছে যেমন যকৃৎ, প্লীহা, অগ্ন্যাশয়, কিড্নি, পিটিউটারী, থাইরয়েড প্রভৃতি যা অকেজো হয়ে গেলে রোগীর মৃত্যু অবধারিত—চিকিৎসায় হয়তো মৃত্যুদিন কিছুটা পিছিয়ে দিতে পারে। জীবদেহে লিভার বা যকৃৎ সবচেয়ে বড় এবং মজবুত গ্রন্থি—ওজন প্রায় দেড় কিলোর মত। গ্রন্থিটি এতই মজবুত যে সহজে একে কাবু করা যায় না, তবে সহ্যশক্তিরও একটা সীমা আছে, যকৃৎ বুকের খাঁচার ঠিক নিচের দিকে অবস্থিত—তবে ডানদিকটা বড় এবং কিছুটা গম্বুজের মত—তাই চিকিৎসকরা প্রথমেই ডানদিকটা টিপে পরীক্ষা করেন। সম্পূর্ণ লিভারটি একটি পর্দা দ্বারা আবৃত। লিভারে অসংখ্য লোবিউল থাকে আর এই লোবিউল সেল বা কোষ এবং রক্তনালী দ্বারা গঠিত। দেহে যকৃতের অবিরাম বহু কাজ করতে হয়—বিস্তৃত আলোচনা এই স্বল্প-পরিসরে সম্ভব নয় তবে এটুকু জানা দরকার যে যকৃৎ দেহে এমন কতকগুলো কাজ করে যা না হলে জীবদেহ অচল হয়ে যায় যেমন যকৃতে সৃষ্ট হয় পিত্তরস যা বিপাকক্রিয়ায় অপরিহার্য। কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ প্রভৃতি বিপাকে, রক্তে শর্করা বা সুগার নিয়ন্ত্রণে যকৃতের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া, যকৃৎ দেহে ছাঁকুনী বা চালুনীর কাজ করে। দেহের রক্তে যে সব বিষাক্ত পদার্থ, রোগ-জীবাণু প্রবেশ করে যকৃৎ রক্তের মাধ্যমে ছেঁকে সেগুলোকে ধরে রেখে ধ্বংস অথবা নিউট্রিলাইজ করার চেষ্টা করে—সফল হলে ভাল না হলে রোগাক্রমণ, এমন একটি গ্রন্থি যদি অকেজো হয়ে যায় তবে দেহে আর রইল কি?

রোগের কারণ—সিরোসিস অফ লিভার হলে প্রথমে লিভারের কোষগুলি ধ্বংস হতে থাকে এবং তার জায়গায় একপ্রকার টিস্যু গড়ে ওঠে। লিভার বড় এবং শক্ত হয়ে যায়, তার মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচল করতে পারে না ফলে লিভারের কর্মক্ষমতা ব্যাপকভাবে কমে যায়। পোর্টাল শিরা যখন রক্ত যকৃতে নিয়ে আসার চেষ্টা করে সে রক্ত তখন ঠিকমত যকৃতে প্রবেশ করতে পরে না ফলে সে রক্ত তখন পার্শ্ববর্তী শিরায় প্রবেশ করায় শিরাগুলি ফুলে ওঠে এবং এক সময় যে কোন জায়গায় শিরা ফেটে যায়। শিরা যদি গ্রাসনালীর কাছাকাছি ফেটে যায় তবে মুখ দিয়ে রক্ত বের হয় আর যদি নিচে বা রেক্টামের কাছে ছিঁড়ে যায় তবে মলম্বার দিয়ে রক্ত পড়ে। বেশীদিন এ রোগ থাকলে লিভারে ক্যানসার হতে পারে। লিভার প্রায় অকেজো থাকায়, রক্তে অ্যালবুমিনের পরিমাণ কমে যাওয়ায় রক্তের প্রবাহ কমে যায় এবং পেটে তখন জল জমতে আরম্ভ করে। এ অবস্থাকে "উদরী" বলা হয়। এ সময় চিকিৎসকের আর প্রায় কিছুই করার থাকে না।

দীর্ঘদিন অত্যধিক মদ্যপান, দীর্ঘদিন বিষাক্ত ওষুধ সেবন, উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন না করে বেশ কিছুদিন রাসায়নিক ল্যাবোরেটরিতে বা কারখানায় কাজ করলে, ভাইরাল হেপাটাইটিসজনিত জণ্ডিসে অথবা কালাজ্বর, ম্যালেরিয়াজনিত হেপাটাইটিসে ভুগলে, বেশ কিছুদিন পিত্তরস নির্গমনের পথে বাধারসৃষ্টি হলে এবং বাধার একটি প্রধান কারণ হলো বাইল ডক্ট-এ স্টোন বা পাথর সৃষ্টি হওয়া, এরূপ নানা কারণে সিরোসিস অফ লিভার হতে পারে। এ রোগ শিশুদেরও হতে পারে। শিশু যখন মায়ের দুধ সম্পূর্ণ ছেড়ে স্বাভাবিক খাবার খেতে আরম্ভ করে তখন যদি দীর্ঘদিন প্রোটিন ও স্নেহ এবং শর্করা জাতীয় খাবার বেশী খায় তখন শিশু সিরোসিস অফ লিভার রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

পূর্ব লক্ষণ—লিভারে ব্যথা—বিশেষভাবে ডানদিকটায় ব্যথা ডান পেটে, বুকে এমন কি কাঁধে ব্যথা, খাবারে অরুচি, অজীর্ণ, অবসাদ, মাঝে মাঝে পিত্তবমি মুখে সব সময় তিক্ত স্বাদ, চোখের ভিতরের সাদা অংশ, হাত-পায়ের নখের সাদা অংশ এমন কি ঘামেও হলদে রং আসতে পারে, অম্ল, কোষ্ঠবদ্ধতা বা কোষ্ঠতারল্য প্রায় লেগে থাকে, জ্বর হতে পারে, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাবে এবং রং হলদে হয়ে যাবে, লিভার বড় এবং শক্ত হয়ে যাবে, ক্রমে শরীর রক্তশূন্য ও কৃশ হয়ে যাবে।

নিরাময়ের উপায়—আমি আগেই বলেছি লিভার আমাদের দেহে সব থেকে মজবুত গ্রন্থি, দুর্ঘটনা ছাড়া এ গ্রন্থি জখম হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে আর কিছু অংশ জখম হলেও বাকি অংশ তার কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তাই পূর্ব-লক্ষণের আভাষ পেলেই যদি সতর্ক হওয়া যায় তবে এই জীবন সংশয়কারী মারাত্মক রোগ থেকে কিন্তু মুক্তি পাওয়া যায়। প্রথম থেকে সতর্ক হলে এরোগ দুরারোগ্য নয়। প্রথমে খাবারের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। তেল, ঘি, মাখন, মাংস, চর্বিযুক্ত মাছ, মশলা, কাঁচা লবণ, শুকনো লংকা প্রভৃতি একেবারে নিষিদ্ধ। খাবার সিদ্ধ অবস্থায় খেতে হবে যাতে সহজে হজম হয়। কালমেঘের পাতার রস, উচ্ছে, করোলা, ছোট মাছের হালকা ঝোল, পেঁপে সিদ্ধ, বাতাবি লেবুর রস, কমলা লেবুর রস, মুসাম্বি লেবুর রস, আখের রস, মিছরির জল, আখের বা খেজুর গুড় এ রোগে বিশেষ উপকারী। পুরনো সিদ্ধ চালের ভাত হওয়া চাই—এমন কিছু খাওয়া ঠিক নয় যা হজমে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। জল ভাল করে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে। রাত্রে বেশী জল খেলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। লক্ষণগুলো প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ

বিশ্রাম তবে সকাল-বিকাল খোলা জায়গায় পায়চারি এবং প্রয়োজনমত ধ্যানাসন, শবাসন করা যেতে পারে।

সুস্থ হলে এমন কতকগুলি যেমন জানুশিরাসন, পশ্চিমোত্থানাসন, অর্ধ-চক্রাসন, অর্ধ-চন্দ্রাসন, উস্ট্রাসন, পদ-হস্তাসন প্রভৃতি ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করতে হবে যাতে পেট, তলপেট ও বস্তিপ্রদেশে বিশেষভাবে রক্ত চলাচল করার সুযোগ পায় এবং তাহলেই ঐ অঞ্চলের সব গ্রন্থি ও দেহযন্ত্রগুলি সবল ও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে মায়েদের শিশুর সুষম খাদ্যের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। মায়েদের মনে রাখা উচিত বেশী খাওয়ালেই শিশু তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে না বরং বিপরীত ফল দেখা দিতে পারে। বয়স অনুযায়ী বেশী মোটা বা থলথলে শরীর শিশুর সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়।

৩০। গ্যাসট্রাইটিস ও পেপটিক আলসার

রোগ দু'টির নামে পার্থক্য থাকলেও কারণ একই। রোগের প্রথম দিকে পাকস্থলী বা ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রদাহ তার পরে পাকস্থলী বা ক্ষুদ্রান্ত্রের দেওয়ালে আলসার (ক্ষত বা ঘা)—শেষদিকে দেওয়ালে ফুটো বা ছিদ্র হয়ে যেতে পারে। পাকস্থলীতে হলে বলা হয় গ্যাসট্রিক আলসার আর ডিওডেনামে বা ক্ষুদ্রান্ত্রে হলে পেপটিক আলসার।

এখন দেখা যাক রোগ কি, কেন হয় এবং এর থেকে কি ভাবেই বা মুক্তি পাওয়া যায়। পাচনতন্ত্র ও পরিপাক ক্রিয়ায় দেখা যায় (পাচনতন্ত্র ও পরিপাক ক্রিয়া দেখ) খাদ্য হজমের জন্য পাকস্থলী এক প্রকার পাচক রস নিঃসৃত হয়—এই রস তীব্র হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড (আম্লিক)। এই রস পাকস্থলীতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কিছুদিন নিঃসৃত হতে থাকলেই পাকস্থলীতে বা অন্ত্রে প্রদাহ আরম্ভ হয়। আবার পাকস্থলীর ঠিক পিছনের দিকে আছে অগ্ন্যাশয় (Pancreas)—খাদ্য হজমের জন্য এর থেকে যে রস নিঃসৃত হয় তাকে বলা হয় ক্লোমরস (Pancreatic Juice), এর প্রকৃতি ক্ষারজাতীয়। এই রস অগ্ন্যাশয় থেকে একটি সরু নলের মাধ্যমে ক্ষুদ্রান্ত্রে আসে এবং খাদ্যাংশের বাকি অংশকে হজমে সাহায্য করে ও পাচক রসের অম্লতায় সমতা আনে।

রোগের কারণ—বেশী অম্লজাতীয়, তেল, ঘি, মশলা, ঝাল ও চর্বিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ, অতিরিক্ত ওষুধ (বিশেষভাবে এ্যাসপিরিন জাতীয়) সেবন, যে কোন কারণে পাকস্থলীতে অধিক পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড নিঃসরণ এবং অগ্ন্যাশয় থেকে প্রয়োজনের তুলনায় কম ক্লোমরস নিঃসরণ, দীর্ঘ সময় খালি পেটে থাকা অথবা প্রায়ই উপবাস, যে কোন কারণে যদি যকৃৎ ঠিকমত কাজ না করে প্রভৃতি নানা কারণে পাকস্থলী ডিওডেনাম বা ক্ষুদ্রান্ত্রে অম্লরসের আধিক্য দেখা দিতে পারে এবং এই আধিক্য যদি বেশ কিছুদিন চলে তবে পাকস্থলী, ডিওডেনাম বা ক্ষুদ্রান্ত্রের দেওয়ালে যে ঝিল্লী-পর্দা থাকে তা অম্লরসে জর্জরিত হয়ে ক্ষত বা ঘা হতে থাকে তখন তীব্র প্রদাহ আরম্ভ হয়। ক্ষত থেকে রক্ত ঝরতে থাকে—রক্ত পায়খানা বা বমির সংগে বের হয়ে যায়। যদি ক্ষত পাকস্থলীতে হয় তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বমির সংগে আর যদি ডিওডেনামে বা ক্ষুদ্রান্ত্রে হয় তবে পায়খানার সংগে রক্ত বের হয়ে যায়—মলের রং কালচে বা কালো হয়ে যায়, এমন কি যে কোন জায়গার দেওয়াল ফুটো (পারফোরেশন) হয়ে অনবরত রক্ত ক্ষরণ হতে পারে।

লক্ষণ—পাকস্থলী বা ক্ষুদ্রান্ত্রে অম্লরসের আধিক্যের জন্য যে কোন সময়ে প্রদাহ হতে পারে কিন্তু আলসার দু' রকমের হতে পারে—অ্যাকিউট ও ক্রনিক। পেপটিক

আলসার বলতে আমরা সাধারণত ক্রনিক আলসার বুঝি। পাকস্থলী বা ক্ষুদ্রান্ত্রে অ্যাকিউট আলসার খুব অল্পদিনে ঘটে যেতে পারে এবং উপসর্গগুলি তীব্র হয় কিন্তু ক্রনিক আলসার বেশ কিছুদিন ধীরে ধীরে চলতে থাকে এবং হয় তো হঠাৎ একদিন তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। অ্যাকিউট আলসারে সাধারণত এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, যেমন অম্ল, বুকজ্বালা, গলাজ্বালা, যন্ত্রণাসহ পাকস্থলী বা ক্ষুদ্রান্ত্রে ব্যথা, টিপলে বেশী ব্যথা লাগে, বমি অথবা বমিভাব, বমি করলে মুখে টক স্বাদ ও গলা জ্বালা করে। বমির সঙ্গে রক্ত আসতে পারে। পেট সবসময় ভারী বোধ হয়। অরুচি, খাবারে বিস্বাদ, জিভে সাদা অথবা হলদে মত পরদা, অবসন্ন ভাব, সব সময় জল খেতে ইচ্ছে করে কিন্তু খেলেই বমি হয়ে যায়, মাথা ঘোরা প্রভৃতি এবং ক্রনিক এসব উপসর্গ তো থাকেই তবে তীব্রভাবে নয়। তাছাড়া যোগ হয় পেট ফাঁপা, গা, হাত-পা জ্বালা, ক্ষুধামান্দ্য, রক্তাল্পতা প্রভৃতি।

নিরাময়ের উপায়—প্রথমাবস্থায় রোগ ধরা পড়লে এবং রোগের কারণ জানতে পারলে অতি সহজেই এই জীবন-সংশয়কারী রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। রোগের কারণগুলো ত্যাগ করতে হবে যেমন অধিক অম্লজাতীয় খাবার, তেল, ঘি, মশলাযুক্ত, চর্বিযুক্ত খাবার, মদ্যপান, ধূমপান, চা, কফি ইত্যাদি। সকালে খালিপেটে ত্রিফলার জল, দু'বেলা বা বেশ কয়েকবার বমন ধৌতি, সহজ বস্তিক্রিয়া কিন্তু পেটে ক্ষত বা ঘা থাকলে এমন কিছু করা ঠিক নয় যাতে পেটে চাপ পড়ে। যদি যে কোন জায়গায় দেওয়াল ছিদ্র হয়ে অনবরত রক্তক্ষরণ হতে থাকে তবে কালবিলম্ব না করে ডাক্তারের সাহায্যে রক্তপড়া বন্ধ করতে হবে। তারপর অন্য ব্যবস্থা, আর যদি পাকস্থলী বা ক্ষুদ্রান্ত্রে ক্ষত বা ঘা না হয়ে থাকে তবে অম্লজাতীয় খাবার পরিহার, বমন ধৌতি সহজ বস্তিক্রিয়ার সঙ্গে এমন কতকগুলি আসন বেছে নিতে হবে যাতে পেট, তলপেট ও বস্তিপ্রদেশে খুব ভালো ব্যায়াম হয়। তাহলে ঐ অঞ্চলের দেহযন্ত্রগুলি সবল ও সক্রিয় হয়ে উঠবে। আলসার রোগীদের কোন সময় খালি পেটে থাকা ঠিক নয়। প্রদাহ আরম্ভ হলে দুধ, বিস্কুট বা ঐ ধরনের ক্ষারজাতীয় কিছু খেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যথার উপশম হয়।

৩১। কোলাইটিস

কোলাইটিস রোগটা শুধু কষ্ট ও বিরক্তিদায়ক নয় উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে, শেষদিকে জীবন সংশয়কারীও হতে পারে। কোলাইটিস রোগটা কি, কেন হয়, লক্ষণাদি বা কি সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক। কোলাইটিস হয় কোলনে (বৃহদন্ত্র, লার্জ ইনটেস্টাইন)। কোলনে যখন জীবাণু সংক্রমণ (ইনফেকশন) বা কোন কারণে (যেমন কোষ্ঠবদ্ধতা) স্ফীত বা ফুলে (ইনফ্লেমেশন) ওঠে তখন প্রবাহ এবং ব্যথা আরম্ভ হয়—এই অবস্থাকে বলা হয় কোলাইটিস। কোলাইটিস সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে প্রথমে আমাদের বৃহদান্ত্রের গঠন ও তার কাজ এবং পাচনতন্ত্র বা পরিপাক ক্রিয়া সম্বন্ধে মোটামুটি একটু ধারণা থাকা দরকার। ছবি দেখ*। ছবিটা লক্ষ্য করলে বৃহদান্ত্র ও পরিপাক ক্রিয়া বিষয় বুঝতে সুবিধা হবে। তরল খাদ্য-মণ্ড যখন বৃহদান্ত্রে চলে যায় তখন বৃহদান্ত্র তার প্রণালী মাধ্যমে খাদ্য উপাদান দেহের কাজের জন্য চুষে নেয় এবং বর্জ্য-পদার্থ রেক্টামের মাধ্যমে মল আকারে দেহ থেকে বের করে দেয়। ব্যথা বা প্রদাহ যেহেতু উদর গহ্বরের নিচের দিকে অর্থাৎ তলপেটে আরম্ভ হয়, তাই অনেক ডাক্তার প্রথমে ভুল করে এ্যাপেণ্ডিসাইটিস মনে করেন—কারণ

* পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ডঃ নারায়ণী বসু ও অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন দে প্রণীত "গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান" বই দেখে যেভাবে এঁকে পরীক্ষা দিয়েছিলাম।

পাচনতন্ত্র
(Digestive System)
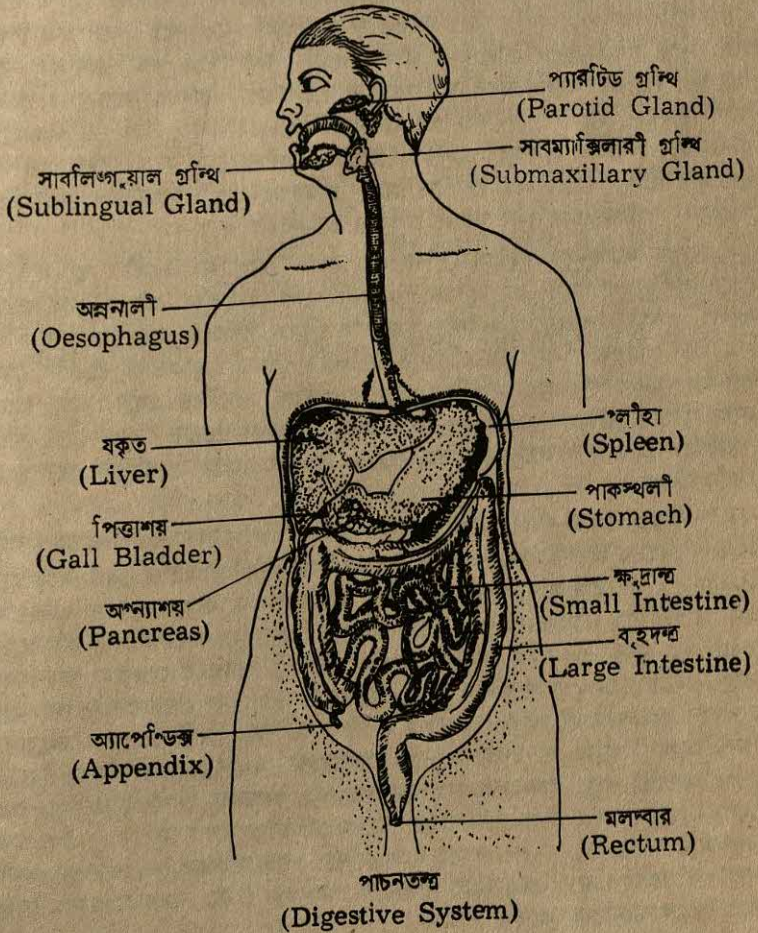
উপসর্গ প্রায় একই রকম তবে কোলাইটিসে তলপেটের বাঁদিকে এবং এ্যাপেণ্ডিসাইটিসে তলপেটে ডানদিকে বেশী ব্যথা অনুভূত হয়। কোলাইটিস সাধারণত কোলনের বিশেষ কয়েকটি জায়গাতে হয় কিন্তু ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রীজনিত কোলাইটিসে কোলনের সব জায়গায় ব্যথা অনুভূত হতে পারে।

লক্ষণ—ক্ষুধামান্দ্য, মুখে অরুচি, পেটে সব সময় অস্বস্তি, তলপেটে বিশেষভাবে বাঁদিকে ব্যথা, মাঝে মাঝে তীব্র শূলমত ব্যথা হয়, কোষ্ঠকাঠিন্য বেশীদিন থাকলে পায়খানা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়ে ফুলে ওঠে এবং তীব্র ব্যথা আরম্ভ হয়, জীবাণু-ঘটিত হলে কোলনের দেওয়ালের কোষও শ্লেষ্মাঝিল্লী কুরে কুরে খেয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে পারে—তখন তীব্র ব্যথা আরম্ভ হয়। ক্ষত থেকে রক্ত পায়খানার সঙ্গে বের হয়ে যায় এবং মলের তখন রং কালচে বা কালো হয়। কখনও বারে বারে পাতলা অল্প পায়খানা হয়। পায়খানার পর ব্যথা সাময়িকভাবে একটু কমে। কোলাইটিস ক্রনিক হয়ে গেলে বা এ রোগে বেশীদিন ভুগলে কোলনে ফুটো হয়ে যেতে পারে এবং ছিদ্র যদি খুব বড় হয়ে যায় তবে সে অংশ চিকিৎসকরা প্রায় কেটে বাদ দিয়ে দিতে পারেন। তাছাড়া বেশীদিন ভুগলে কোলনে ক্যানসারও হতে পারে।

রোগের কারণ—কোলাইটিস গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এবং মধ্য-বয়সী স্ত্রী-পুরুষের ক্ষেত্রে বেশী দেখা যায়। কম বয়েসের ছেলে-মেয়েদের যে হয় না—তা নয় তবে সংখ্যায় নগণ্য। এসক্যারিসিয়াকোলা ও সিগেলা জাতীয় জীবাণু কোলনে সংক্রামিত হলে, দীর্ঘ-দিন অন্ত্রে ব্যাসিলারী আমাশয়-জীবাণুর অবস্থিতি, যাদের শাক-সবজি, প্রোটিন, তেল, ঘি, ঝাল, মদ বেশী মাত্রায় দীর্ঘদিন খাওয়ার অভ্যাস, দীর্ঘদিন ওষুধ সেবন, প্রয়ো-জনের তুলনায় জল কম খাওয়া, যে কোন কারণে পরিপাক ক্রিয়ায় বাধার সৃষ্টি, খাদ্যে বিষক্রিয়া—বিশেষভাবে আর্সেনিক বিষ, তবে এ বিষক্রিয়ার ফলে কোলাইটিস হলে প্রায়ই অ্যাকিউট হয়।

নিরাময়ের উপায়—রোগটি যেমন কঠিন ও মারাত্মক প্রথমাবস্থায় নিরাময় তেমনি সহজ। রোগের কারণটি জেনে সেইমত ব্যবস্থা নিলে খুব সহজেই এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। রোগ যদি জীবাণুঘটিত হয় কালবিলম্ব না করে ডাক্তারের পরামর্শমত মল পরীক্ষা করে জীবাণুমুক্ত হতে হবে। যৌগিক ক্রিয়ায় পায়খানার মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত হওয়া যায় তবে বেশ সময় দরকার ততক্ষণে জীবাণু কোলনের দেওয়াল ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলতে পারে। আর যদি বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য বা অন্য কোন পেটের গোলমালে হয় তবে সকালে উঠেই সহজ বস্তিক্রিয়া ও সহজ অগ্নিসার ধৌতি সঙ্গে পবনমুক্তাসন, বিপরীতকরণী মুদ্রা, পদ-হস্তাসন, পশ্চিমোত্থানাসন, অর্ধ-চক্রাসন প্রভৃতি। বিকালে বিপরীতকরণী মুদ্রা, পদ-হস্তাসন জানুশিরাসন, ময়ূরাসন, অর্ধ-চক্রাসন বা অর্ধ-চন্দ্রাসন প্রভৃতি, রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত চা, কফি, মাদক দ্রব্য, তেল, ঘি, ঝাল-মশলাযুক্ত খাবার সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। খুব গরম অবস্থায় যেন খাদ্য বা পানীয় পাকস্থলীতে না যায়। এমন কিছু খাওয়া বা পান করা উচিত নয় যাতে হজমে গোল-মাল বা কোষ্ঠকাঠিন্য আসতে পারে।

৩২। নেফ্রাইটিস

নেফ্রাইটিস হলো কিডনির প্রদাহজনিত রোগ। ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ সবাই এর শিকার হতে পারে তবে কম বয়সীদের ক্ষেত্রে সময়মত রোগ ধরা পড়লে শতকরা ৯০

থেকে ৯৫ জন এই মারাত্মক জীবন সংশয়কারী রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বয়স্কদের থেকে কম বয়সীদের এ রোগ বেশী হয়। বয়স্কদের ক্ষেত্রে নানা জটিলতার জন্য এ রোগ প্রায় ক্রনিক হয়ে যায় এবং একবার ক্রনিক হয়ে পড়লে—পরিণাম ভয়াবহ। শেষদিকে একমাত্র ডায়ালিসিস করে রোগীকে কয়েকটা-দিন বেশী বাঁচিয়ে রাখা যায় কিন্তু এই ডায়ালিসিস এত ব্যয়সাধ্য যে সাধারণের চিন্তার বাইরে।

আমাদের দেহে দু'পাশে দু'টি কিডনি আছে। এই কিডনি দু'টি দেহে ছাঁকনির কাজ করে। প্রতি মিনিটে প্রায় এক লিটার রক্ত এর ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এই বিপুল পরিমাণ রক্তে যে সমস্ত দূষিত, বিষাক্ত, আবর্জনা আছে কিডনির প্রণালী দ্বারা গঠিত ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে প্রস্রাবের মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দিচ্ছে, তাই কিডনি যদি বেশ কিছুদিন অকেজো হয়ে পড়ে থাকে তবে আমাদের দেহ বিষাক্ত পদার্থের ও আবর্জনার ডিপো হয়ে যাবে—ফলে দেহযন্ত্রগুলি সব আস্তে আস্তে বিকল হয়ে আসতে থাকবে। তাছাড়া এই কিডনিকে আরো কয়েকটি প্রয়োজনীয় কাজ করতে হয় যেমন কিডনি রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণ করে, লবণ ও জলের সমতা রক্ষা করে, কিডনির হর্মোন রক্ত তৈরি করতে সাহায্য করে ইত্যাদি। তাই কিডনির রোগ ক্রনিক হয়ে গেলে অথবা বেশ কিছুদিন অকেজো থাকলে জীবনে অনিশ্চয়তার ছায়া নেমে আসে তবে আশার কথা দু'টি কিডনির একটি যদি সুস্থ ও স্বক্রিয় থাকে তবে আজীবন দেহের প্রয়োজনীয় কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

রোগের কারণ—আমি আগেই বলেছি কিডনির প্রধান কাজ হলো দেহের অভ্যন্তর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। কখনও কখনও এমন হতে পারে কিডনিতে কোন বিষাক্ত পদার্থ সাময়িকভাবে আটকে যায় অথবা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট (নালী)-এ বা মূত্রথলীতে জীবাণু সংক্রমণ প্রভৃতি কারণে কিডনি সাময়িকভাবে অসুস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এ অবস্থাকে বলা হয় অ্যাকিউট নেফ্রাইটিস। সাধারণত অল্প সময়ের মধ্যে শারীর-রক্ষণ পদ্ধতিতে ঐ সব আটকানো বিষাক্ত পদার্থগুলো সরিয়ে দেয় বা জীবাণুমুক্ত করে দেয় তখন আবার কিডনি তার কাজ করতে আরম্ভ করে তবে কিডনি যদি বিশেষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় (বয়স্কদের ক্ষেত্রে বেশী দেখা যায়) তবে এ রোগ ক্রনিক হয়ে যেতে পারে এবং তখনই হয় চিন্তার কারণ। এছাড়া নানা কারণে কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যেমন জীবাণু সংক্রমণ, দীর্ঘদিন তীব্র ওষুধ সেবন, খাদ্যে বিষক্রিয়া, পারদ বা সীসা জাতীয় কোন পদার্থ দেহে প্রবেশ, অনেকের ধারণা খাদ্যে ভেজালের জন্য আজকাল কিডনির রোগ বেশী দেখা যায়—ধারণাটা ঠিক অস্বীকার করা যায় না। আজকাল তরিতরকারিতে আসল রং ও বেশ কয়েকদিন তাজা রাখার জন্য এমন কতক-গুলি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় যা ঠিক আমাদের দেহ নিতে পারে না ফলে সমস্ত চাপ পড়ে কিডনির উপর এবং দিনের পর দিন যদি এইভাবে কিডনির উপর চাপ পড়ে তবে সে একদিন অসুস্থ হতে বাধ্য, তাছাড়া এ রোগ জন্মগত দোষ-ত্রুটি বা আঘাতজনিত কারণেও হতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে বহু কারণে নেফ্রাইটিস হতে পারে। শিশুদের টনসিলের প্রদাহ ও চামড়ায় সাধারণত ঘা-পাঁচড়ার রোগে বেশী-দিন ভুগলে এ রোগ দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ—রোগের প্রথম দিকে প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায়। বারে বারে প্রস্রাবের বেগ হয় কিন্তু প্রস্রাব ঠিকমত হয় না, শেষদিকে প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত পড়তে দেখা যায় অথবা রং বদলে যায় বা ঘনত্ব এসে যায়, রক্তচাপ বেড়ে যায়, চোখে-মুখে

ফোলা ফোলা ভাব, শরীরে অবসন্ন, ভারী ও ক্লান্তিবোধ, দেহে জল জমতে আরম্ভ করে, রক্তে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়, ইউরিয়া বিষ জমতে আরম্ভ করে প্রভৃতি। দিন কয়েকের মধ্যে যদি অবস্থার উন্নতি না হয় তবে হৃৎপিণ্ড ও মগজের ক্ষতি হতে আরম্ভ হয় তখন ডায়ালিসিস ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। নেফ্রাইটিসে বিভিন্ন ধরনের অসুখে বিভিন্ন রকম লক্ষণ দেখা যায়, যেমন প্রস্রাবের নালীতে ইন্‌ফেকশন হলে ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ আসে কিন্তু প্রস্রাব ঠিকমত হয় না, প্রস্রাব করার সময় জ্বালা করে, সময় সময় প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত পড়ে, জ্বর হয়, কিডনিতে পাথর হলে প্রস্রাব কমে যায়, রক্ত-প্রস্রাব হতে পারে, কোমরে ও তলপেটে মাঝে মাঝে তীব্র ব্যথা বা যন্ত্রণা হয়। তাছাড়া আরো কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায় যেমন হেঁচকি ওঠা, বমি হওয়া বা মাঝে মাঝে বমি-বমি ভাব, ক্ষুধামান্দ্য, শরীর ফ্যাকাশে হয় যাওয়া ইত্যাদি ইউরিনারি নালীতে ইনফেকশন বেশী দেখা যায় মেয়েদের ক্ষেত্রে কারণ অনেকেই যারা বাইরে কাজ করে বা বেশী সময় বাইরে চলাফেরা করতে হয় তারা জল কম খায় এবং টয়লেটে যাওয়ার কম সুযোগ পায়।

নিরাময়ের উপায়—উপরের লক্ষণগুলির কিছু কিছু শরীরে প্রকাশ পেলেই রোগের কারণ ও উৎস খুঁজে বের করতে হবে—দরকার হলে চিকিৎসকের পরামর্শ মত প্রস্রাব ও রক্ত পরীক্ষা করে রোগের উৎস বের করতে হবে। রোগ যদি জীবাণু-জনিত হয় বা পাথরে বাধার সৃষ্টি কারণ হয় তবে চিকিৎসকের পরামর্শ মত ওষুধে জীবাণু ধ্বংস করতে হবে এবং পাথর গলিয়ে দিতে হবে। প্রাকৃতিক নিয়মে চিকিৎসা করতে অনেক সময় দরকার, ততদিনে কিডনি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যদি শরীরের অভ্যন্তরীণ কোন গোলোযোগের জন্য হয় যোগ-ব্যায়ামের মাধ্যমে সেগুলো দূর করা যায়। যেমন, সকালে উঠেই সহজ বস্তিক্রিয়া এবং তৎসহ পদ-হস্তাসন, জানুশিরাসন অথবা পশ্চিমোত্থানাসন, অর্ধ-চক্রাসন অথবা অর্ধ-চন্দ্রাসন, কর্ণ-পিঠাসন প্রভৃতি। বিকালে পদ-হস্তাসন, অর্ধ-চক্রাসন, সর্বাংগাসন, কর্ণ-পিঠাসন, ময়ূরাসন প্রভৃতি। যাদের পাথর জমার ধাত আছে তাদের অধিক ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার ও প্রোটিনযুক্ত খাবার কিছুদিনের জন্য না খাওয়াই উচিত। শিশুদের ক্ষেত্রে টনসিলাইটিস, খোস-পাঁচড়া, চুলকানি ঘা থেকে দূরে রাখতে হবে।

৩৩। স্লীপ-ডিসক্, ফ্রোজেন শোল্ডার ও স্পণ্ডিলাইটিস

তিনটিই হাড়ের রোগ তাই বুঝবার সুবিধার জন্য একসঙ্গে আলোচনা করছি এবং তিনটি রোগই মেরুদণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মেরুদণ্ডের গঠন ও তার কাজ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করেছি (মেরুদণ্ডের গঠন ও তার কাজ দেখ) তবুও রোগ তিনটির কারণ ও নিরাময়ের উপায় জানার জন্য সংক্ষেপে আবার একটু আলোচনা করছি।

মেরুদণ্ড জীবদেহের বিশেষভাবে মানবদেহের অক্ষরেখা বলা যেতে পারে। মেরুদণ্ড আমাদের দেহের ভারসাম্য বজায় রাখে, মাথায় বা ঘাড়ে ওজন বা ভার নেওয়া সম্ভব হয় এরই সাহায্যে—ঘাড়-মাথা সোজা আছে, পা দু'টি দেহের ওজন অনায়াসে বহন করে। লাফানো, দৌড়ানো, খেলাধুলা করা, সাঁতার কাটা, ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে দেহকে বাঁকানো এই মেরুদণ্ডের গঠন-প্রণালীর জন্য সম্ভব হয়। মেরুদণ্ড যদি একখণ্ড বাঁশ বা কাঠের মত হত তাহলে এই কাজ সম্ভব হতো কি?

আমরা জানি মেরুদণ্ড কতকগুলো ভার্টিব্রা বা কশেরুকার সমষ্টি এবং প্রতি দু'টি কশেরুকার মাঝে একটি তরুণাস্থির চাকতি বা ডিসক্ আছে। এই ডিসক্ কুশনের

মত নরম তাই প্যাডের কাজ করে—দু'টি কশেরুকার হাড়ে ঘষা লাগতে দেয় না। দু'টি কশেরুকার মাঝ দিয়ে যে দু'টি স্নায়ুগুচ্ছ বের হচ্ছে তাতে কোন আঘাত লাগতে দেয় না।

স্লীপ-ডিসক্—দেহের ভারসাম্য ও অন্যান্য কাজের জন্য ভার্টিব্রা বা কশেরুকা-গুলিকে তিনভাগে ভাগ করে বাঁকিয়ে সাজানো আছে—প্রথম ৭ খানি ভার্টিব্রাকে বলে সারভাইকাল ভার্টিব্রা। এর কাজ শুধু মাথা ও ঘাড় সোজা রাখা এবং এদিক ও ওদিক ঘোরানো, মধ্যভাগকে বলে থোরাসিক ভার্টিব্রা—এই অংশের কাজ বুকের ভার বহন করা, আর অংশের কাজ পেটের ভার বহন করা—এই অংশকে বলা হয় লাম্বার ভার্টিব্রা এবং মেরুদণ্ডের সব ভার্টিব্রা মিলে দেহের ভারসাম্য ঠিক রাখে। মেরুদণ্ড এইভাবে তিনটি ভাগে থাকায় সহজে ভাঙ্গে না, এর মাথায় ও ঘাড়ে গুরুভার বহনে ক্ষমতা রাখে কিন্তু এই গুরুভারের চাপটা বেশীর ভাগ পড়ে লাম্বার ভার্টিব্রার ওপরে তাই কোন ভারী জিনিষ হ্যাঁচকা বা ঝাঁকুনি দিয়ে তোলার সময় প্রথমেই চোট পায় মেরু-দণ্ডের ঐ অংশে।

রোগের কারণ—লাম্বার অংশে চোট-আঘাত, কোন ভারী জিনিস হ্যাঁচকা বা ঝাঁকুনি দিয়ে তোলা, কোন যানবাহনে চলার সময়ে বসা-অবস্থায় ঝাঁকুনি, দেহের উপরাংশে চর্বি বা কোন কারণে ওজন অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, কোন রোগ বা বয়সজনিত কারণে দেহে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি বা তরুণাস্থি বা হাড় ক্ষয়ে যাওয়া ইত্যাদি। যদি কোন কারণে দু'টি কশেরুকার মাঝে তরুণাস্থি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে দু'টি কশেরুকার হাড়ে যে কোন সময়ে, যে কোন কারণে ঘষা লাগতে পারে তখন ওখানকার স্নায়ুজালে প্রচণ্ড যন্ত্রণা আরম্ভ হয় এবং যন্ত্রণা শুধু ঐ জায়গায় থাকে না, ঐ স্নায়ুজাল দেহের যতখানি জায়গায় ছড়িয়ে আছে সব জায়গায় যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ে।

নিরাময়ের উপায়—এ রোগ কোন ওষুধে সারে না—যন্ত্রণা কমতে পারে। সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার, চলাফেরার সময় কোমরে চামড়ার বা কাপড়ের বেল্ট বেঁধে রাখলে দু'টি হাড়ে ঘর্ষণের সম্ভাবনা কম থাকে। যদি ক্যালসিয়াম ঘাটতিজনিত কারণে স্লীপ-ডিসক্ হয় তবে বেশ কিছুদিন ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার বেশী খেতে হবে আর যদি বাড়তি ওজন কারণ হয় তবে ব্যায়াম ও খাবারের মাধ্যমে ওজন কমাতে হবে। একটু সুস্থ হলে এমন কতকগুলো আসন বেছে নিতে হবে যাতে মেরুদণ্ড সামনে বাঁকে না যেমন নৌকাসন, শলভাসন, ভুজংগাসন, ধনুরাসন ইত্যাদি। আসন খুব ধীরে ধীরে যত-টুকু সহ্য হয় ততটুকু করতে হবে। বেশ কিছুদিন সামনে ঝুঁকে বা নিচু হয়ে কোন কাজ করা চলবে না। খাবারের দিকে সতর্ক থাক্তে হবে যাতে হজমে গোলমাল ও কোষ্ঠ-বদ্ধতা না আসে। রোজ সকালে খালি পেটে এককাপ ত্রিফলার জল খেলে কোষ্ঠবদ্ধতা আসবে না।

ফ্রোজেন শোল্ডার—সারভাইকাল ভার্টিব্রা যেখানে কাঁধের হাড়ের সংগে মিলিত হয়েছে সেখানে ভার্টিব্রার মুখটা দেখতে অনেকটা ছোট বলের মত এবং কিছুটা অংশ কাঁধের হাড়ের গর্তের মধ্যে ঢুকে রয়েছে। নিচে ও দু'পাশে তরুণাস্থির প্যাড বা কুশন রয়েছে ফলে মাথা সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাতে অসুবিধা হয় না আবার কাঁধের হাড় ও কণ্ঠাস্থি যেখানে বাহুর হাড়ের সংগে মিলিত হয়েছে সেখানে বাহুর হাড়ের মুখটা দেখতে অনেকটা আধখানা বলের মত এবং এই অংশটা কাঁধের হাড়ের মধ্যে ঢুকে রয়েছে, এর তিনদিকে তরুণাস্থি তো আছেই সংগে আছে সাইনো মেমব্রেনের দু'টি স্তর ও ফ্লুইড, উপরে রয়েছে। বেশকিছু পেশী ও লিগামেন্ট তাই হাত বাহুমূল থেকে চারদিকে

ঘুরতে পারে। এখন যদি কোন কারণে কাঁধ ও সারভাইকাল ভার্টিব্রার সন্ধিস্থলের তরুণাস্থি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা ঐ জায়গায় ক্যালসিয়াম জমে যায় (Deposition of calcium) তবে মাথা বা ঘাড় কোনদিকে আর ঘোরানো যাবে না। জোর করে ঘোরাতে গেলে ঐ জায়গার স্নায়ুজালে ও পেশীতে প্রচন্ড ব্যথা ও যন্ত্রণা বোধ হয় আবার যদি কাঁধ, কন্ঠাস্থি ও বাহুমূলের সন্ধিস্থলের তরুণাস্থি, সাইনোভিয়াল মেমব্রেন ও ফ্লুইড ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা শুকিয়ে যায় তবে হাত যে কোনদিকে (বিশেষ করে নিচে বা উপরের দিকে) নাড়াচাড়া করতে গেলে ঐ জায়গার পেশী ও স্নায়ুজালে এবং শুধু ঐ জায়গায় নয় ঐ সব স্নায়ুজাল যতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে ততদূর পর্যন্ত যন্ত্রণা ও ব্যথা লাগে। এই অবস্থাটাকেই বলা হয় ফ্রোজেন শোল্ডার।

রোগের লক্ষণ—আগেই, বলা হয়ে গেছে এবং প্রত্যক্ষ কারণ আলোচনা হলেও কিছু কিছু পরোক্ষ কারণ বলা যেতে পারে যেমন আয়েষি জীবন-যাপন, জীবন ধারণের জন্য যাদের কায়িক পরিশ্রম করতে হয় না, গাড়ী ছাড়া বাড়ী থেকে বের হয় না ইত্যাদি অর্থাৎ ন্যূনতম কায়িক পরিশ্রমের অভাব, যারা কায়িক পরিশ্রম করে জীবন-যাপন করে অথবা কিছু সময় শরীরচর্চা করে তাদের ভিতর শতকরা একজনকেও এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায় না—যদি দুর্ঘটনা বা অন্য কোন রোগে দীর্ঘদিন বিছানায় পড়ে থাকতে না হয়। দেহে হাড়ের কোন সন্ধিস্থলে যদি ক্যালসিয়াম জমতে না পারে অথবা দেহে যদি ক্যালসিয়ামের অভাব না দেখা দেয় তবে এ রোগ হতে পারে না।

নিরাময়ের উপায়—কোন ওষুধে এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না—ওষুধে শুধু সাময়িকভাবে যন্ত্রণার উপশম হতে পারে। যদি ক্যালসিয়াম জমে এ রোগ হয় যা শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় তবে নিম্নলিখিত কয়েকটি খালিহাতে ব্যায়াম ও যোগব্যায়াম নিয়মিত অভ্যাস রাখলে অল্পদিনে এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়—

১। মেরুদন্ড সোজা রেখে হাত ঝুলিয়ে দাঁড়াও। এখন কনুই সোজা রেখে, সহজভাবে যতটুকু হয় দু' হাত উপর-নিচে কর। ১০ থেকে ১৫ বার প্রক্রিয়াটি অভ্যাস কর। প্রথমে ব্যথা ও যন্ত্রণা লাগবে কিন্তু একটু সহ্য করতে হবে। ২। ঐ অবস্থায় কনুই সোজা রেখে হাত দু'টি বাহুমূল থেকে চারিদিকে আস্তে আস্তে ঘোরাও ২০ থেকে ২৫ বার প্রক্রিয়াটি কর। ৩। ঐ অবস্থায় কনুই সোজা রেখে শুধু কাঁধ দু'টি উপর-নিচে ২৫ থেকে ৩০ বার কর। ৪। সোজা হয়ে দাঁড়াও। পা দু'টি ৩ ফুট মত দু'পাশে মেলে দাও, হাঁটু যেন না ভাঙ্গে। এখন নিচু হয়ে হাত সোজা রেখে ডানহাত দিয়ে বাঁ পায়ের পাতা স্পর্শ কর এবং বাঁ হাত উপর দিকে তুলে মাথা ঘুরিয়ে বাঁ হাতের আঙ্গুলের দিকে তাকাও এবং একইভাবে বাঁ হাত দিয়ে ডান পায়ের পাতা স্পর্শ করে, ডানহাত উপরে তুলে হাতের আঙ্গুলের দিকে তাকাও। যে হাত উপরে উঠবে মাথা ঘুরিয়ে সেইদিকে তাকাতে হবে। ৫। সোজা হয়ে দাঁড়াও। কনুই সোজা রেখে হাত দু'টি উঁচু করে কাঁধের সমান্তরাল রেখে দু'দিকে ছড়িয়ে দাও। এবার ঐ অবস্থায় হাত দু'টি সামনে এনে হাতের তালু একসঙ্গে লাগাও। তারপর হাত সোজা রেখে যতদূর সম্ভব পিছনে বাঁদিকে নিয়ে যাও। মনে রাখবে কনুই যেন সোজা থাকে। প্রক্রিয়াটি ২০ থেকে ২৫ বার কর।

একটু বিশ্রাম নিয়ে এমন কয়েকটি আসন কর যাতে ঘাড়, কাঁধ ও হাতের ভাল ব্যায়াম হয় যেমন ত্রিকোণাসন, চতুষ্কোণাসন, সর্বাংগাসন প্রভৃতি। আসল উদ্দেশ্য হলো সন্ধিস্থলের ঐ জমা ক্যালসিয়াম ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। অন্য কোন

কারণে ফ্রোজেন শোল্ডার হলে কারণটি কি বের করে নিয়ে সেইমত ব্যবস্থা নিতে হবে। কোন ওষুধে এ রোগ নিরাময় হয় না।

স্পণ্ডিলাইটিস—স্পণ্ডিলাইটিস একটি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক রোগ—এ রোগ মেরুদণ্ডের যে কোন জায়গায় হতে পারে, তবে সারভাইকাল ও লাম্বার অংশে বেশী হয়—বিশেষভাবে সারভাইকাল অংশে। লাম্বার অংশে হলে তখন বলা হয় স্লীপ ডিস্ক এবং কারণ একই।

রোগের কারণ—মেরুদণ্ডে দুর্ঘটনাজনিত আঘাত বা চোট, পেশাগত কারণ, হাঁটা-চলা-বসায় কুঅভ্যাস, হাড়ের বিশেষ কোন রোগ, ক্যালসিয়ামের অভাব, বেশী বয়সজনিত কারণে এ রোগ দেখা দিতে পারে।

রাস্তায় বাসে, মিনিবাসে বা যে কোন গাড়ীতে যাদের যাতায়াত করতে হয় এবং সেই সব গাড়ী যখন কোন বাম্পার বা বড় গর্ত পার হয় তখন গাড়ীর আরোহীদের যে কি অবস্থা হয়, একমাত্র ভুক্তভোগী তা বলতে পারে। যারা বাসে বা মিনিবাসে দাঁড়িয়ে যায় তাদের মেরুদণ্ডের সারভাইকাল অংশ বাঁকানো থাকে কারণ মাথা প্রায় নিচু করে দাঁড়াতে হয় তাই ঐ অংশের ভার্টিব্রাগুলো আলগা থাকে আর যারা বসে যায় তাদের লাম্বার ভার্টিব্রার উপর বেশ চাপ থাকে। এখন প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে দু' জায়গায় ভার্টিব্রার মাঝে যে তরুণাস্থি চাকতি বা ডিস্ক থাকে তা বিশেষভাবে ক্ষতি-গ্রস্ত হতে পারে। তখনকার মত হয়তো একটু ব্যথা-যন্ত্রণা হতে পারে কিন্তু পরে যখন দু'টি ভার্টিব্রার হাড়ে ঘষা লাগে তখন ঐ ক্ষতিগ্রস্ত জায়গার স্নায়ুজালে ও পেশীতে প্রচণ্ড ব্যথা ও যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। আমি আগেই বলেছি শুধু ঐ জায়গায় নয় ঐ সব স্নায়ুজাল দেহে যতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে সেখানেও যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। যারা জীবিকার জন্য বা পেশাগত কারণে দিনে আট-নয় ঘণ্টা ঘাড় নিচু করে কাজ করে এবং একইভাবে বেশ কয়েকবছর কাজ করে তবে তাদের সারভাইকাল তরুণাস্থির অবস্থা কি হবে? তাই রোজ কিছু সময় ঘাড় উল্টোদিকে বাঁকিয়ে কয়েকটি ব্যায়াম বা যোগ-ব্যায়াম অবশ্য অভ্যাস রাখতে হবে না হলে স্পণ্ডিলাইটিসে আক্রান্ত একদিন হবেই।

নিরাময়ের উপায়—চোট বা আঘাত লাগলে সম্পূর্ণ কয়েক দিন বিশ্রাম নিতে হবে, ঘাড় যতটা সম্ভব সোজা রাখতে হবে, চলাফেরার সময় ঘাড়ে চামড়ার বা পুরু কাপড়ের বেল্ট ব্যবহার করতে হবে—বেল্ট খুললেই মাথা নিচু হয়ে যাবে, ঘুমোবার সময় বালিশ ব্যবহার না করলেই ভাল আর করলে বালিশ খুব পাতলা হওয়া চাই। সতর্ক থাকতে হবে যেন ক্ষতিগ্রস্ত তরুণাস্থিতে আবার কোন চোট বা আঘাত না লাগে। মাথা নিচু করে কোন কাজ বেশ কয়েকদিন বন্ধ করতে হবে। এমন ব্যায়াম বা যোগ-ব্যায়াম করা উচিত নয় যাতে শরীর সামনের দিকে বাঁকাতে হয়। যদি ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত কারণে হয় তবে ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার বেশী খেতে হবে। চোট বা আঘাতজনিত কারণে হলে ঠিকমত বিশ্রাম নিলে দেহের প্রাকৃতিক নিয়মে এ রোগ ভাল হয়ে যায়। কোন ওষুধে এ রোগ ভাল করতে পারে না।

সচিত্র যোগ-ব্যায়াম
সচিত্র যোগ-ব্যায়াম
সচিত্র যোগ-ব্যায়াম
সচিত্র যোগব্যায়াম
সবিতা মল্লিক
সবিতা মল্লিক